অভিযাত্রিক

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

মিত্র ও ঘোষ

১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা

কল্যাণী উমাকে

এই লেখকের—

পথের পাঁচালী

অপরাজিত

অনুবর্ত্তন

অসাধারণ

দৃষ্টি-প্রদীপ

দেবযান

মেঘ-মল্লার

বিপিনের সংসার

যাত্রাবদল

কিন্নর দল

জন্ম ও মৃত্যু

বিধু মাষ্টার

শ্রেষ্ঠ গল্প

আদর্শ হিন্দু হোটেল (উপন্যাস)

ঐ (নাটক)

নবাগত

উপলখণ্ড

মৌরীফুল

ক্ষণভঙ্গুর

তৃণাঙ্কুর

উর্মিমুখর

উৎকর্ণ

হে অরণ্য কথা কও

বনে পাহাড়ে

কেদার রাজা

অশনি-সঙ্কেত

ইছামতী

কুশল পাহাড়ী

অভিযাত্রিক

আজ চোদ্দ পনেরো বছর আগের কথা। কি তারও বেশি হবে হয়তো। আমাব বন্ধু রমেশবাবু আর আমি দুজনে কলকাতার মেসে একঘেয়ে পড়ে আছি বহুদিন। ভালো লাগে না এরকম কলকাতায় পড়ে থাকা।

দেশেও তখন যাওয়ার নানারকম অসুবিধা ছিল। কিন্তু একটু বাইরে না বেরুলে ধুলো আর ধোঁয়ায় প্রাণ তো অতিষ্ঠ হয়ে উঠলো।

রমেশবাবুকে বললুম—চলুন কোথাও বেড়িয়ে আসি।

রমেশবাবুর ট্যাঁকের অবস্থাও খুব ভালো নয় আমার চেয়ে। তিনি অবাক হয়ে চেয়ে বললেন—বেড়াতে যাবো কিন্তু হাতে টাকাকড়ি কই—

—টাকাকড়ি লাগবে না—

—বিনা টিকিটে গিয়ে জেল খাটবো নাকি?

—রেলে চড়ে নয়, পায়ে হেঁটে—

—কতদূর যাবেন পায়ে হেঁটে?

তাঁকে বুঝিয়ে বললুম—বেশিদূর মোটেই নয়। বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড দিয়ে বার হয়ে পায়ে হেঁটে যতদূর যাওয়া যায়। কি করবো যখন হাতে পয়সা নেই, সময়ও নেই, এ ছাড়া তখন উপায় কি? তিনি কি মনে করে রাজি হয়ে গেলেন।

হাঁটতে হাঁটতে বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের ধারে একটা বাগানবাড়িতে আমরা কিছুক্ষণ বসি। বাগানের উড়ে মালী এসে আমাদের সঙ্গে খানিকটা গল্প করে গেল। তাকে দিয়ে আমরা বাগানের গাছ থেকে ভালো কাশীর পেয়ারা পাড়িয়ে আনলুম। সে ডাব পেড়ে দেওয়ার প্রস্তাব করেছিল, কিন্তু তাতে দেরি হবে বলে আমরা রাজি হইনি।

ডানদিকের একটা পথ ধরে আমরা বড় রাস্তা ছেড়ে দিলুম। অনেকদিন পরে কলকাতা থেকে বার হয়েচি—কতদূর আর এসেচি, না হয় মাইল পাঁচ ছয় হবে—কিন্তু যেন মনে হচ্চে কতদূর এসে গিয়েচি—কলকাতা থেকে—স্বপ্নপুরীর দ্বারে এসে পৌঁছে গিয়েচি যেন। প্রত্যেক বন ঝোপ যেন অপূর্ব, প্রতিটি পাখীর ডাক অপূর্ব, ডোবার জলে এক আধটা লালফুল তাও অপূর্ব।

জীবনে একটা সত্য আবিষ্কার করেচি অভিজ্ঞতার ফলে। যে কখনো কোথাও বার হবার সুযোগ পায়নি সে যদি কালে ভদ্রে একটু আটটু বাইরে বেরুবার সুযোগ পায়—যতটুকুই সে যাক না কেন, ততটুকু গিয়েই সে যা আনন্দ পাবে—একজন অর্থ- ও বিত্তশালী Blasé ভ্রমণকারী হাজার মাইল ঘুরে তার চেয়ে বেশি কিছু আনন্দ পাবে না। কাজেই আমার সেদিনকার ভ্রমণটা এদিক থেকে দেখতে গেলে তুচ্ছ তো নয়ই—বরং আমার জীবনের মধ্যে অত্যন্ত মূল্যবান সেদিনটির আনন্দ। কারণ, আসলে দেখে চোখ আর মন।

যখন ওই দুটি ইন্দ্রিয় বহুদিন বুভুক্ষু, তখন যে কোনো মুক্ত স্থান, সামান্য একটা বাঁশঝাড়, একটি হয়তো ধানের মরাইওয়ালা গৃহস্থবাড়ি, আঁকা-বাঁকা গ্রাম্য নদী, কোথাও একটা বনের পাখীর ডাক—সবই মধুর, স্বপ্নময় হয়ে ওঠে।

পয়সা যাদের আছে, খুব ঘুরে বেড়াতে পারে তারা—ভালো কথাই, কিন্তু Blase হবার ভয়ও যথেষ্ট। তখন ভীম নাগের সন্দেশও মুখে রোচে না।

পরবর্তী কালে জীবনে অনেক বেড়িয়েচি, এখনও বেড়াই—[illegible]তা Blase টাইপ অনেক দেখেচি, যথাস্থানে তাদের গল্প দেবো।

[illegible] প্রভাতের [illegible] আলোয় [illegible] দিনে Blase হবার কথা ভাববার অবকাশ [illegible]নি—সোজা চলেছিলুম দুই বন্ধুতে পথ বেয়ে ঘর থেকে বার হবার আনন্দে বিভোর হয়ে।

হঠাৎ একটা গ্রামের পথে উপস্থিত হয়ে গিয়েচি কোন্ সময়, খেয়াল করিনি—সে পথের একদিকে খুব উঁচু লম্বা একটা পাঁচিল। একজন লোক পথ দিয়ে যাচ্ছিল, তাকে জিগ্যেস্ করতে সে বললে, ওটা চাঁদমারির পাঁচিল।

—কোথায় চাঁদমারি ?

—পাশেই মশাই। সোলজারেরা বন্দুক প্র্যাকটিস্—

—বুঝেচি—তা এখন করচে না তো ?

—করলেই বা কি। পাঁচিল তো দিয়ে রেখেচে।

—সাম্‌নে ওটা কি গাঁ ?

—নিম্‌তে।

কিন্তু নিম্‌তে গ্রামে ঢুকবার পূর্বে একটা বাঁশবাগান দেখে বড় ভালো লাগলো। খুব বড় বাঁশবন, অজস্র শুকনো বাঁশপাতা ছড়িয়ে আছে—পা দিয়ে মচ্‌কে যাবার সময় কেমন সুন্দর শব্দ হয়, শুকনো পায়ে-দলা বাঁশপাতার গন্ধ বার হয়, মাথার উপর পাখী ডাকে, সূর্য আলো-ছায়ার জাল বোনে বাঁশগাছের ডালে, পাতায়, তলাকার মাটির ওপর।

সেই বাঁশবনে এক রকমের গাছ দেখলুম। শুধুই একটা করে লম্বা ডাঁটা। তার আগার একটা আফোটা বড় কুঁড়ির মতো ব্যাপারের মধ্যে অনেকগুলো ছোট মটরের মতো দানা। গাছের গায়ে হাত দিলে হাত চুলকোয়।

কি ভালোই লেগেছিল সেই গাছগুলো সেদিন! বাঁশবনের ছায়ায় [illegible] কচু-জাতীয় উদ্ভিদ যেন অমৃতফল প্রসব করেচে।

ছায়া ঘন হয়ে আসচে—বিকেল নেমেচে। বাঁশবন পার হয়ে একটা মাঠে আমরা বসলুম। বন্যফুল ও অন্যান্য লতাপাতার ঝোপ মাঠের ধারে সর্বত্র। ঝোপের মাথায় মাথায় লতাপাতায় আলোকলতার জাল। দূরে দু' একটা পুরানো কোঠাবাড়ি দেখা গেল। একটা বাড়ির ছাদে একটি পল্লীবধূ চুল শুকোতে বসেচে। গ্রামের ছেলেমেয়েরা সামনের মাঠে হাডুডু খেলচে।

মাঠ থেকে উঠে নিমৃতে গ্রামের শেষপ্রান্তে গিয়ে পৌঁছুলাম আমরা। সেখানে মুচি বাউরিরা বাস করে, তাদের একটা ছোট পাড়া। কিন্তু এরা সকলেই নিকটবর্তী কলে কাজ করে, শহর এসেচে গ্রামের পাশে, শহরের সভ্যতা ও জীবনযাত্রাপ্রণালী গ্রামের শান্ত গৃহকোণে এনে দিয়েচে ব্যস্ততা, কোলাহল ও সৌখিনতার মোহ।

একজন বললে—কাছেই পাষাণকালী মন্দির, দেখবেন না? নিমৃতের পাষাণকালী জাগ্রত দেবতা—ছোট্ট মন্দিরের মধ্যে বিগ্রহটি ভালো চোখে পড়ে না, বড় অন্ধকার ভেতরটাতে। মন্দিরের সামনে একটা পানাভরা পুকুর। পুকুরের ওপারে বাউরিদের ঘাটে বাউরিদের ঝি-বৌয়েরা জল নিতে নেমেচে।

কিছুক্ষণ বাঁধা ঘাটে বসে থাকবার পরে একটি ছোট ছেলে এসে বললে—বাবা আপনাদের ডাকচেন—আসুন আপনারা—

আমরা একটু আশ্চর্য হয়ে এগিয়ে গেলুম। ইটের দেওয়াল দেওয়া একখানি খড়ের ঘর। দারিদ্র্যের ছায়া সে বাড়ির সারা অঙ্গে। বাড়ির মালিক হ'লেন ওই পাষাণকালীর পূজারী—তিনিই আমাদের ডেকেচেন তাঁর ছেলেকে পাঠিয়ে।

[illegible] অনেকদিনের কথা। পূজারী ঠাকুরের বয়েস বা চেহারা আমার মনে [illegible]। তিনি জিগ্যেস করলেন—আপনারা কোথা থেকে আসচেন?

—কলকাতা থেকে।

—আপনারা?

—আমি ব্রাহ্মণ, আমার এই বন্ধুটি কায়স্থ।

—পূজো দেবেন মায়ের?

আমার মনে হ'ল এখানে দিলে ভালো হয়। লোকটা গরিব, দিলে ওর উপকার করা হয় বটে।

ইতিমধ্যে দেখি একটি বৌ, সম্ভবত পূজারী ব্রাহ্মণটির স্ত্রী, দুখানা আসন আমাদের জন্তে বিছিয়ে দিয়ে গেল। আমার বাস্তবিক কষ্ট হ'তে লাগলো—এরা ভেবেচে কলকাতা থেকে পয়সাওয়ালা বাবুরা এসেচে—ভালো ভাবেই পূজো দেবে—দু' পয়সা আসবে।

কলকাতার বাবু যে দুটি পয়সা অভাবে হেঁটে সারাপথ এসেচে—সে খবর এরা রাখে না। রমেশবাবু পকেট থেকে দুটি পয়সা বার করলেন, আমার পকেট থেকে বেরুলো একটা পয়সা। পূজারী ঠাকুর বেশি কিছু আশা করেছিলেন, তা হ'ল না, তবুও দুটি নারকেলের নাড়ু প্রসাদ দিলেন আমাদের হাতে।

সন্ধ্যা হয়েচে, বাঁশবাগানের তলায় অন্ধকার বেশ ঘন।

আমরা বেলঘরিয়া স্টেশনে এসে কলকাতার গাড়ি ধরলুম।

আমার বন্ধু নীরদ আমার সঙ্গেই মেসে থাকে।

দুজনেরই অবস্থা সমান। কলকাতা থেকে বেরুনো হয়নি কোথাও অনেকদিন।

নীরদ বললে—চল, কোথাও রেলে বেড়িয়ে আসি—

রেলে কোথায় যাওয়া যায় বেশ ভেবে চিন্তে দেখলুম। দূরে কোথাও যাওয়া চলবে না, তত পয়সা নেই হাতে। সুতরাং আমি পরামর্শ দিলাম

মার্টিনের ছোট রেলে চলো কোথাও যাওয়া যাক। সে বেশ নতুন জিনিস হবে এখন।

হাওড়া ময়দান স্টেশনে ছোট লাইনে চেপে আমরা জাঙ্গিপাড়া কৃষ্ণনগরে রওনা হলুম।

দুধারে যখন পড়লো ফাঁকা মাঠ আর বাঁশবন, আমবন—আমাদের মন যেন মুক্তির আনন্দে নেচে উঠলো।

বেলা তিনটের সময় আমরা নামলুম গিয়ে জাঙ্গিপাড়া। দুজনে গ্রামের মধ্যে ঢুকলুম—বড় বড় বাঁশবন ঝোপঝাড় আর ছোটবড় পানাপুকুর চারিধারে।

বেলা তিনটের মধ্যে এমন ছায়া নেমে এসেচে যেন এখনি সন্ধ্যা হবে হবে। আমরা একটা ময়রার দোকানে বসলুম—ময়রার সম্বল কালো হুড়ির জালের পেছনে কলঙ্ক ধরা পেতলের থালায় সাজানো চিনির ডেলা সন্দেশ, তেলে-ভাজা বাসি জিলিপি, কুচো গজা, চিঁড়ে মুড়কি আর বাতাসা।

কলকাতার বাবু দেখে ময়রা খাতির করে বসালে। নীরদ ইংরিজিতে বললে—যেরকম খাতির করলে এরপর নিতান্ত মুড়কি তো কেনা যায় না—উপায় কি?

—এসো একটু চাল দেয়া যাক—তুমিই আরম্ভ করো।

ময়রাকে ডেকে নীরদ বললে—ওহে, ভালো সন্দেশ আছে?

ময়রা করুণদৃষ্টিতে চিনির ডেলা সন্দেশের থালার দিকে চেয়ে বললে—আজ্ঞে খুব ভালো হবে না। একটু চিনি বেশি হবেন—আপনাদের তা দেওয়া যায় না।

আমি চুপি চুপি বললুম—ময়রা আমাদের কি ভেবেচে হে? দুজনের [illegible]ট এক করলে খাবার খাওয়ার বজেট কত?

নীরদ উত্তর দিলে—সাত পয়সা। তার মধ্যে একটা পয়সা পান খাওয়ার জন্যে রাখো—ছ'পয়সা।

আমি তখন তাচ্ছিল্যের সুরে বললুম—চিঁড়ে মুড়কিই দাও তবে ছ'পয়সার ও বরং ভালো, এসব জায়গায় বাজে ঘি তেল—

খেতে খেতে ময়রাকে জিগ্যেস্ করা গেল, তোমাদের এখানে এত ডোবা আর জঙ্গল, ম্যালেরিয়া আছে নাকি?

ময়রা আমাদের জন্যে তামাক সাজতে সাজতে বললে—ম্যালেরিয়ায় উচ্ছন্ন গেল সব বাবু, আর আপনি বলেন আছে নাকি? ভেতরে ঢুকে দেখুন কি অবস্থা গাঁয়ের।

বেলা পড়ে এলে আমরা গ্রামের মধ্যে ঢুকলুম। বাংলায় ম্যালেরিয়া-বিধ্বস্ত দরিদ্র গ্রামের এমন একখানি ছবি সেই আসন্ন হেমন্তসন্ধ্যায় সেদিন প্রত্যক্ষ করেছিলাম, যা চিরদিন আমার মনে আঁকা রয়ে গেল। ছবি নিরাশার, দুঃখের অপরিসীম নিঃসঙ্গতার ও একান্ত দারিদ্র্যের।

সেই বনজঙ্গলে ভরা গ্রামখানির ওপর ধ্বংসের দেবতা যেন উপুড় হয়ে পড়ে আছেন, তাঁর করাল কালো ডানার ছায়ায় সারা গ্রাম অন্ধকার।

আমাদের মন কেমন দমে গেল—যেন এখান থেকে পালাতে পারলেই বাঁচি। একটা ডোবার ধারে জনৈকা গ্রাম্যবধূকে বাসন মাজতে দেখলুম। পথের ধারে অন্ধকার পুকুরটা—সরু হাতদুটি ঘুরিয়ে মেয়েটি বাসন মাজচে, পরনে মলিন কাপড়, অথচ গায়ের রং দেখে মনে হয় সে উচ্চবর্ণের গৃহস্থের কুলবধূ। বাংলার মেয়েদের শত কষ্টের কথা মনে পড়ে গেল ওকে দেখে—বাংলার সমস্ত নিপীড়িতা অভাগিনী বধূদের ও যেন প্রতিনিধি।

এক জায়গায় একটা পাঠশালা বসেচে। তার একদিকে শিবমন্দির। পাঠশালার ছেলেরা ছুটির আগে সারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে সমস্বরে নামতা পড়চে। একটা ছেলেও স্বাস্থ্যবান নয়, প্রত্যেকের মুখ হলদে, পেট মোটা

—কারো গায়ে মলিন উড়ানি, কারো গায়ে ছেঁড়া জামা—প্রায় কারো পায়ে জুতো নেই।

আমরা দাঁড়িয়ে দেখচি দেখে গুরুমহাশয় নিজে এগিয়ে এসে বললেন —আপনারা কোথেকে আসচেন?

—বেড়াতে এসেচি কলকাতা থেকে।

তিনি খুব আগ্রহের সুরে বললেন, আসুন—না, বসুন, এই বেঞ্চি রয়েচে—

নীরদের বসবার তত ইচ্ছে ছিল না হয়তো—কিন্তু আমার বড ভালো লাগলো এই গুরুমশায়টি ও তার দরিদ্র পাঠশালা।

কি জানি, হয়তো আমার বাল্যের সঙ্গে এখানে কোন একটি গ্রাম্য পাঠশালার সম্পর্ক ছিল বলেই। নীরদকে টেনে নিয়ে এসে বসালুম পাঠশালার বেঞ্চিতে।

গুরুমহাশয়ের বয়েস ষাটের কাছাকাছি, মাথার চুল প্রায় সব সাদা, শীর্ণ চেহারা। পরনে আধময়লা ধুতি আর গায়ে হাতকাটা ফতুয়া। তিনি বসেচেন একখানা হাতলহীন চেয়ারে, চেয়ারখানার পিঠটা বেতের কিন্তু বসবার আসনটা কাঠের। মনে হয় সেটাও এক সময়ে বেতেরই ছিল, ছিঁড়ে যাওয়াতে সোজাসুজি কাঠের করে নেওয়া হয়েচে, হাঙ্গামার মধ্যে না গিয়ে।

সেদিন ভারি আনন্দ পেয়েছিলুম এই পাঠশালায় বসে।

আমরা বললুম—আপনার পাঠশালায় কত ছেলে?

—আজ্ঞে ত্রিশজন, তবে সবাই আসে না—জন কুড়ি আসে।

—ছেলেদের মাইনে কত?

—চার আনা, আর ছ'আনা—তা কি সবাই ঠিকমত দেয়? তা হ'লে আর ভাবনা কি বলুন। গভর্ণমেণ্টের মাসিক সাহায্য আছে পাঁচ সিকে, তাই ভরসা।

মাসে পাঁচসিকে আয়ের ভরসা কি সেটা ভালো বুঝতে না পেয়ে আমরা

গুরুমশায়ের মুখের দিকে চাইলাম। কিন্তু লোকটা মনে হ'ল তাতেই দিব্যি খুশি—যেন ও জীবনে বেশ একট পাকাপোক্ত আয়ের দৃঢ় ভিত্তির ওপর বসে আছে নিশ্চিন্ত মনে।

আমি বললুম—আপনার বাড়িতে ছেলেপুলে কি?

গুরুমশায় হেসে বললেন—তা মা ষষ্ঠীর বেশ কৃপা। সাতটি ছেলেমেয়ে—দুটি মেয়ে বিয়ের উপযুক্ত হয়েচে, বিয়ে না দিলেই নয়। তবুও তো একটি আর বছর ম্যালেরিয়া জ্বরে—সতেরো বছরের হয়েছিল—

বাঙালী মধ্যবিত্ত ঘবের সাধারণ কাহিনী। আমরা সেখান থেকে উঠলুম, কারণ সন্ধ্যা হয়ে আসচে। গুরুমশায় কিন্তু আমাদের সঙ্গ ছাড়লেন না, বললেন—চলুন, আপনাদের গাঁ দেখিয়ে আনি। একটা ছোট্ট মাঠ পেরিয়ে গুরুমশায়ের ঘর। ইটের দেওয়াল, টিনের চালা। বেশ বড় উঠোন, তবে ঘরদোরের অবস্থা খুব ভালো নয়। উঠোনে পা দিয়ে গুরুমশায় বললেন—ওরে হাবু, বাইরে মাদুরটা পেতে দে।

আমরা বললুম—আবার মাদুর কেন, আমরা বসবো না আর।

—না না, তা কখনো হয়? এলেন গরিবের বাড়ি, একটু কিছু মুখে না দিলে—একটু চা।

—ওসব আবার কি, গাঁ দেখাতে নিয়ে বেরুলেন, ওসব কথা তো ছিল না?

আমাদের কোনো কথাই শুনলেন না তিনি। মাদুর এল, বসালেনও আমাদের। গুরুমশায় বাড়ির মধ্যে গিয়ে ঢুকলেন।

একটু পরে তিনি আবার তামাক সেজে এনে আমাদের হাতে দিতে গেলেন এবং আমরা কেউ তামাক খাইনে শুনে দুঃখিত হ'লেন। আমরা বললুম—আপনাদের গাঁয়ের ময়রাও ওই ভুল করেছিল, সেও তামাক সাজছিল আমাদের জন্যে।

একটি শ্যামবর্ণ মেয়ে এই সময় একখানা থালাতে প্রায় আধ কাঠা খানেক মুড়ি, একটা ছোট বাটিতে পোয়াটাক আখের গুড়, অনেকখানি নারকেল কোরা নিয়ে এল। গুরুমশায় বললেন—এই এঁদের সামনে রাখ মা—এই আমার ছোট মেয়ে, এই চোদ্দ হ'ল, এর ওপরে দুই দিদি—যা, চায়ের কতদূর হ'ল দেখ গে—না না ও হবে না—একটু মুখে দিতেই হবে—গরিবের বাড়ি, আপনাদের উপযুক্ত নয়—পাড়াগাঁ জায়গা।

তখন নীরদ মুড়ি নারকেল কোরার বৈজ্ঞানিক ভিটামিনতত্ত্ব বুঝিয়ে দিয়ে প্রমাণ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো যে, এমন চমৎকার পুষ্টিকর জলযোগ বহুদিন আমাদের অদৃষ্টে জোটেনি। মেয়েটি আবার চা নিয়ে এল।

—এইখানে রাখ মা, হয়ে গেলে অমনি দুটি পান আনবি—আর দুটি মুড়ি ?…

—আজ্ঞে না, এই খেয়ে ওঠা দায়, এ কি কম দেওয়া হয়েচে ?

জলযোগ সবে শেষ হ'ল। মেয়েটি কৌতূহলের দৃষ্টিতে আমাদের দিকে চেয়ে ছিল এতক্ষণ। গুরুমশায় বললেন—এর নাম কমলা—এইটি মেয়ের মধ্যে খুব বুদ্ধিমতী। বাংলা যে কোনো বই পড়তে পারে, এর দিদিরা লেখাপড়া জানে না—পড়াশুনোর ঝোঁক খুব এর—কেবল বই পড়তে চাইবে, তা আমি কোথা থেকে নিত্যি নতুন বই দিই বলুন।

আমার হাতে একখানা কি মাসিকপত্র ছিল, ট্রেনে পড়বার জন্যে এনেছিলুম—মেয়েটিকে ডেকে সেখানা তার হাতে দিয়ে বললুম—এখানা প'ড়ো তুমি। নীরদ পিতাপুত্রীর অলক্ষিতে আমার গায়ে একবার চিমটি কাটলে। আমার তখন বয়েস তেইশের বেশি নয়—মেয়েটি চোদ্দ বছরের।

মেয়েটি আমার হাত থেকে সেখানা নিয়ে নম্রমুখে একটু হাসলে। তারপর আমাদের থালা ও কাপগুলি নিয়ে চলে গেল।

গুরুমশায় উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেন—বইখানা দিয়ে দিলেন ? বেশ ভালো

নতুন বইখানা—অমন বই ও পেয়ে বড় খুশি হয়েচে। এ গাঁয়ে ওসব কে দেবে বলুন।

আমরা গুরুমশায়ের বাড়ি থেকে যখন বার হয়ে পথে পড়লুম তখন বেশ অন্ধকার হয়েচে, বাড়ির সামনে বাতাবী লেবু গাছের ডালে জোনাকি জ্বলচে। গুরুমশায় বললেন—চলুন আপনাদের এগিয়ে দিই। ট্রেনের এখনো দেরি আছে—সাড়ে আটটায়—আমাদের আড্ডাটা দেখে যাবেন না একবার?

কলকাতায় ক্লাব আছে, সিনেমা আছে, ফুটবল আছে, এখানে লোকে অবসর সময় কি করে কাটায় জানবার আগ্রহ অত্যন্ত বেশি ছিল আমার।

একটা নিচু চালাঘরের সামনে গিয়ে গুরুমশায় বললেন—দেখবেন নাকি? আসুন না?

ঘরের মাটির মেজেতে আগাগোড়া মাদুর পাতা। জন চারেক লোক বসে আছে মাদুরের ওপর, একজন হুঁকোতে তামাক টানচে। আর তিন-জন লোক একেবারে চুপচাপ বসে। আশ্চর্য এই যে, এরা কথাবার্তা বলতে এসে এমনধারা চুপচাপ বসে আছে!

একজন আমার দিকে চেয়ে বললে—কোত্থেকে আসা হচ্চে?

গুরুমশায় বললেন—ওঁরা কলকাতা থেকে এসেচেন আমাদের দেশ দেখতে, তাই আমার ওখানে—

—বেশ বেশ, বসুন। তামাক চলে? চলে না। তা বেশ—

কথাবার্তার ইতি। এ মজলিসে কেউ কথা বলে না দেখচি। আরও তিনি চার জন লোক ঢুকলো—একজন বললে—তেঁতুল কি দর বিক্রি করলে চক্কত্তি?

যে লোকটি হুঁকো টানছিল, সে উত্তর দিলে—বিক্রি করিনি। সাড়ে সাতটাকা পর্যন্ত উঠলো, আর উঠলো না। সামনের হাটে আবার দেখি—

বেশ লাগলো ওদের এই গ্রাম্য কথা। কথাও যদি বলে তো বেশ লাগে। এ যেন কাশ্মীর ভ্রমণের চেয়েও কৌতূহলপ্রদ ; যদিও কখনো কাশ্মীর ভ্রমণ করিনি, বলতে পারিনে তার আনন্দ কি ধরনের। আর একজন বললে—আর একবার কুতুবপুরে যাই, মেয়েটার একটা সম্বন্ধ জুটেচে—পাত্র কুতুবপুরের কাছারিতে নায়েবি করে—

—কুতুবপুরের নায়েব ? হাঁ হাঁ দেখে এসো, বেশ ছেলেটি, বয়েস বেশি না—

এই সময় একজন ঘরে ঢুকে সকলের সামনে কলার পাতায় মোড়া কি একটা জিনিস রাখলে। সবাই ঝুঁকে পড়লো। এসো হরিশ, কি, কি হে এতে ?

আগন্তুক লোকটি হাসিমুখে বললে—খাও না, দ্যাখো না কি। বাড়ির গাছে কথ্‌বেল পেকেছিল, তারই আচার—বলি, যাই আড্ডার জন্যে একটু নিয়ে যাই—

সকলেই ঝুঁকে পড়লো কলার পাতার ওপর। আমাদের হাতেও ওরা একটু তুলে দিলে জিনিসটা। আমাদের কোনো আপত্তি টিকলো না।

বেশ আড্ডা। খুব ভালো লাগলো আমার। আমি ভাবলুম, কাছে, মাঝে এক আধ শনিবার কলকাতা থেকে এখানে এসে এই আড্ডায় যোগ দিয়ে গেলে কলকাতা বাসের একঘেয়েমিটা কেটে যায়। কলকাতায় ফেরবার ট্রেনের সময় প্রায় হ'ল। আমরা ওদের সকলের কাছে বিদায় নিলাম। গুরুমশায়টি সত্যিই বড় ভদ্র, তিনি উঠে এলেন আমাদের সঙ্গে আমাদের স্টেশনের রাস্তায় তুলে দিতে।

—আসবেন আবার—কেমন তো ? বড় কষ্ট হ'ল আপনাদের—

—কি আর কষ্ট—খুব আনন্দ পেয়েচি। আসি তাহ'লে—

খানিটকা চলে এসেচি—দেখি গুরুমশায় পেছন থেকে আবার ডাকচেন। নীরদ বললে—ছাতি ফেলে এসো নি তো?

—না, ছাতি আনিই নি—

গুরুমশায় হাঁপাতে হাঁপাতে আসচেন পথের বাঁকে।

—একটা ভুল হয়ে গিয়েচে—আপনাদের ঠিকনাটা? যদি মেয়েটার বিয়ে টিয়ে দিতে পারি মশায়দের চিঠি লিখবো, আসবেন আপনারা। বড় খুশি হবো। বড ভালো লেগেচে আপনাদের।

ট্রেনে উঠে নীরদ বললে, বেশ বেড়ানো হ'ল, না?

—বেশই তো।

—গুরুমহাশয়ের মেয়েটি বেশ—কি বল? তোমাদের পালটি ঘর তো—না?

—সে খোঁজে তোমার দরকার কি?

—তাই বলছিলাম। গরিবের মেয়েটি উদ্ধার করা রূপ মহৎ কাজে—

—কি বাজে কথা বলচো সব! থাক্ ওকথা।

এরপরে আমরা আর কখনো ওই গ্রামে অবিশ্যি যাইনি—কিন্তু পাঁচ ছ' বছর পরে বৌবাজারে এক দরজির দোকানে একজন লোকের সঙ্গে আমার আলাপ হয় তার বাড়িও জাঙ্গিপাড়া। কথায় কথায় তাকে তাদের বৃদ্ধ গুরুমহাশয়ের কথা জিগ্যেস করে জানি তিনি এখনও বেঁচে আছেন, মেয়েগুলির মধ্যে বড়টিকে অতিকষ্টে পার করেচেন কিন্তু অন্য মেয়েগুলির আজও কোনো কিনারা করতে পারেন নি।

অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে হ'লে জীবন সম্বন্ধে—পাড়াগাঁয়ে পায়ে হেঁটে বেড়ানো উচিত কিছুদিন, আমার এইরকম ধারণা। দশদিন কাশ্মীরে ঘূর্ণীঝড়ের মতো ঘুরে আসার চেয়ে তা কম শিক্ষাপ্রদ নয়, আনন্দও তা থেকে

জায় পাওয়া যায় না। এই ধরনের আর একটা অভিজ্ঞতার কথা এবার বলবো।

পিসিমার বাড়ি যাচ্ছিলাম পায়ে হেঁটে।

১৯২৯ সালের জ্যৈষ্ঠ মাস। গ্রীষ্মের ছুটিতে তখন আমি আছি স্বগ্রামে। আম বট তেঁতুলের ছায়াভরা গ্রাম্য পথ। যে গ্রামে যাবো সেখানে এর আগে একটিবার মাত্র গিয়েছিলাম বছর কয়েক আগে—কাজেই রাস্তা পাছে ভুল হয়, এজন্যে লোকজনকে মাঝে মাঝে জিগ্যেস করতে করতে চলেচি।

একজন বললে—বাগান গাঁ যাবেন, তা অত ঘুরে যাচ্ছেন কেন বাবু? কাঁচিকাটার খেয়া পার হয়ে সবাইপুরের মধ্যে দিয়ে চলে যান না কেন?

তার কথা শুনে ভুল করেছিলুম, পরে বুঝলুম। প্রথম তো যে রাস্তায় এসে পড়লুম—সে হচ্চে একদম মেঠোপথ—তার ত্রিসীমানায় কোনো বসতি নেই। তার ওপর রাস্তার কিছু ঠিক নেই, কখনো মাঠের আলের ওপর দিয়ে সরু পথ, কখনো প'ড়ো জলা আর নলখাগড়ার বন, কখনো শোলা বন।

মাঠের গায়ে রৌদ্রও প্রচণ্ড। খেয়া পার হয়ে ক্রোশ খানেক অতি বিশ্রী পথে হেঁটে অত্যন্ত শ্রান্ত হয়ে পড়েচি। দূরে একটা বটগাছ দেখে তার তলায় বসে একটু জিরিয়ে নেবো বলে সেদিকে খানিকদূর গিয়ে দেখি আমার আর বটগাছের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড জলার ব্যবধান। সুতরাং আবার ফিরলুম।

মাঠের মধ্যে একটা রাখাল ছোকরা গোরু চরাচ্চে, তালপাতার ছাতি মাথায় দিয়ে। তাকে বললুম—সবাইপুর আর কতদূর রে?

—ওই তো বাবু দেখা যাচ্চে—

সে অনেকদূরে মাঠের প্রান্তে বনরেখার দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে। আমি খানিকটা এগিয়ে যেতেই সে আবার ডেকে বললে—কোথায় যাবেন বাবু?

—বাগান গাঁ। চিনিস?

—না বাবু। তা আপনি সবাইপুরের খোঁজ কচ্ছিলেন কেন তবে?

—ওই তো যাবার পথ—

—ও পথে আপনি কি যাতি পারবেন বাবু? সবাইপুরের বাঁওড় পার হবেন কেমন করে?

সবাইপুরের বাঁওড়ের নাম শুনেচি, কিন্তু সে যে এ পথে পড়ে তা জানতুম না। জিগ্যেস করে জানা গেল খেয়ার নামগন্ধ নেই—সাঁতার দিয়ে পার হওয়া ছাড়া উপায় কি? ফিরে আসবো ভাবচি, এমন সময় রাখাল ছোকরা আবার বললে—আপনি বাবু এক কাজ করুন, সবাইপুরের বিশ্বেসরা বাঁধল দিয়েচে, সেখেন দিয়ে পার হয়ে যান---

মাছ ধরবার জন্যে বাঁশ বেঁধে যে লম্বা জাল টাঙিয়েছে---বাঁশের ওপর চড়ে অতিকষ্টে বাঁওড় পার হয়ে এপারে এলুম।

কিছুদূরে গাঁয়েব মধ্যে একটা কাদের খড়ের বাড়ি।

আমি গিয়ে বললুম—ওহে একটু জল খাওয়াতে পারো?

একটা লোক বেড়া বাঁধছিল উঠোনের কোণে, সে বললে---আপনারা?

—ব্রাহ্মণ।

লোকটা তাড়াতাড়ি উঠে দুহাত জুড়ে প্রণাম করে বললে—তবে হবে না বাবু! আমরা জেলে---

---জেলে তাই কি? আমার ওসব—

—না বাবু, আমি হাতে করে দিতি পারবো না—তবে ওই কাঁটাল বাগানের মধ্যে টিউকল আছে—আপনি টিউকলে জল খেয়ে আসুন—একটা

ঘটি নিয়ে ধান দিচ্ছি। ঝকঝকে ক'রে মাজা একটা কাঁসার ঘটি লোকটা বাড়ির মধ্যে থেকে এনে দিলে। টিউকল অর্থাৎ টিউবওয়েলে জল খেয়ে আবার রাস্তা হাঁটি।

গ্রাম আর বড় নেই, মাঠ আর বনঝোপ। হঠাৎ চারিদিক অন্ধকার করে মেঘ করে এল—নীল কালবৈশাখীর মেঘ—হয়তো ভীষণ ঝড় উঠবে। কিন্তু তখুনি কিছু হ'ল না, মেঘটা থমকে গেল আকাশে। মেঘের ছায়ায় ছায়ায় পথ বেশ চলতে লাগলুম।

একজায়গায় একটা প্রকাণ্ড জিউলি গাছ। দিগন্তবিস্তীর্ণ মাঠের মধ্যে এই জিউলি গাছের দৃশ্য আমাকে কি মুগ্ধই করলো! দাঁড়িয়ে রইলুম সেখানে অনেকক্ষণ। প্রকাণ্ড গাছের সারা গা বেয়ে সাদা আঠা গলা মোমবাতির আকারে ঝুলচে—গাছের তলায় কলকাতার রাস্তার ধারের সাজানো পিচের মতো একরাশ আঠা। যেন আমি বাংলা দেশে নেই, আফ্রিকার মতো বন্য মহাদেশের অরণ্যপথ ধরে কোন্ অজ্ঞাত সুদূর গন্তব্যস্থান অভিমুখে যাত্রা করেচি। কি ভালোই যে লাগছিল!

আউশ ধানের ক্ষেতে সবে কচি কচি সবুজ জাওলা দেখা দিয়েচে। চারা ধানগাছের এক ধরনের সুন্দর ঘ্রাণ আসচে বাতাসে।

খাওয়া দাওয়ার কথা ভুলে গিয়েচি। বেলা এগারোটার কম হবে না কোন রকমে, কিন্তু সেজন্যে আমার কোন কষ্ট নেই। চারিধারে সবুজ আউশের জাওলা যেন বিরাট সবুজ মখমল বিছিয়ে রেখেচে পৃথিবীর কালো মাটির বুকে। নীলকণ্ঠ আর কোকিলের ডাক আসচে মাঠের চারিদিক থেকে—মেঘ-থম্‌কানো আকাশের নীলকৃষ্ণ শোভা আর অবাধ মুক্তির আনন্দ—সব মিলে এরা আমায় যেন মাতাল করে তুলেচে।

বৃষ্টি এল—একটা বড় বটতলায় আশ্রয় নিলুম। টপ্ টপ্ করে বড়

বড় বৃষ্টির ফোঁটা গাছের ডাল ভেদ করে মাঝে মাঝে গায়ে পড়তে লাগলো। বৃষ্টিতে বড় মাঠগুলো ধোঁয়ার মতো দেখাচ্চে।

বটতলায় একটা ছোট রাখাল ছেলে আমার মতো আশ্রয় নিলে। তার বয়েস দশ বারো বছরের বেশি নয়। হাতে পাঁচন, মাথায় তালপাতার টোকা।

—বড্ড পানি এয়েল বাবু—

—হ্যাঁ, তাই তো—বোস্ ওখানে—বাড়ি কোথায়?

—সুন্দরপুর বাবু। ওই ঝে দেখা যাচ্চে—

বৃষ্টি থামলে সুন্দরপুর গ্রামের মধ্যে ঢুকলাম। গ্রামের মধ্যে দিয়েই পথ। বড় বাড়ি দুচারখানা চোখে পড়লো, খুবই বড় বাড়ি —বর্ত্তমানে লোকজন আর বিশেষ কেউ থাকে না, পোড়ো বাড়িতে পরিণত হয়েচে। গ্রামের চারিদিকেই বড় বাঁশবন আর আমবন, যেমন এ অঞ্চলের সব গ্রামেই দেখতে পাওয়া যাবে।

একটা খুব বড বাড়ি দেখে তার সামনে দাঁড়ালুম। এক সময়ে খুব ভালো অবস্থার গৃহস্থেব বাড়ি ছিল এটা, নইলে আর এত বড় বাড়ি তৈরি করতে পারেনি। এখন যারা থাকে, তাদের অবস্থা যে-খুব ভালো নয়, এটা ওদের দোতলার বারান্দাতে পুরোনো চাঁচের বেড়া দেখে আন্দাজ করা কঠিন হয না। করোগেট টিন জোটেনি তাই বাঁশের চাঁচ দিয়েচে।

একজনকে জিগ্যেস্ করলুম—এটা কাদের বাড়ি বাপু?

—বাবুদের বাড়ি। এ গাঁয়ের জমিদার ছেলেন ওঁয়ারা—

—এখন কেউ নেই?

—থাকবেন না কেন বাবু, কলকাতায় থাকেন। বাবুদের ছোট সরিকেরা এখন থাকেন এ বাড়িতে। তেনাদের অবস্থা ভালো নয়। বাবুরা সব উকিল, মোক্তাগার, অনেক পয়সা রোজগার করেন, এখানে আর আসেন না।

অথচ যখন সুন্দরপুরের বাইরে এলুম, তখন মুসলমান ও কাঙ্গালী পাড়ার অবস্থা দেখে চোখ জুড়ুলো। ওরা প্রায়ই বাস করে ফাঁকা মাঠে, বাড়ির কাছে বনজঙ্গল কম, খড়ের বাড়ি হ'লেও বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, ধানের গোলা দুতিনটি অনেকের বাড়িতেই চোখে পড়ে, তরিতরকারির বাগান করে রেখেচে বাড়ির পাশেই, দুপাঁচটা গোরু সকলেরই আছে।

এদের স্বাস্থ্য খুব খারাপ নয়—যারা খেটে খায় এমন লোকের মধ্যে ম্যালেরিয়া হতে বেশি দেখিনি—ডায়েবিটিস ডিসপেপসিয়া, ব্লাডপ্রেসারের নামগন্ধ নেই সেখানে।

ওরা যখন মরে, তখন বেশির ভাগ মরে কলেরাতে। শীতের শেষে বাংলার পাড়াগাঁয়ে চাষাপাড়া মরে ধুলধাবাড হয়ে যেতে দেখেচি কলেরাতে—অথচ ভদ্রলোকের পাড়ায় এ রোগ খুব কম ঢুকতে দেখেচি।

তবে আজকাল গ্রামে গ্রামে নলকূপ বসবার ফলে ম্যালেরিয়া যতটা না কমুক, কলেরার মড়ক অনেক কমেচে। নলকূপের জল বারোমাস ব্যবহার করে অথচ বারোমাস ম্যালেরিয়ায় ভুগে জীর্ণ শীর্ণ, এমন লোক বা পরিবাব অনেক দেখেচি।

কিন্তু আমি যা বলতে যাচ্ছিলুম।

পায়ে হেঁটে বাংলায় অনেক গ্রামেই ঘুরেচি, সর্বত্রই দেখেচি, সমান অবস্থা—ভদ্রলোকের পতন, মুসলমান ও অনুন্নত জাতির অভ্যুদয়. ভদ্রলোকের পাড়ায় ভগ্ন অট্টালিকা, মজাপুকুর, ভগ্ন দেবালয়, ঘন বনজঙ্গল—আর চাষা-পাড়ায় ক্ষেতভরা তরিতরকারি, গোয়ালভরা গোরু, ধানের মরাই, ছাগল, ভেড়া, হাঁস ইত্যাদি গৃহপালিত পশুপক্ষীর পাল। হলপ নিয়ে অবিশ্যি বলতে পারব না যে সব চাষারই এই অবস্থা—তবে অনেকেরই বটে।

ভদ্রলোকদের মধ্যে সাধারণত যারা শিক্ষিত ও উপার্জনক্ষম, তারা থাকে

বিদেশে শহরে, আর ঝরতি-পড়তি মাল যেগুলি, তারা নিরুপায় অবস্থায় পড়ে থাকে গ্রামে, শিক্ষিত ও প্রবাসী জ্ঞাতিদের পরিত্যক্ত বাড়ি-ঘরে।

এরা বেলা বারোটা পর্যন্ত কোনো গাছতলায় কি কারো বাড়ির চণ্ডীমণ্ডপে বসে তামাক টানে আর বাজে গল্প ও পরচর্চা করে, সন্ধ্যাবেলা বসে তাস খেলে কিংবা শখের যাত্রার দলে আখড়া দেয়। এ অঞ্চলে থিয়েটার বড় একটা দেখিনি কোথাও—ওটা হ'ল কলকাতা-ঘেঁষা জায়গার ব্যাপার।

এই সব ভদ্রবংশের লোকের না আছে খাটবার ক্ষমতা, না আছে উত্তম উৎসাহ কোনো কাজে। কোনো নবাগত উৎসাহী লোক জনহিতকর কোনো কাজ করতে চাইলে এরা তাদের বুঝিয়ে দেবে যে ও রকম অনেক হয়ে গেছে, ও করে কোনো লাভ নেই। কুঁড়ে লোকেরা সর্বজ্ঞ হয় সাধারণত।

শুধু সুন্দরপুর নয়, অন্যান্য গ্রামেও ঠিক এই রকম দেখেচি এবং পল্লী-গ্রামের ভবিষ্যৎ ভেবে হতাশ হয়েচি। আর পঞ্চাশ বছর এইভাবে চললে, গ্রাম থেকে উচ্চবর্ণের হিন্দু নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে—এখনই যেতে শুরু করেচে।

সুন্দরপুর ছাড়িয়ে একটা বড় বাঁওড় পড়লো সামনে, নদীর মতো চওড়া, জলও বেশ স্বচ্ছ, পার হবো কি করে বুঝতে পারচি নে, এমন সময়ে একটি বৃদ্ধার সঙ্গে দেখা হ'ল। সে নিচু হয়ে জলের ধারের কলমির বন থেকে কচি কলমি শাক তুলে আঁটি বাঁধছিল।

জিগ্যেস করতেই সে হাত তুলে দেখিয়ে দিয়ে বললে—সামনে দিয়ে যাও বাবা, ওইদিকি আগাড় পড়বে।

বাঁওড়ের আগাড় মানে বাঁওড়ের একদিকের প্রান্তসীমা, যেখানে গিয়ে

বাঁওড় শুকিয়ে বা মজে শেষ হয়ে গেল—সুতরাং ঘুরে পার হওয়া যায় সেখানটাতে।

আধ মাইলের কিছু বেশি যেতে আগাড় দেখা গেল—সেখানে একটা বড় বট গাছের তলায় কি একটা হচ্চে দূর থেকেই দেখতে পেলাম।

কাছে গিয়ে দেখি ওপারে বাঁওড়ের ধারে একটা বট গাছের তলায় কারা কলের গান বাজাচ্চে, আর তাই শুনবার লোভে প্রায় পঞ্চাশ ষাটটি ছেলে-মেয়ে-ঝি-বৌ একত্র জড় হয়েচে। বাঁওড়ের ঘাটে জল নিতে এসে বউয়েরা শুনচে, সবই চাষা লোক, এ সব গ্রামে ভদ্রলোকের বাস আদৌ নেই।

বেলা প্রায় একটা হবে। আমিও একটু বিশ্রাম করে নেবার জন্যে বটতলার ছায়ায় গিয়ে বসলুম। কলের-গানওয়ালারা গাছের উঁচু শেকড়ের ওপর বসেচে, আমায় ভদ্রলোক দেখে ওরা লাজুক মুখে আমার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখলে।

সস্তা খেলো গ্রামোফোনের টিনের লম্বা চোঙের মুখ দিয়ে কর্কশ, উচ্চ, অস্বাভাবিক ধরনের গলার আওয়াজ বেরুচ্চে। বাজে হালকা সুরের গান বা ভাঁড়ামির রেকর্ড-সবই—আমি জিগ্যেস করলুম—তোমাদের ভালো কিছু আছে?

—বাবু, আপনাদের যুগ্যি কনে পাবো, এ সব এই চাষা ভুলোনো—

—তোমরা যাবে কোথায়?

—আমাদের বাড়ি ওই নাভারনের কাছে। কুলে রণঘাটের মেলায় কলের গান নিয়ে যাচ্চি বাবু, যদি দু' চার পয়সা হয়—আপনাদের শুনবার যুগ্যি এ জিনিস নয়, সে আমরা জানি।

—তোমরা কি এমনি মেলায় মেলায় বেড়াও?

—হ্যাঁ বাবু, ইদিকির সব মেলা, ওই ডুমোর মেলা, হল্‌দা-সিঁদরিনীর

চড়কের মেলা, গাঁড়া পোতায় চড়কের মেলা, গোপাল নগরের বারোয়ারির মেলা, বেনাপোলে হরিদাস ঠাকুরের মেলা—সব জায়গায় আমরা যাই। আমাদের এতেই পয়সা রোজগার—

—কি রকম রোজগার হয়?

—তা বাবু, আপনার কাছে আর বলতি কি, আগে এক একটা মেলায় ত্রিশ চল্লিশ করে পাতাম। পাটের দর একবারে উঠিছিল আটাশ টাকা। সেবার সব মেলা বেড়িয়ে পাঁচ ছ'শো টাকা পাই। পাটের দর যেবার কম থাকে, সেবার এত দেবে কে। চাষার হাতে পয়সা থাকলি তো দেবে। চাষার হাতেই নক্ষি বাবু—আসুন বাবু একটা বিড়ি খান —শোনবেন গান? ওরে আলি, একখানা সেই বাজনার রেকর্ট ছেলো যে, সেখানা দে—বাবু ওসব গানের আর কি শোনবেন—

এরা অশিক্ষিত মুসলমান, কিন্তু এদের যে উৎসাহ ও উদ্যম দেখেচি, শিক্ষিত হিন্দু ভদ্রসন্তানের তার অর্ধেকও থাকলে বেকার সমস্যা এত জটিল হয়ে দেখা দিত না। এদের সঙ্গে মনে মনে হিন্দু ভদ্রসন্তানের তুলনা করবার সুযোগ এবারই আমার ঘটেছিল, সে কথা পরে বলচি। আমি সেখান থেকে উঠে আর মাইল দুই ধানক্ষেতের আলের ওপব দিয়ে হেঁটে এসে এমন এক জায়গায় পড়লুম, যেখানে কাছে কোনো গ্রাম নেই।

মাঠের মধ্যে একটা চমৎকার বটগাছ তার বড় ডালপালা মাটিতে নুইয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কেউ কোনো দিকে আছে কিনা দেখে একটা মোটা নিচু ডালে চড়ে বসলুম।

মনে মনে ভেবে দেখলুম, বেলা দুটো বাজে, এখন পিসিমার বাড়ি গিয়ে পড়লে তিনি রান্না চড়াবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়বেন—সে কষ্ট আর কেন তাঁকে দেওয়া—তার চেয়ে আর ঘণ্টাখানেক গেলে বলতে পারবো যে কোথাও থেকে খেয়ে এসেচি।

আধঘণ্টাও হয়নি, এমন সময় পেছন থেকে কে বলে উঠলো—এখানে কি কচ্চেন বাবু ?

পেছন ফিরে চেয়ে দেখি একজন বৃদ্ধ, তার মাথায় ধামাতে খুব বড় একটা তেলের ভাঁড়।

একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়তে হ'ল বৈকি, তাডাতাড়ি নেমে পড়ি ডালটা থেকে। একটু হেসে বলি---এই একটু হাওয়া খাচ্চি, বড্ড গরম—

যেন হাওয়া খেতে হ'লে গাছের ডালে চড়াই প্রশস্ত উপায়।

---কোথায় যাবেন আপনি ?

---বাগান গাঁ--- কতদূর জানো ?

---চলুন বাবু, আমি ত সেই গাঁয়েই থাকি---কাদের বাড়ি যাবে ?

---মুখুয্যেদের বাড়ি।

লোকটা যে ভাবে আমার দিকে চাইতে লাগলো তাতে আমার মনে হ'ল আমার মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ নয়।

এই গ্রামে আমি ছেলেবেলায় একবার এসেছিলুম---তখনই বেশ জঙ্গল দেখে গিয়েচি, সে জঙ্গল এখন সুন্দরবনকে ছাড়িয়ে যাবার পাল্লায় মেতেচে। এমন বন যে এ'কে অরণ্য নামে অভিহিত করা চলে অনায়াসেই। এই ভীষণ জঙ্গলের মধ্যে কি করে মানুষ বাস করে তা ভেবে পাওয়া দুষ্কর।

দু-তিন দিন সে গ্রামে ছিলুম। তিনঘর মাত্র ভদ্রলোকের বাস, তিনঘরই ব্রাহ্মণ—তা বাদে কামার, কলু, কাঙ্গালী আজ আছে হিন্দুর মধ্যে—বাকি চল্লিশ পঞ্চাশ ঘর মুসলমান। সাধারণত হিন্দুর চেয়ে মুসলমানদের স্বাস্থ্য ভালো।

সকলের চেয়ে খারাপ অবস্থা হিন্দু ভদ্রলোকের। তাদের স্বাস্থ্য নেই, অর্থ নেই। মুখুয্যেরা এককালে এ গ্রামের জমিদার ছিলেন—এখন তাঁদের ভাঙা কোঠাবাড়ি আর নারকেল গাছের লম্বা সারি ছাড়া আর

বিশেষ কিছু নেই—গোলায় পিড়ি পড়ে আছে, গোলা বহুকাল অন্তর্হিত, সংস্কার অভাবে অট্টালিকার জীর্ণ দশা, ফাটলে বট অশ্বথের গাছ, সাপের খোলস।

যে ক'জন ছেলে-ছোকরা এই তিন বাড়িতে থাকে, সন্ধ্যাবেলায় তারা মুখুয্যে-বাড়ির চণ্ডীমণ্ডপে বড় তাসের আড্ডা বসায়—দাবাও চলে। এরা কোনো কাজ করে না, লেখাপড়ার ধারও ধারে না। অর্থ উপার্জনের ক্ষমতা এদের মধ্যে যা ছিল, তা ক্রমে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। দিন কতক পরে এরা সম্পূর্ণ অকর্মণ্য প্রকৃতির বেকার হয়ে পড়বে।

পল্লীবাসী হিন্দু ভদ্রলোকের এই সমস্যা সর্বত্রই উগ্রমূর্তিতে দেখা দিয়েচে। অর্থ নেই বলেই এদের স্বাস্থ্যও নেই—মনে স্ফূর্তি নেই, পঁচিশ বছরের যুবকের মন পঞ্চাশ বছরের বৃদ্ধের মতো নিস্তেজ।

আর একটা জিনিস লক্ষ্য করেচি তা এর চেয়েও সর্বনাশজনক। পল্লীগ্রামে এই ধরনেব ভদ্রসন্তানদের মধ্যে পানদোষ অত্যন্ত ছড়িয়ে পড়েচে। প্রায় সকলেরই এ দোষটি আছে, যে মদ পয়সা অভাবে না জোটাতে পারে, সে সস্তার তাড়ি খায়। এর সঙ্গে আছে গাঁজা ও সিদ্ধি।

আমি এই গ্রামেই একটি লোককে দেখলুম সে বর্তমানে একেবারে ঘোর অকর্মণ্য ও স্বাস্থ্যহীন হয়ে পড়েচে। পূর্বে সে কোথায় চাকুরি করতো, চাকুরি ছেড়ে দিয়ে গ্রামে বসে প্রথমটাতে মহা উৎসাহে চাষ-বাস আরম্ভ করে। কিন্তু কৃষিকার্যের সাফল্যের মূলে যে কষ্টসহিষ্ণুতা ও অভিজ্ঞতা প্রয়োজন, তা তার ছিল না, ফলে হাতের টাকাগুলি নষ্ট হতে দেরি হয়নি। এখন বাড়ি বসে গাঁজা খায় এবং নাকি হরিনাম করে।

এ গেল পুরুষদের কথা। মেয়েদের জীবন আরও দুঃখময়। তাদের জীবনে বিশেষ কোনো আনন্দ-উৎসবের অবকাশ নেই, ধানভানা, রান্না, সংসারের দাসীবৃত্তি এই নিয়েই তাদের জীবন। অবসর সময় কাটে পরের

বাড়ির চালচলনের নিন্দাবাদে। এতটুকু বাইরের আলো যাবার ফাঁক নেই ওদের জীবনে কোনো দিক থেকেই। অথচ তারা নিজেদের শোচনীয় অবস্থা সম্বন্ধে আদৌ সচেতন নয়। তারা ভাবচে, তারা বেশ আছে। এ সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা এই বারেই হয়েছিল।

পাশের বাড়িতে দুপুরে নিমন্ত্রণ, পিসিমার সম্পর্কে তাঁরাও আমার আত্মীয়। সেই বাড়িরই একটি বধূ, ত্রিশের মধ্যে বয়স, দেখতে শুনতে নিতান্ত খারাপ নয়—আমার খাবার সময় পরিবেষণ করলে। তারপর বাড়ির ছেলে-দুটি বললে—আসুন একটু দাবা খেলা যাক। আমি দাবা খেলা জানলেও ভালো জানি না, ওরা সে আপত্তি কানে তুললে না—অগত্যা ওদের মধ্যে গিয়ে বসলুম ওদের সঙ্গে।

বধূটি আমায় পান মশলা দিতে এল।

আমি বললাম—বৌদি, বসুন না—

---না ভাই, বসলে চলে, কত কাজ—তোমরা থাকো শহরে, পাড়া-গাঁয়ের কিই বা জানো--

—আচ্ছা, বৌদি, আপনি কখনো শহর দেখেন নি ?

—দেখবো না কেন, কেষ্টনগর গোযাড়ি দু দুবার গিয়েচি। সে অনেক দিন আগে। ভালো কথা, আমার একটা উপকার করবে ঠাকুরপো ?

—বলুন না—কেন করব না ?

—আমার মেয়ে বীণার একটা পাত্র দেখে দাও না, কত জায়গায় তো ঘোরো—

—সে কি বৌদি, কতটুকু মেয়ে ও ! এগারো-বারো বছরের বেশি নয়, এখুনি ওর বিয়ে দেবেন ? ও লেখাপড়া শিখুক তার চেয়ে, কেষ্টনগরে আপনার মামার কাছে ওকে রেখে দিন। এ গাঁয়ে থাকলে তো পড়াশুনোর আশা কিছুই দেখচি নে।

—কি হবে ভালো লেখাপড়া শিখে ? সেই বিয়ে করতেই হবে, শ্বশুরবাড়ি যেতেই হবে—হাঁড়ি ধরতে হবে। মেয়েমানুষের তাই ভালো। এই যে আমি আজ ষোল বছর এই গাঁয়ে এদের বাড়ি এসেচি, খাটুচি উদয়াস্ত দেখচো তো—আসবার দশদিনের মধ্যে হেঁসেলের ভার দিলেন শাশুড়ি, তার পর তিনি মারা গেলেন, আর সেই হেঁসেল এখনও আগলে বসে আছি।

—বেশ ভালোই লাগে ?

—কেন লাগবে না ভাই। তোমরা এখন পুরুষমানুষ, উড়ু উড়ু মন। এ আমার নিজের সংসার, নিজের ছেলেমেয়ে, কেন খারাপ লাগবে বলো। লেখাপড়া করে কি দুটো হাত বেরুতো ?

—আচ্ছা কোনো কিছু দেখতে আপনার ইচ্ছে করে না ? কোনো বই পড়তে, কি কোথাও বেড়াতে ?

—তা কেন করবে না—নবদ্বীপে রাসের মেলায় একবার যাবো ভেবে রেখেচি। বই কোথায় পাচ্চি এ পাড়াগাঁয়ে, আর পেলেও পড়বার সময় আমার নেই। আমরা কি মেমসায়েব যে বসে বসে সব সময় বই পড়বো ?

—বীণাকে একটুও লেখাপড়া শেখান নি ? ক খ জানে তো ?

—তা জানে। ডেকে জিগ্যেস করো না ? রাঁধতে জানে, ধান ভানতে শিখেচে, দিব্যি চিঁড়ে কুটতে পারে, আমার সঙ্গে থেকে থেকে শিখেচে—সব দিক থেকে মেয়ে আমার—তবে ওই দোষ, মাঝে মাঝে ম্যালেরিয়ায় ভোগে। এই সেদিন জ্বর থেকে উঠলো—পেটজোড়া পিলে, হাবুল ডাক্তারের ওষুধ দুশিশি খাইয়ে এখন একটু—

বাগান গাঁ থেকে চলে আসবার পথে আমার কত বার মনে হয়েচে পল্লীজীবনের এই সব গুরুতর সমস্যার কথা। এসব নিয়ে প্রবন্ধ লেখা চলতে পারে কিন্তু এ সমস্যার সমাধান করবে কে ? এ প্রশ্নের উত্তর নেই।

এবারের ভ্রমণ সম্পর্কে আর একটি ঘটনা আমার বড মনে আছে। ফিরবার পথে একটা সাঁকোর ওপর বসেচি, বেলা তিনটে—জ্যৈষ্ঠমাসের খর রৌদ্র মুখের ওপর এসে পড়েচে, একটি বৃদ্ধা কাঠ কুড়িয়ে ফিরচে। আমার দিকে চেয়ে সে আমার সামনে দাঁড়ালো। তারপর মায়ের মতো স্নেহসিক্ত উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললে—বাবা, বড্ড রদ্দুর লাগচে মুখটাতে, উঠে এসো—

বৃদ্ধার গলার সুরে আন্তরিক স্নেহ ও দরদের পরিচয় পেয়ে আমি চমকে উঠলুম যেন। সে আবার বললে, উঠে এসো বাবা, ওখানডাতে বোসো না—পড়ন্ত রদ্দুরটা—

হয়তো আমি উঠে গিয়েছিলাম অন্যত্র, হয়তো তার সঙ্গে আমার আরও কি কথা হয়ে থাকবে—কিন্তু সে সব আর আমার মনে নেই। সে লিখতে গেলে বানানো গল্প হয়ে যাবে। এতদিন পরেও ভুলিনি কেবল বৃদ্ধার সেই মাতৃমূর্তি, তার সেই দরদভরা উদ্বিগ্ন গলার সুর।

আমি চাকুরি উপলক্ষে একবছর পূর্ববঙ্গ ও আরাকানের মংডু অঞ্চলে যাই। সে সময় রেলে স্টীমারে আমার অনেক অদ্ভুত ধরনের অভিজ্ঞতা হয়। অন্য কোনো ভাবে এদের বলা যায় না, এক এই ধরনের ভ্রমণকাহিনী ছাডা। তাই এখানে সেগুলি লিপিবদ্ধ করবো। গোড়া থেকেই কথাটা বলি।

কলকাতায় বসে আছি, চাকুরি নেই—যদিও চাকুরির চেষ্টায় ঘোরাঘুরি কচ্চি।

একটি মাড়োয়ারী ফার্মের বাইরে দেখলুম বিজ্ঞাপন দেওয়া আছে, দুজন লোক তারা চায়। কোনোদিকে না চেয়ে সোজা ঢুকে পড়লুম আপিসের ভেতরে। আপিসটি স্বনামধন্য ব্যবসায়ী কেশোরাম পোদ্দারের। বিজ্ঞাপন দেখে এসেচি শুনে আপিসের দারোয়ান আমায় একটা ছোট ঘরে

নিয়ে গেল। সামনেই বসে ছিলেন কেশোরাম পোদ্দার, তখন অবিশ্যি চিনতুম না।

কেশোরাম পোদ্দার হিন্দিতে জিগ্যেস্ করলেন—আপনি কি পাশ?

বললুম, বি এ পাশ করেচি ও বছর।

—কি জাতি?

—ব্রাহ্মণ।

—বক্তৃতা দিতে পাবেন?

কিসের বক্তৃতা? ভালো বুঝতে পারলুম না, কিন্তু চাকুরির বাজার যেমন কড়া, তাতে কোনো কিছুতেই হঠলে বা ভয় খেলে চাকুরি-প্রাপ্তির যা-ও বা সম্ভাবনা ছিল তাও তো গেল। এ অবস্থায় বক্তৃতা তো সামান্য কথা, কেশোরামজি যদি জিগ্যেস করতেন "আপনি নাচতে জানেন?" তা হ'লেও আমার মুখ দিয়ে হঁা ছাড়া না বেরুতো না।

স্থতরাং বললুম, জানি।

—আচ্ছা, আপনার ঠিকানা দিয়ে যান, কাল বেলা দশটার সময় আসবেন।

পরদিন দশটার সময় কেশোরামবাবুর আপিসে গিয়ে দেখি লোকে লোকারণ্য। আমার মতো আরও পঞ্চাশ ষাটটি বেকার কেশোরামবাবুর খাস বাইরের হলে অপেক্ষা করচে। এরা সবাই বক্তৃতা দেবে আজ এখানে। বুঝলুম, সবারই মরীয়া অবস্থা। বক্তৃতা বক্তৃতাই সই।

আমার পূর্বে একে একে আট দশ জন লোকের ডাক পড়লো। এদের মধ্যে বৃদ্ধ থেকে ছোকরা পর্যন্ত সব রকমের লোকই আছে। লক্ষ্য করে দেখলুম কেউ তুমিনিট পরে ফিরে আসচে, কেউ আসচে পাঁচমিনিট পরে—কেউ বা ঢুকবা-মাত্র বেরিয়ে আসচে।

অবশেষে আমার ডাক পড়লো। কেশোরামজি দেখলুম তাঁর খাস

কামরায় নেই, ওদিকের বারান্দায় দূর কোণে একখানা চেয়ারে তিনি বসে।

কাছে যেতেই বললেন, আপনি কিছু বলুন—

—ইংরিজিতে না বাংলাতে ?

—বাংলায় বলুন—

ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউটের আবৃত্তি-প্রতিযোগিতার জন্যে বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা খানিকটা মুখস্থ করেছিলুম, মনেও ছিল। সামনের থামের দিকে চেয়ে মরীয়ার স্বরে তাই আবৃত্তি করে গেলুম। কেশোরাম খুশি হ'লেন। চাকুরি আমার হয়ে গেল।

দিন পাঁচ-ছয় পরে ট্রেনে কুষ্টিয়া গিয়ে নামলুম। কলকাতার কাছে কুষ্টিয়া, নদীয়া জেলায় একটা মহকুমা। এখানে কি থাকবে ? কিন্তু আমার কাছে একটা দেখবার জিনিস ছিল। আমার মাতামহ সেকালের এঞ্জিনিয়ার ছিলেন, গোরাই নদীর ওপর রেলওয়ে ব্রিজ তিনি তৈরি করেন এ গল্প অনেকদিন থেকে মাতুলালয়ে শুনে আসচি।

ঘুমের ঘোরে ভালো দেখতে পেলুম না ব্রিজটা।

জীবনে চাকুরি উপলক্ষে সেই প্রথম বিদেশে যাওয়া। ডাকবাংলোয় গিয়ে উঠলুম, তিনদিন মাত্র এখানে থাকতে হবে।

পথে বেরিয়েচি, আমার এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা, কলেজে তার সঙ্গে পড়েছিলুম। সে আমায় দেখে তো অবাক। ধরে নিয়ে গেল তাদের বাসাতে একরকম জোর করেই—আমার কোনো আপত্তি শুনলে না।

আমি তাকে বললুম---ভাই, গোরাই নদীর ব্রিজটা দেখাবি ?

—সে আর বেশি কথা কি, চলো আজই।

বনজঙ্গল আর কচুবন ঠেলে ঠেলে গোরাই নদীর ধারে আমরা গিয়ে পৌঁছলাম। গোরাই নদীর উভয় তীরের মাঠে, জঙ্গল বাঁশবনের শোভা

দেখে সত্যি আমার চোখ জুড়িয়ে গেল। কত কাল কলকাতায় পড়ে আছি, বেরুতে পারিনি কোথাও।

বন্ধুকে বললুম—ভাই, বসি একটু—

—এখানে কেন? চলো এগিয়ে—

—ভাই, বেশ লাগচে। তুমিও বোসো না—

—নাঃ এসব কবিদের নিয়ে কোথাও বেরুনোই দেখচি দায়। বোসো তবে।

উঁচু পাড়ের নিচেই বর্ষার গোরাই নদী। সাদা সাদা এক রকম ফুল ফুটে আছে জলের ধারে। গাছপালায় শ্যামলতার প্রাচুর্য দেখে মন যেন আনন্দে নেচে ওঠে। তখনকার দিনে আমার একটা বড় বাতিক ছিল, নতুন জায়গায় নতুন কি কি বনের গাছ জন্মায় তাই লক্ষ্য করা। গোরাই নদীর ধারের মাঠে ভালো করে লক্ষ্য করে দেখলুম, যশোর জেলাতেও যা, এখানেও প্রায় সবই সেই গাছ, সেই শেওড়া, ভঁাট, কালকাসুন্দে, ওল, বনচালতে। বেশির মধ্যে এখানে দু একটা বেতসঝোপ নদীর ধারে, আমাদের দেশে বেতগাছ চোখে পড়ে না।

বেলা ন'টার সময় গোরাই নদীর পুল দেখে বাড়ি ফিরে এলুম। আমার বন্ধু বললে—চলো, এখানকার এক কবির সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দিই—

ভদ্রলোকের নাম তারাচরণবাবু বোধহয়, আমার ঠিক মনে নেই। গোরাই নদীর ধারেই তাঁর বাড়ি। বৃদ্ধ ভদ্রলোক। অমন অমায়িকস্বভাব লোক বেশি চোখে পড়ে না। আমি তখন ছোকরা আর তিনি আমার বাপের বয়সী। কিন্তু তাঁর আচারব্যবহারে কথাবার্তায় এতটুকু পরিচয় দিলেন না যে তিনি বয়সে বা জ্ঞানে আমার চেয়ে অনেক বড়। এই বৃদ্ধ ভদ্রলোকের মতো জ্ঞানপিপাসু লোক মফস্বলের ছোট শহরে ক্বচিৎ দু-একটি

দেখা যায় কি না যায়। যতক্ষণ রইলুম, তিনি আমার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ও ব্রাউনিং সম্বন্ধে আলোচনা করলেন, কিন্তু তা যেন কত সঙ্কোচের সঙ্গে। যেন পাছে আমি একটুও মনে করি যে তিনি আমার সামনে তাঁর বিদ্যাবত্তা ও পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করচেন। মোহিনী মিল নামক বিখ্যাত কাপড়ের কল এখানেই অবস্থিত, ভেবেছিলুম দেখবো, কিন্তু সময়ের অভাবে হয়ে উঠলো না।

পথে পড়ে গেলুম বিপদে, ট্রেনের যে কামরায় উঠেচি সে কামরায় আর দুজন বন্দুকধারী সেপাই টাকার থলে পাহারা দিয়ে কোথায় যেন নিয়ে যাচ্চে।

আমাকে ওরা প্রথমে বারণ করেছিল সে গাড়িতে উঠতে। কিন্তু গাড়িতে বেজায় ভিড় ছিল বলে আমাকে বাধ্য হয়ে ওদের কামরায় উঠতে হ'ল। গাড়ি তো ছাড়লো—মাঝ রাস্তায় তারা কি বলাবলি করলে। একজন চলন্ত গাড়ির ওদিকের দরজা খুললে—আর একজন আমার হাত ধরে টানতে লাগলো—ওরা গাড়ি থেকে আমায় ফেলে দেবে!

আমি প্রথমটা ওদের মতলব কিছু বুঝতে পারিনি। কারণ এ ধরনের ব্যাপার ধারণা করা শক্ত—আমি নিরীহ রেলযাত্রী, আমাকে তারা কেন ফেলে দেবে, এর যুক্তিসঙ্গত কারণও তো একটা খুঁজে পাইনে।

ওদের অভিসন্ধি সম্বন্ধে আমার প্রথম সন্দেহ হ'ল গাড়ির ওদিকের দরজা খুলতে এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাকে হাত ধরে টানতে। ওদের সঙ্গে জোরে পারবো না বেশ বুঝলাম—তখন আর একটা স্টেশনে না আসা পর্যন্ত যে ভাবেই হোক আমায় রেলগাড়ির মধ্যে থাকতে হবে।

আমি ওদের বললুম—কেন তোমরা আমাকে এ রকম করচো?

ওরা সে কথার কোনো জবাব দেয় না, শুধু হাত ধরে টানে। ওরা সে রাত্রে আমায় নিশ্চয়ই ফেলে দিতো—কিন্তু ওদের প্রধান অসুবিধে দাঁড়ালো গাড়ির দরজাটা। দরজা যদি বাইরের দিকে খোলা থাকতো তবে দুজনে

মিলে ঠেলতে পারতো বা ওই রকম কিছু। কিন্তু এটা ভিতর দিকে খোলা যায়, সেই ধরনের দরজা। গাড়ির ঝাঁকুনিতে সেটা কেবল ঝুপ ঝুপ করে বন্ধ হয়ে যাচ্চে—সুতরাং একজনকে ধরে থাকার দরকার সেটাকে।

আমি ওদের সঙ্গে কোনো চেঁচামেচি কি গোলমাল করচিনে—মাথা অনেকটা ঠাণ্ডা করে রেখেচি, কারণ আমার মনে হ'ল ক্রমে যে এরা মাতাল হয়েচে—এরা কি করচে এদের জ্ঞান নেই। ঝগড়া কি চেঁচামেচি করলে মাতাল অবস্থায় রেগে চাই-কি আমায় গুলি করেও বসতে পারে।

ট্রেনের বেগও কমে না, কোনো স্টেশনেও আসে না। শেকল টানবার উপায়ও নেই—কারণ যে দরজা দিয়ে তারা আমায় ফেলে দেবে, শেকল টানতে গেলে তো সেই দরজার কাছেই যেতে হয়—দরজার মাথার ওপর শেকল টানার হাতল।

আমি ওদের ক্রমাগত বোঝাবার চেষ্টা করচি, একজনকে মেরে ফেলে তাদের লাভ কিছু নেই—বরং তাতে পুলিশের ভীষণ হাঙ্গামে পড়ে যেতে হবে। তা ছাড়া, নরহত্যা মহাপাপ, রামচন্দ্রজি ওতে যে রকম চটেন অমন আর কিছুতেই চটেন না। স্বর্গে যাবার অতবড় বাধা আর নেই। তুলসীদাসের দোঁহা এক আধটা মনে আনবার চেষ্টা করলুম—কারণ 'রামচরিত-মানস' আমার পড়া ছিল—কিন্তু বিপদের সময় ছাই কি কিছু মনে আসে!

এমন সময়ে গাড়ির বেগ কমে এল—কোনো এক স্টেশনে আসচে এতক্ষণ পরে। মাঠের মধ্যে গাড়ি দাঁড়িয়ে গেল, সামনেই কি স্টেশন, লাইন ক্লিয়ার দেওয়া নেই সিগন্যালে। গাড়ি দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে ওরা আমায় ছেড়ে দিলে। আমিও একটি কথাও বললুম না। মাতালকে চটিয়ে কোনো লাভ নেই।

পরের স্টেশনে গাড়ি দাঁড়ালো একটু পরেই। আমি আমার জিনিসপত্র

সামান্য যা ছিল, নিয়ে অন্য কামরায় চলে গেলুম। রাত তখন এগারোটা কি তার বেশি। একবার ভাবলুম গার্ডকে ঘটনাটা জানাই—কিন্তু ছোট স্টেশন, অন্ধকার রাত—গার্ডের গাড়ি অনেক পেছনে, যেতে যেতে ট্রেন ছেড়ে দেবে।

মনে মনে ভাবলুম, রাজবাড়ি স্টেশনে ট্রেন এলে রেলপুলিশকে বলবো—কিন্তু রাজবাড়ি নেমে আর গোলমালের মধ্যে যেতে ইচ্ছে হ'ল না। মাতালদের সঙ্গে একগাড়িতে ওঠা আমারই ভুল হয়েছিল।

এর পরে যেখানে গিয়ে নামলুম, সেটা হ'ল ফরিদপুর।

নাম শুনে আসচি চিরকাল, অথচ কখনো দেখিনি ফরিদপুর—কি ভাল লেগে গেল জায়গাটা!

এখানে পূর্ববঙ্গের মেয়েদের স্নেহস্পর্শ লাভ করবার সৌভাগ্য আমার সর্বপ্রথম ঘটেছিল। কি জানি কেন তখনও মনে হয়েছিল এবং আমার আজও মনে হয় পূর্ববঙ্গের মেয়েরা উদারতায়, নিঃসঙ্কোচ আত্মীয়তায় ও মনের ঐশ্বর্য্যে আমাদের পশ্চিম বঙ্গের মেয়েদের চেয়ে অনেক বড়। লেখা-পড়ার দিক থেকেও পূর্ববঙ্গের মেয়েরা আমাদের অঞ্চলের মেয়েদের চেয়ে শিক্ষিতা। এমন সব পরিবার দেখেচি তারা আব কিছু না পডালেও অন্তত ম্যাট্রিকটা পাশ করিয়ে রাখে। ম্যাট্রিক পাশ লেখাপড়া শেখার বড় মাপকাঠি না হতে পারে, কিন্তু পিতামাতা যে মেয়েদের শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন, এটুকুও তো তা থেকে বোঝা যায়।

ফরিদপুরে ডাকবাংলোয় গিয়ে উঠবাব আগে আমার মনে পডলো আমহার্স্ট স্ট্রীটের মেসে যে অমুক বাবু থাকতো, তার বাড়ি ফরিদপুর, দেখি তো খোঁজ করে।

দেখা পেলাম এবং ভদ্রলোক (বন্ধু ঠিক নন, কারণ এর পূর্বে তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল সামান্যই) আমাকে তাঁর বাড়ি নিয়ে গেলেন।

বাড়ি যাবার এক ঘণ্টার মধ্যেই তাঁর মা আমাকে বাড়ির মধ্যে নিয়ে গিয়ে বসালেন। এমনভাবে আলাপ করলেন, যেন আমি কত কালের পরিচিত।

তিনদিন সেখানে ছিলুম, কাজ শেষ করে বিকেলের দিকে স্টীমারে ফরিদপুর থেকে বেরুবো, ঘোড়ার গাড়ি ডেকে নিয়ে বাসায় জিনিসপত্র তুলতে এলাম।

বাইরের যে ঘরটাতে থাকি, সেটাতে ঢুকে দেখি বন্ধুটির দিদি আমার বিছানাটা বেশ ভালো করে ঝেড়ে পেতে দিচ্চেন। মশারিটা টান টান করে টাঙিয়ে দেবার চেষ্টায় আপাতত তিনি খুব ব্যস্ত।

আমি বন্ধুর দিদির সঙ্গে তত বেশি আলাপ করিনি ইতিপূর্বে। তিনি বিধবা, বয়েসও খুব বেশি নয়। তাঁকে দেখে আমি সমীহ করে ঘরের বাইরে চলে যাচ্চি, উনি বললেন—চা না খেয়ে যেন আর কোথাও বেরুবেন না।

আমি বললুম—দিদি, আমি গাড়ি এনেচি ডেকে, টেপাখোলা গিয়ে স্টীমার ধরবো।

তিনি একটু অবাক হয়ে বললেন—আজই? কেন?

হেসে বলি—পরের চাকুরি দিদি, থাকবার কি যো আছে—

দিদি স্নেহের সুরে জোর-গলায় বললেন—আজ ভরা আমাবস্তে, আজ আপনার যাওয়া হতেই পারে না—আজ থাকুন—

আমি অবাক হয়ে ওঁর মুখের দিকে চাইলুম। নিজের বোনের মতো সহজ সরল দৃঢ় আত্মীয়তার সুর!

কোথাকার কে আমি, নাম ধাম জানা নেই, দুদিনের মেসের বন্ধু ওঁর ভাইয়ের—তাও কতদিন আগের!

যেতে মন সরলো না। গাড়ি সেদিন ফিরিয়ে দিলুম।

আর একটি ঘটনা ঘটেছিল মাদারিপুর ডাকবাংলোতে।

ফরিদপুর থেকে গিয়েচি মাদারিপুর। হাতের পয়সা-কড়ি ফুরিয়ে যেতে কেশোরামজিকে পত্র লিখলাম, তিনি কিছু টাকা মনিঅর্ডার করে পাঠিয়ে দিলেন খরচপত্রের জন্যে। ডাকবাংলোয় থাকি, পাঁচ ছ'দিন মাত্র আছি, কেউ আমাকে চেনে না মাদারিপুরে, পোস্টমাস্টার আমায় মনিঅর্ডার বিলি করতে অস্বীকার করলে। যার নামে মনিঅর্ডার, সেই লোক যে আমি, তা সনাক্ত করবে কে?

এদিকে পাঁচদিনের ডাকবাংলোর ভাড়া বাকি, হাতে বিশেষ কিছুই নেই, বিষম মুশকিলে পড়তে হ'ল।

সেই সময় ডাকবাংলোয় আমার পাশের কামরায় একজন মুসলমান ভদ্রলোক কি কাজ উপলক্ষে এসে দিন-তিনেক ছিলেন। তাঁর নাম আমার মনে নেই—মাদারিপুর থেকে কিছুদূরে কোনো স্থানের তিনি জমিদার। ডাকবাংলোর চৌকিদারের মুখে তিনি আমার বিপদের কথা সব শুনেছিলেন। একদিন আমায় ডাকিয়ে বললেন—আপনি কলকাতায় থাকেন?

বললাম—হাঁ, তাই বটে, কলকাতায় থাকি।

তিনি বললেন—আমি সব শুনেচি আপনার বিপদের কথা। এখানে আপনাকে টাকা ওরা দেবে না—আমি আপনাকে সনাক্ত করতে পারতাম—কিন্তু তাতে মিথ্যে কথা বলা হবে, সত্যিই আমি আপনাকে চিনি না। আমার প্রস্তাব এই যে, কলকাতার ভাড়া আপনাকে আমি দিচ্চি, তাতে আপনি কিছু মনে করবেন না—পথিক ভদ্রলোক বিপদে পড়েচেন, অমন বিপদে সকলেই পড়তে পারে। আপনি আপনাদের আপিস থেকে গিয়ে টাকা নিয়ে আসুন, আমার নাম-ঠিকানা রাখুন, আমার টাকাটা আমায় সুবিধে মত পাঠিয়ে দেবেন।

তিনি আমার কলকাতার ভাড়া দিলেন—তাই নিয়ে আবার কলকাতায় ফিরি। কেশোরামজি শুনে হাসতে হাসতে বললেন—তবেই আপনি আমাদের কাজ করেচেন! মনিঅর্ডার ধরতে পারলেন না, তবে আপনি ফি বারই কি টাকা নিতে কলকাতায় আসবেন নাকি?

আমি বললুম—এবার থেকে নোট রেজেস্ট্রি খামে পাঠাবেন, নইলে বিদেশে এই রকমই কাণ্ড। মুসলমান ভদ্রলোকের ঠিকানাতে কেশোরামজি অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে নিজেই তাঁর টাকাটা পাঠিয়ে দিলেন।

কতদিনের কথা, ভদ্রলোকের নাম পর্যন্ত মনে নেই—কিন্তু তাঁর সে উপকার জীবনে কখনো ভুলবো না। বিশেষ করে আজকাল হিন্দু-মুসলমানের এই বিবাদের দিনে সে কথা বেশি করে আমার মনে পড়ে।

বরিশালে গেলুম মাদারিপুর থেকে স্টীমারেই।

আড়িয়ল খাঁ নদীর ওপর দিয়ে স্টীমার কিছুদূর গিয়ে পড়ে কালাবদর নদীতে, তারপর মেঘনার মুখ দিয়ে ঘুরে যায়। পূর্ববঙ্গের নদীপথের শোভা যাঁরা দেখেচেন, তাঁদের চোখের সামনে সেই সুন্দুরিবন দিয়ে ঘেরা গ্রামগুলির ছবি আবার ভেসে উঠবে এ গাঁয়ের কথা উল্লেখ করলেই। আমি সেই একটি বার মাত্র ওপথে যাই, আর কখনো যাই নি—কিন্তু মনের পটে সে সৌন্দর্য আঁকা হয়ে গিয়েচে চিরকালের জন্যে। কত রোমান্সের এরা স্বপ্ন জাগায়—কত নতুন সৃষ্টির সাহায্য করে। মানুষের অন্তরের বিচিত্র অনুভূতিরাজির সন্ধান যেন মেলে এদের শ্যামল পরিবেশের মধ্যে; যত অপরিচয়, ততই স্ফূর্তি, ততই আনন্দ। দিনে রাতে, সন্ধ্যায় জ্যোৎস্নায় এদের নিয়েই স্বপ্ন-পসারীর কত কারবার।

তবে কথা এই, সন্ধ্যাবেলায় নৌকা ভিড়লো গ্রামের ঘাটে, বেসাতি করি কখন? কত ধান ক্ষেত, খেজুর গাছ, তারাভরা রাত। সন্ধ্যায় গ্রামের বধূরা কলসী কাঁকে জল নিতে এসে গা ধুয়ে নিলে, জলের আলপনা

এঁকে চলে গেল বাড়ি ফিরে। কত কথা বলে এই মাঠঘাট, কতদিনের জনপদবধূদের চরণচিহ্ন আঁকা নদীর ঘাটের পথটি, বৃদ্ধ বকুল কি বটগাছ —আর এই সুপুরির সারি, অদ্ভুত শোভা এই সুপুরি বাগানের! শুধু চোখ-চেয়ে বসে থাকা স্টীমারের ডেকে, খাওয়া নয়, ঘুমানো নয়, শুধু জ্যোৎস্নালোকিত মুক্ত ডেকে বসে একদৃষ্টিতে চেয়ে থাকা।

আমার সঙ্গে এক ভদ্রলোকের স্টীমারেই আলাপ হ'ল। তিনি আমায় পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন তাঁর বাড়িতে গিয়ে উঠতে হবে। বরিশালে স্টীমার লাগলো যখন, তখন তাঁর অনুরোধ ক্রমে সক্রিয় হয়ে উঠলো— তিনি আমার জিনিসপত্র তাঁর কুলির মাথায় চাপিয়ে দিলেন। কাউনিয়াতে তাঁর বাড়ি। বেশ বড় বাড়ি, জমিদার লোক, দেখেই বোঝা গেল।

ভদ্রলোকের দাদা বাড়ি পৌঁছোলে এসে আমার সঙ্গে আলাপ করলেন। বরিশালে তুজন লোক আমার বড় ভালো লেগেছিল, তার মধ্যে ইনি একজন। শুধু ভালো লেগেছিল বললে এঁর ঠিক বর্ণনা দেওয়া হ'ল না—ইনি একজন অদ্ভুত ধরনের লোক। পাড়াগাঁয়ের শহরে এমন একজন লোক দেখবো এ আমি আশা করিনি।

তাঁর মস্ত বাতিক শেক্সপিয়ারের ভুল বার করা। এই নাকি তাঁর জীবনের ব্রত। কি প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য শেক্স্পিয়ারে, কি চমৎকার পড়াশোনা! কীর্তন-খোলা নদীর ঝাউবনের ধারে সন্ধ্যাবেলায় বেড়াতে বেড়াতে তিনি 'রোমিও জুলিয়েট' অনর্গল মুখস্থ বলে যেতে লাগলেন এবং ওর মধ্যে কোন্ কোন স্থানে কি অসঙ্গতি তাঁর চোখে লেগেচে সেগুলো ব্যাখ্যা করে গেলেন। কখনও 'রোমিও জুলিয়েট', কখনও 'হ্যামলেট', কখনও 'টেম্পেস্ট'—এটা থেকে আবৃত্তি করেন, ওটা থেকে আবৃত্তি করেন —সে এক কাণ্ড আর কি। স্মৃতিশক্তি কি অদ্ভুত!

কিন্তু খানিকটা শুনেই আমার মনে হ'ল শেক্সপিয়ারের সৌন্দর্য উপভোগ করা এঁর উদ্দেশ্য নয়। এমন কি, ভালো সমালোচনাও নয়—শেক্‌স্‌পিয়ারের খুঁত বার করে তিনি একখানা বইও লিখেছিলেন—আমায় একখানা উপহার দিলেন বরিশাল থেকে আসবার সময়। আমার আরও ভালো লাগতো এই ভদ্রলোকের অমায়িক ব্যবহার ও ভদ্রতা। আমার তখন বয়স চব্বিশ পঁচিশের বেশি নয়। তাঁর বয়স তখন অন্ততপক্ষে পঞ্চান্ন। কিন্তু আমার সঙ্গে অন্তরঙ্গ বন্ধু বা সতীর্থের মতই কথাবার্তা বলতেন, দোতলার ঘরে আমায় নিয়ে একসঙ্গে খেতে না বসলে তাঁর খাওয়াই হত না।

তিনি খুব হাসাতে পারতেন, সামান্য একটা কি কথার সূত্র ধরে এমন হাসির মশলা তা থেকে বার করতেন, আমার তো হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে যাবার উপক্রম হত। আমার মনে আছে একদিন কে তাঁকে বললে আমার সামনেই—'ভেরিওরাম শেক্‌স্‌পিয়ারের নোটগুলো দেখেচেন ?

ভদ্রলোক দুটি আঙুল নিজের দিকে দেখিয়ে বলতে লাগলেন—আরে, ভেরিওরাম লাগবো ন' (বরিশালের ইডিয়ম), আত্মারাম আছেন, আত্মারাম'

আমি তো হেসে গড়িয়ে পড়ি আর কি! কি বলবার ভঙ্গি, আর কি হাত নাড়ার কায়দা! বড় শ্রদ্ধা হয়েছিল এই লোকটির ওপর আমার—এমন নির্বিরোধ, নিস্পৃহ, সদানন্দ জ্ঞানতপস্বী চোখে বড় একটা তখনও পর্যন্ত দেখি নি—বইয়েতে টাইপ হিসেবে অবিশ্যি অনেক পড়েছিলুম। আমার বেশ মনে হয় আজও পর্যন্ত সে ধরনের মানুষ আর দ্বিতীয়টি চোখে পড়েনি।

প্রায়ই বিকেলবেলা আমায় নিয়ে তাঁর বেড়াতে যাওয়া চাই-ই। কোনোদিন কলেজের দিকে, কোনোদিন নদীর দিকে। বরিশাল শহরে

আমি নতুন গিয়েচি—আমাকে জায়গা দেখিয়ে নিয়ে বেড়াতেন তিনি। আর মুখে মুখে চলত শেক্স্‌পিয়ারের শ্রাদ্ধ। শেক্স্‌পিয়ার ভুলে ভরা, পাতায় পাতায় ভুল। এতদিন সমালোচকদের চোখে ধূলো দিয়ে লোকটা মহাকবি সেজে বেড়াচ্ছিল কিন্তু আর চলবে না। শেক্স্‌পিয়ারের জারিজুরি সব বেরিয়ে গিয়েচে। মিথ্যে ক'দিন টেকে ?

আমার খুব ভালো লাগতো এই সদানন্দ বৃদ্ধের সঙ্গ। শেক্স্‌পিয়ারের ভ্রম-প্রমাদ সম্বন্ধে তাঁর অত ব্যাখ্যাসহ বক্তৃতা সত্ত্বেও আমি কিন্তু মনে মনে বিশ্বাস করতুম না তাঁর কথা। কলেজ থেকে সবে বেরিয়েচি, বড় বড় শেক্স্‌পিয়ারী সমালোচকদের নাম শুনে এসেচি সত্য, তাঁদের অনেকের কাণ্ড দেখে এসেচি কলেজের লাইব্রেরিতে। তাঁদের বিরুদ্ধে বরিশালে কীর্ত্তনখোলা নদীর ধারে উড়ানি গায়ে দেওয়া বৃদ্ধের মতবাদ আমার কাছে প্রলাপ ছাড়া আর কিছু মনে হয় নি। তবুও অবিশ্যি শ্রদ্ধার সঙ্গে শুনে যেতুম।

আর একজন লোককে এই বরিশালেই দেখেছিলাম।

তাঁর নাম কুঞ্জবাবু। গলির মোড়ে একটি বাড়ির বারান্দায় প্রতিদিন বিকালে কুঞ্জবাবু বসে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ধর্ম্মমূলক গল্প শোনাতেন। আমি একদিন শুনেছিলাম তিনি প্রহ্লাদের গল্প শোনাচ্চেন ওদের।

এমন সুন্দর বলবার ক্ষমতা যে, রাস্তার লোক কুঞ্জবাবুর গল্প শোনার জন্যে ভিড় করে দাঁড়িয়ে যেতো। সে গল্প শোনবার মতো জিনিস। যখনই আমি কুঞ্জবাবুকে দেখতাম, সব সময়েই একদল ছেলেমেয়ে তাঁকে ঘিরে থাকতো।

কুঞ্জবাবুর সঙ্গে একদিন আলাপ হ'ল অমনি এক রাস্তার ধারে। আমি তাঁকে বললুম—আপনার নাম আমি শুনেচি, বড় ভালো লাগে আপনার গল্প।

কুঞ্জবাবু দেখলুম লজ্জিত হয়ে পড়লেন। আমার পরিচয় জিগ্যেস্ করাতে আমি বললাম—কলকাতা থেকে আপিসের কাজে এসেচি, আবার দু চারদিন পরে চলে যাবো।

—এখানে আছেন কোথায় ?

—কাউনিয়াতে আছি—এক বন্ধুর বাড়িতে—

আমায় সঙ্গে করে তিনি একটি নিচু গোছের গোলপাতার ঘরে নিয়ে গেলেন। আমি ঠিক জানিনে সে ঘরটাতে তিনি সব সময় থাকতেন কিংবা তাঁর আলাদা কোথাও বাসা ছিল। ঘরের মধ্যে বসিয়ে তিনি আমার প্রশ্নের উত্তরে অনেক ভক্তিমূলক কথাবার্তা কইলেন। আমায় একটা ছোট্ট রেকাবি করে বাতাসা আর শশাকাটা খেতে দিয়ে বললেন—ঠাকুরের প্রসাদ, মুখে দিন একটু। সরল-বিশ্বাসী ঈশ্বরভক্ত লোক। তাঁর পাণ্ডিত্য ততটা ছিল না, যত ছিল ভগবানে বিশ্বাস ও ভালোবাসা। যতদিন বরিশালে ছিলাম, মাঝে মাঝে তাঁর সেই ছোট্ট ঘরটাতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলে বড় আনন্দ পেতাম।

দুঃখের বিষয় আমি বরিশাল থেকে চলে আসবার অল্প কয়েক মাস পরেই উপরোক্ত দুই ভদ্রলোকই পরলোকগমন করেন। কলকাতায় বসে এ খবর আমি কার কাছ থেকে যেন শুনেছিলুম। আমার যতদূর মনে আছে শেক্‌স্‌পিয়ারের সমালোচক ভদ্রলোকের নাম অমূল্যবাবু। অমন আত্মভোলা ধরনের পণ্ডিত লোক আমি জীবনে খুব বেশি দেখিনি।

বরিশাল থেকে খালপথে উজীরপুর বলে একটা গ্রামে আমার এক সহপাঠীর বাড়ি গেলুম বেড়াতে। একটা খালের মধ্য দিয়ে গিয়ে আর একটা খালে পড়লুম, সেখান থেকে আর একটা খাল—সারা রাত্রিই চলচে নৌকো। রাত এগারোটার সময় ইসলামকাটি বলে একটা বাজারে নৌকো থামিয়ে মাঝিরা খেতে গেল।

জানেন। ঝালকাঠিতে এসে এখানকার বাড়িঘর দেখে মন এমন দমে গেল—একটুকু সৌন্দর্যবোধ থাকলে কেউ এ ধরনের বাড়ি করে না।

এত বড গঞ্জ, কিন্তু এখানে প্রায় সব বাড়িই করোগেট টিনের—কি ব্যবসা বাণিজ্যের গুদামঘর, কি গৃহস্থবাডি। ফলে দোকান, গুদাম ও ভদ্রাসন বাডির একই মূর্তি। তারপরে অবিশ্যি লক্ষ্য করেচি পূর্ববঙ্গের প্রায় সর্বত্রই এই টিনের ছাউনির চলন হয়েচে আজকাল। খডের ঘরের যে শান্ত শ্রী আছে, টিনের ঘরের তা নেই, বরং টিনের চেয়ে লাল টালির ঘরও অনেক ভালো দেখতে। ঝালকাঠিতে বেশ অবস্থাপন্ন গৃহস্থের বাডিও দেখেচি টিনের ছাউনি।

বাড়ির সামনে এক-আধটু ফুলের বাগান কি সুদৃশ্য দু-একটা গাছপালাও কেউ সখ করে করেনি। টিনের ঘরের পাশে তা থাকলেও অন্তত বাড়ির কর্কশ রুক্ষতা একটু দূর হয়—কিন্তু ফুলের বালাই নেই কোনো বাড়িতে।

এক জায়গায় কেবল আছে দেখেছিলুম, তাও কলকাতার টানে।

নদীর ধারে ভূকৈলাসের জমিদারদের প্রকাণ্ড কাছারিবাড়ি আছে—খুব বড় বড় থামওয়ালা সেনেট হাউসের মত চওড়া ধাপওয়ালা বাড়ি—এই টিনের ঘরের রাজ্যে এ বাডিখানা দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়।

ঝালকাঠি আমার ভালো লেগেছিল অন্য দিক থেকে। আমাদের গ্রামে নেপাল মাঝি বলে একজন লোক ছিল আমার ছেলেবেলায়, সে অত্যন্ত সামান্য অবস্থা থেকে ব্যবসা করে হাতে বিলক্ষণ দুপয়সা করেছিল। তার মুখে ঝালকাঠির কথা খুব শুনতাম।

নেপাল মাঝি একবার ঝালকাঠি বন্দরে নৌকো লাগিয়েছিল, তখন সে অপরের নৌকোতে মাঝিগিরি করতো—সে সময় বন্দরে আগুন লাগে।

একজন লোক একটা কাঠের হাতবাক্স নিয়ে জ্বলন্ত ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ওকে বলে—মাঝি, বাক্সটা ধরে রাখো তো—আমি আসচি—

এরপরে লোকটা আর নাকি ঠিক করতে পারিনি কার হাতে বাক্সটা দিয়েছিল, নেপালও স্বীকার করেনি। সেই হাতবাক্সটি সে আত্মসাৎ করে। অনেক টাকা পেয়েছিল বাক্সের ভেতর, সেই টাকায় ব্যবসা করে নেপাল অবস্থা ফিরিয়ে ফেলেছিল।

এ গল্প অবিশ্যি নেপাল মাঝির মুখে শুনিনি, নেপালের শত্রুরা বলতো এ কথা। তিনখানা বড় মহাজনী নৌকোতে সুপুরি আর বালাম চাল বোঝাই দিয়ে সে ঝালকাঠি থেকে আমাদের দেশে যেতো প্রতি বছর।

আমি ঝালকাঠি বাজারের একটা বড় আড়তে নেপালের নাম করতেই আড়তের মালিক তাকে চিনতে পারলে। বললে—সে অনেকদিন আসে না, বেঁচে আছে কি জানেন?

এতদূরে এসে যদি দেশের লোকের কথা শোনা যায় অপরের মুখে, আমার বাল্যকালের নেপাল মাঝির সন্ধান রাখে এমন লোকের সঙ্গে দেখা হয়, তবে সত্যিই বড় আনন্দ পাওয়া যায়।

তিনদিন পরে স্টীমারে বরিশাল থেকে চাটগাঁ রওনা হই।

ছোট স্টীমার, লোকজনের ভিড়ও বেশি নেই—ডেকচেয়ার পেতে সামনের ডেকে বসে দূরের তীররেখা ও ঘোলা জল দেখে সারাদিন কোথা দিয়ে কেটে যায়! ভোলা বলে বরিশালের একটা বন্দরে স্টীমার লাগলো পরের দিন সকালে।

এই ভোলার নামও করতো আমাদের গ্রামের নেপাল মাঝি। কি দুঃসাহসিক লোকই ছিলো, ধনপতি সদাগর কি ভাস্কো ডা গামা জাতীয় লোক ছিল আমাদের নেপাল, ছেলেবেলায় কি তাকে ভালো করে চিনতাম? কোথায় আমাদের সেই ছোট্ট নদী, নদীতীরে বাঁশবনের ছায়া, কুঁচলতার ঝোপটি—আর কোথায় সাত সমুদ্র তেরো নদী পারের বন্দর ভোলা।

দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যার সময় সন্দীপের উপকূলে স্টীমার গিয়ে নোঙর করলে আর স্টীমার থেকে সব লোক নেমে চলে গেল—এমন কি খালাসীগুলো পর্যন্ত নেমে গেল। সন্দীপের উপকূলে এই সন্ধ্যাটি আমার চিরদিন মনে থাকবে।

আমার একদিকে বঙ্গোপসাগর, তার কূলকিনারা নেই—আসলে যদিও এটা সন্দীপের খাঁড়ি, ঠিক বহিঃসমুদ্র নয়, কিন্তু দৃষ্টি যখন কোথাও বাধে না, তখন আমার অভিজ্ঞতার মধ্যে সমুদ্রের যে রূপ ফুটে উঠেচে তার সঙ্গে কি বঙ্গোপসাগর, কি ভারত মহাসমুদ্র—কারো কোনো তফাৎই নেই।

অদূরের তীরভূমি অপূর্ব সুন্দর, তাল আর নারকেল সুপারির বনে ঘন সবুজ। সন্ধ্যায় যখন সবাই নেমে গেল, আমি স্টীমারে একেবারে একা চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলুম শেষ বৈকালের ক্রমবিলীয়মান রৌদ্র পীত থেকে স্বর্ণাভ, ক্রমে রাঙা হয়ে কি ভাবে তালীবনরেখার শীর্ষদেশে উঠে গেল, আকাশ কি ভাবে পাটকিলে, তারপর ধূসর, ক্রমে অন্ধকার হয়ে এল।

অনেক দিন আগের সেই সন্ধ্যায় যে সব কথা আমার মনে এসেছিল—তা আমার আজও মন থেকে মুছে যায়নি, সন্দীপের সমুদ্র-উপকূলের বহুবর্ষ আগেকার সেই সন্ধ্যাটির ছবি মনে এলে, কথাগুলোও কেমন করে মনে পড়ে যায়।

পরদিন খুব ভোরে স্টীমার ছাড়লো।

চট্টগ্রামের যাত্রীদল শেষরাত্রে ডিঙি করে এসে স্টীমারে উঠলো—তাদের হৈ-চৈ আর গোলমালে ঘুম ভেঙে গেল। ডেকে ভিড় জমে গেল খুব, তার ওপর বস্তা বস্তা শুঁটকি মাছ এসে জুটলো, বাতাস ভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো শুঁটকি মাছে দুর্গন্ধে।

সকালে যখন সূর্যোদয় হ'ল, তার আগে থেকেই দক্ষিণদিকে কূলরেখা-বিহীন জলরাশি, বামে নোয়াখালি আর চট্টগ্রামের ক্ষীণ তীররেখা আর

কিছুদূর গিয়েই নীল শৈলমালা। সন্দীপ চ্যানেল ছেড়ে স্টীমার অল্প কয়েক ঘণ্টার জন্যে বা'র সমুদ্রে পড়ল—তার পরেই কর্ণফুলির মোহানায় ঢুকে ডবল মুরিংস্‌এ নোঙর ফেললে।

চট্টগ্রাম সুন্দব শহর, তবে অত্যন্ত অপরিষ্কার পল্লীও আছে শহরের মধ্যেই। একটি জিনিস লক্ষ্য করেচি, কলকাতার বাইরে সব শহরের এক মূর্তি। সেই সংকীর্ণ ধূলোয় ভর্তি রাস্তা, গলিঘুঁজি, খোলা ড্রেন, টিনের ঘরবাড়ি।

কেন জানিনে, এ সব ছোট শহবে দিনকয়েক থাকলেই প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে—দীর্ঘকাল এখানে যাপন করা এক রকম অসম্ভব। তবুও চাটগাঁ বেশ সুদৃশ্য শহর একথা স্বীকার করতেই হবে। শহরের মধ্যে অনেকগুলি ছোট-বড় পাহাড; এর যে-কোনো পাহাড, বিশেষ কবে কাছারির পাহাড়ের ওপর উঠলে একদিকে সমুদ্র ও অন্যদিকে বহুদূরে আরাকানের পর্বতমালার নীল সীমারেখা চোখে পড়ে।

এখানে একটি পরিবারের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ আলাপ হয়ে পড়েছিল।

আমি স্টীমার থেকে নেমেই এঁদের বাড়িতে গিয়ে উঠি। বাড়ির কর্তাব নামে আমাদের সমিতির একখানা চিঠি ছিল।

কখনো এঁদের চিনিনে, চাটগাঁয়ে এই আমার প্রথম আগমন।

বেশ বড বাড়ি, ঢুকে বাইরের ঘরে দুজন চাকরের সঙ্গে দেখা—জিগ্যেস করে জানলুম বাডির কর্তা কাছারিতে বেরিয়েচেন, আসতে প্রায় চারটে বাজবে।

সুতরাং বসেই আছি, কাউকেই জানিনে এখানে, কর্তার সঙ্গে দেখা করবার পরে যাবো, না হয় একটু বসি।

বাড়ির মধ্যে থেকে এসে চাকরে জিগ্যেস করলে—মা জিগ্যেস করচেন, আপনি কি স্নান করবেন ?

বললুম—স্নানাহার করবার কোনো দরকার নেই এখন। আমার আসল দরকার শেষ হ'লে আমি এখান থেকে চলে যাবো।

—না, তা হবে না বাবু, আপনাকে খাওয়া-দাওয়া করতে হবে, মা বলে দিলেন।

বাড়ির কর্ত্রীর আদেশ অমান্য করতে মন উঠলো না। স্নানাহার সেখানেই করলুম এবং কর্তা কাছারি করে বাড়ি ফিরে এসে আমার সঙ্গে আলাপ করবার পরে বললেন—যদি কিছু মনে না করেন, এখানেই থাকুন না কেন ?

আমি আপত্তি করলুম, বললুম—ডাকবাংলোয় যাবো ভেবেচি, কেন মিছে আপনাদের কষ্ট দেওয়া ?

আমার আপত্তি গ্রাহ্য হ'ল না। বৈঠকখানার পাশের ঘরটায় আমার থাকবার জায়গা হ'ল এবং এর পরে দিন-দশেক কাজের খাতিরে চাটগাঁয়ে ছিলুম—অন্য কোথাও আমায় ওঁরা যেতে দিলেন না।

বড় উদার পরিবার, দু-পাঁচ দিনের মধ্যে আমি যেন তাঁদের বাড়ির ছেলের মতো হয়ে গেলুম। বাড়ির মধ্যে গিয়ে রান্না-ঘরের মধ্যে খেতে বসি, মেয়েরা পরিবেষণ করেন, কাউকে দিদি কাউকে মাসীমা বলে ডাকি। তাঁরাও আমায় স্নেহের চোখে দেখেন। বারো দিন পরে যখন আমি চাটগাঁ ছেড়ে কক্সবাজার গেলুম, তখন সত্যিই তাঁরা অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে পড়লেন, বার বার বলে দিলেন, আমি যেন ফিরবার সময় আবার এখানে আসি।

কক্সবাজারে যাবার পথে মহেশখালি চ্যানেল নামে ক্ষুদ্র সমুদ্রের খাড়ি পড়ে।

দূরে চর কুতুবদিয়াতে লাইট হাউস ও আদিনাথ পাহাড়ের দিকে চোখ

রেখে আমি এদের কথা কতবার ভেবেচি। এতদূর বিদেশে যে আত্মীয়-বন্ধু লাভ করবো, তাদের ছেড়ে আসতে যে কষ্ট হবে, তারাও চোখের জল ফেলবে আমার আসবার সময়—এ অভিজ্ঞতা আমার জীবনে তখন নতুন, তাই বড় আশ্চর্য মনে হচ্ছিল ব্যাপারটা।

কিন্তু পরবর্তী জীবনে কতবার এ অভিজ্ঞতা আমার যে হয়েচে। পর কতবার আপন হয়েচে, এমন কি আমার বিশ্বাস পর যত সহজে আপন হয়, আপনার লোকে তত সহজেও হয় না এবং তত আপনও হয় না।

কক্সবাজারে একদিন একটি ঘটনা ঘটেছিল।

জীবনের সে এক বিপদ্‌জনক অভিজ্ঞতা—প্রাণসংশয়ও ঘটতে পারতো সেদিন।

কক্সবাজারে সমুদ্রের ধারে, সাগরবেলায় জোয়ার নেমে গেলে কড়ি, শঙ্খ, ঝিনুক ইত্যাদি কত পড়ে থাকে; বড় বড় সমুদ্রের ঢেউ এসে কূলে তাল দেয়। জ্যোৎস্না-পক্ষের রাত্রি, কত রাত পর্যন্ত সেখানে একা চুপ করে বসে থাকি, যশোর জেলার একটি ক্ষুদ্র পল্লীগ্রাম থেকে কত দূর যেন চলে এসেচি, সেখানকার ক্ষুদ্র নদী ইছামতীর কথা মনে পড়ে, ইছামতীর দুপাড়ের বাঁশবনের কথা ভুলতে পারিনে, এত দূরে বসে দেশের স্বপ্ন দেখতে কি ভালোই যে লাগে!

কাউখালি বলে ছোট্ট একটি নদী বা খাল কক্সবাজারের পাশ দিয়ে এসে সমুদ্রে পড়েচে। একদিন একখানা সাম্‌পান্‌ ভাড়া করে কাউখালি থেকে বার হয়ে সমুদ্রে বেড়াতে গেলুম।

মাঝি মাত্র একজন, চাটগাঁয়ের বুলিতে বললে, কতদূর যাবেন বাবু?

—অনেকদূর চলো সমুদ্রের মধ্যে। সন্ধ্যের পর ফিরবো—

—আদিনাথ যাবেন?

একটা ছোট পাহাড় সমুদ্রগর্ভ থেকে খাড়া উঠেচে—তার মাথায়

আদিনাথ শিবের মন্দির। এ অঞ্চলের এটি একটি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান, অনেক দূর থেকে লোকে আসে আদিনাথ দর্শন করতে, শিবরাত্রির সময় বড় মেলা হয়। কাউখালি নদী যেখানে এসে সমুদ্রে পড়লো, তার ডাইনে প্রায় মাইল দুই দূরে আদিনাথ পাহাড় সমুদ্র থেকে উঠেচে, আর ঠিক সামনে অতদূরেই একটা বড় চড়ার মতো কি দেখা যাচ্চে। মাঝিকে বললুম —ওটা কি চড়া পড়েচে?

মাঝি বললে—না বাবু, ওটা সোনাদিয়া দ্বীপ। ভাঁটার পরে ওখানে অনেক কড়ি, শাঁক, ঝিনুক পড়ে থাকে।

শুনে আমার লোভ হ'ল। মাঝিকে সোনাদিয়া দ্বীপে যেতে বললুম।

মাঝি একবার কি একটা আপত্তি করলে, আমি ভালো বুঝলুম না ওর কথা।

সাম্‌পান সাগর বেয়ে চলেচে, বিকেল পাঁচটা, সমুদ্রের বুকে সূর্য ডুবুডুবু, হু-হু খোলা হাওয়া কাউখালির মোহানা দিয়ে ভেসে আসচে, আদিনাথ পাহাড়ের মাথায় অস্ত-সূর্যের রাঙা রোদ। মনে হয় যেন কত কাল ধরে সমুদ্রের বুকে ভাসচি, দূরের সাউথ সি দ্বীপপুঞ্জের অর্ধ চন্দ্রাকৃতি সাগরবেলা, যা ছবিতে ছাড়া কখনো দেখিনি—তাও যেন অনেক নিকটে এসে পৌঁছেচে—তাদের শ্যাম নারিকেলপুঞ্জের শাখাপ্রশাখার সঙ্গীত যেন শুনতে পাই।

সোনাদিয়া দ্বীপে যখন সাম্‌পান ভিড়লো, তখন জ্যোৎস্না উঠেচে।

ছোট্ট চড়ার মতো ব্যাপারটা, গঙ্গার বুকে বালি হুগলি শহরের সামনে অমন ধরনের চড়া কত দেখেচি ছেলেবেলায়। একটা গাছপালা নেই, বাড়িঘর তো নেই-ই, শুধু একটা বালির চড়া—জল থেকে তার উচ্চতা কোথাও হাত খানেকের বেশি নয়।

কিন্তু সে কি সুন্দর জায়গা! অতটুকু বালির চড়া বেষ্টন ক'রে চারি

ধারে অকূল জলরাশি, জ্যোৎস্নালোকে দূরের তটরেখা মিলিয়ে গিয়েচে। আদিনাথ পাহাড়ও আর দেখা যায় না, সুতরাং আমার অনুভূতির কাছে প্রশান্ত মহাসমুদ্রের বুকে যে-কোনো জনহীন দ্বীপই বা কি, আর কক্সবাজারের সমুদ্র-উপকূল থেকে মাত্র দু মাইল দূরের সোনাদিয়া দ্বীপই বা কি; আমাদের গ্রামের মাঠে বসে বৈকালে আকাশের দিকে চেয়ে মেঘস্তূপের মায়ায় রচিত তুষারমৌলি হিমালয়ের গৌরীশঙ্কর শৃঙ্গ কি ত্রিশূল কতদিন প্রত্যক্ষ করিনি কি!

মনে কল্পনায় এই জগৎকে আমরা অহরহ সৃষ্টি করে চলেচি—আমরা নিজেরাই তার স্রষ্টা। প্রত্যেক মানুষটি স্রষ্টা; যার যেমন কল্পনা, যার যেমন ধারণাশক্তি, যেমন স্মৃতি ও অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার—সে তেমনি সৃষ্টি করে।

বইলেখা, উপন্যাস-লেখাই শুধু সৃষ্টি নয়। প্রতিদিনের ধ্যান ও স্বপ্ন আমাদের চারপাশে মায়াজালের যে বুনুনি রচনা করে তাও সৃষ্টি। তারই বাহ্যপ্রকাশ হয় সঙ্গীতে, কথাশিল্পে, ছবিতে, নাটকে, কথাবার্তার মধ্যে, স্থাপত্যে, ভাস্কর্যে। কোন্ মানুষ স্রষ্টা নয়?

ঝিনুক ও কড়ি যথেষ্ট পরিমাণে ছড়িয়ে আছে সারা চড়ার ওপরে। আর আছে এক ধরনের লাল কাঁকড়া, বালির মধ্যে এরা ছোট ছোট গর্ত করে গর্তের মুখে চুপ করে বসে আছে, মানুষের পায়ের শব্দ পেলে তাড়াতাড়ি গর্তের মধ্যে ঢুকে পড়ে। বোধ হয় ঘণ্টা খানেক কেটে থাকবে—এমন সময় সাম্পানের মাঝি বললে—বাবু, শীগ্‌গির নৌকোয় উঠে বসুন—জোয়ার আসচে।

ওর গলায় ভয়ের সুর। বিস্মিত হয়ে বললুম—কেন, কি হয়েচে?

মাঝি বললে—সোনাদিয়া দ্বীপ জোয়ারের সময় ডুবে যায়—সাঁতার জানলেও অনেকে ডুবে মরেচে। একটু তাড়াতাড়ি করুন কর্তা—

বলে কি! শেষকালে বেঘোরে ডুবে মরতে রাজি নই। একটু বেশি তাড়াতাড়ি করেই সাম্পানে উঠলুম। বড় বড় ঢেউ এসে সোনাদিয়ার চড়ায় আছাড় খেয়ে পড়তে লাগলো—তার আগেই আমরা চড়া থেকে দূরে চলে এসেচি।

কিন্তু যে ঘটনার কথা বলতে যাচ্চি, সেটা ঘটলো এর ঠিক পরেই—জোয়ারে ডুবে মরবার সম্ভাবনার চেয়ে সেটা কম বিপদ্জনক নয়।

খানিক দূর এসে সমুদ্রের মধ্যে কুয়াশা নামলো। কোনোদিক দেখা যায় না, বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা'র কুয়াশার বর্ণনা মনে পড়লো। কুয়াশা এমন ঘন যে অত বড় আদিনাথ পাহাড়টা বেমালুম অদৃশ্য হয়ে পড়েচে।

মাঝে মাঝে সাম্পানের দাঁড় ফেলার সময়ে যে ঢেউয়ের সৃষ্টি হচ্চে তার মধ্যে অসংখ্য জোনাকি পোকার মতো কি জ্বলে জ্বলে উঠচে—বসে বসে লক্ষ্য করচি অনেকক্ষণ থেকে। সমুদ্রের আলোকোৎক্ষেপী উর্মিমালার কথা বইতেই পড়েছিলুম এর আগে, এইবার চোখে দেখলুম।

ঘণ্টাখানেক সাম্পান চলেচে—কূলের দেখা নেই।

মাঝি কখনো বলে, ওই সামনে ডাঙা দেখা যাচ্চে—কখনো বলে, আদিনাথ পাহাড়ের দিকে গিয়ে পড়চি। আমার ভয় হ'ল সে দিক ভুলে আদিনাথ পাহাড়ের দিকেই যাচ্চে—আদিনাথের নিচে সমুদ্রের মধ্যে দু'চারটি মগ্নশৈল থাকা অসম্ভব নয়, তাতে ধাক্কা মারলে সাম্পান চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যেতে বেশি দেরি লাগবে না।

যদি বা'র-সমুদ্রে পড়ি, দিক ভুল হয়ে, তবে বিপদ আরও বেশি। একবার কাগজে পড়েছিলুম, সুন্দরবনের কি একটা জায়গা থেকে কয়েকটি লোক একখানা ডিঙি নৌকো করে কোন্ দ্বীপে কুমড়ো আনতে যায়। ফিরবার পথে তারা দিক ভুল করে বা'র-সমুদ্রে গিয়ে পড়ে—সমুদ্রে কি

করে নৌকো চালাতে হয় তাদের তা জানা ছিল না—এগারো দিন পরে ব্রহ্মদেশের উপকূলে যখন তাদের ডিঙি গিয়ে ভাসতে ভাসতে ভিড়লো, তখন মাত্র একজন জীবিত আছে। এ সময় হঠাৎ সে কথাটাও মনে পড়লো।

মাঝিও যেন একটু বিপন্ন হয়ে পড়েচে। সে বললে—বাবু, আপনার কাছে দেশলাই আছে? সাম্পানে মশাল আছে, একটা ধরিয়ে নেই।

তাকে বললুম, মশাল কি হবে?

—মশাল জ্বলা দেখে অন্য নৌকো কি স্টীমার আমাদের পাবে। একটা বিপদ আছে বাবু, এই পথ দিয়ে বড জাহাজ রেঙ্গুন কি মংডু থেকে চাটগাঁ যায়—কুয়াশার মধ্যে যদি ধাক্কা লাগে তবে তো সাম্পান ডুবে যাবে—আর একটা বিপদ বাবু, মাঝে মাঝে বয়া আছে সমুদ্রের মধ্যে, তাদের মাথায় আলো জ্বলে—যদি কুযাশার মধ্যে আলো টের না পাই তবে বয়ার গায়েও ধাক্কা লাগতে পারে—

—ঠিক সেই কারণে তো আমাদের মশালও না দেখা যেতে পারে অন্য নৌকো বা স্টীমার থেকে?

মাঝি সে কথার কোনো উত্তর দিলে না। আমি দেশলাই বার করে মাঝির হাতে দিতে যাবো, এমন সময় কি একটা শব্দে চমকিত হয়ে বলে উঠলুম—কিসের শব্দ মাঝি?

মাঝির গলার স্বর ভয়ে বিকৃত হয়ে উঠেচে—সে বলে উঠলো, বাবু, সাম্পানেব কাঠ আঁকড়ে ধরুন জোর করে—সামনে পাহাড—

একমুহূর্তে বুঝে ফেললুম আমাদের সঙ্কটের গুরুত্ব। সামনে আদিনাথ পাহাড, দিক ভুল করে মাঝি সাম্পান নিয়ে এসেচে উত্তর-পূর্ব দিকে—কিছুই চোখে দেখা যায় না, শুধু সাগরের ঢেউ পাহাড়ের গায়ে আছ্‌ড়ানোর শব্দে বোঝা যায় যে পাহাড় নিকটবর্তী। কিন্তু আরও দশ মিনিট কেটে

গেল। পাহাড়ের গায়ে ঢেউয়ের শব্দ তখনও সামনের দিকে, কিন্তু সাম্পান যেন সে শব্দকে ছাড়িয়ে আরও উত্তরে চলে যাচ্ছে।

ব্যাপার কি? মাঝিও কিছু বলতে পারে না!

হঠাৎ আমার মনে হ'ল আমার ঠিক সামনেই কাউখালি নদী সমুদ্রে পড়চে। কুয়াশা তখনও খুব ঘন, এ সব কুয়াশা ক্রমে ক্রমে পাতলা হয় না, অতর্কিতে এক মুহূর্তে চলে যাবে। আমি মাঝিকে বললুম—মাঝি, নদীর মোহানা সামনে—

মাঝি বললে—বাবু, ও কাউখালি নয়, আদিনাথের ঝরনা, কুয়াশার মধ্যে ওই রকম দেখাচ্চে, আমরা উত্তর দিকে যাচ্চি ভেসে। এ জায়গাটা আরও ভয়ানক—

মাঝি আমাকে যাই বলুক, ভয়ের চেয়ে একধরনের অদ্ভুত আনন্দই বেশি করে দেখা দিয়েচে মনে। সমুদ্রে দিক্‌হারা হয়ে সঙ্কটাপন্ন হয়ে পড়বো এ তো বাল্যকালের স্বপ্ন ছিল; নাই বা হ'ল খুব বেশি দূর—মাত্র চট্টগ্রামের উপকূল—সমুদ্র সবজায়গাতেই সমুদ্র, মাথার ওপরকার আকাশ সব জায়গাতেই নীল, কল্পনা সর্বত্রই মনে আনে নেশার ঘোর। কিন্তু আমার অদৃষ্টে বেশি ঘটলো না। আদিনাথের নিচে কয়েকখানা জেলে-ডিঙি বাঁধা, আমাদের সাম্পানের আলো দেখতে পেয়েছিল। তাদের লোক মাঝিকে ডাক দিয়ে কি বললে, সেখানে অতি সহজেই আমাদের নৌকো ভিড়লো।

আরও আধঘণ্টা পরে কুয়াশা কেটে গেল। সেই জ্যোৎস্নালোকিত সমুদ্র-বক্ষে সাম্পান ছেড়ে আমরা এসে পৌঁছলুম কাউখালি মোহানায়। দূরের সমুদ্র স্থির, নিস্তরঙ্গ তটভূমির ঝাউয়ের সারির মধ্যে নৈশ বাতাসের মর্মরধ্বনি; বড় বড় ঢেউ যখন এসে ডাঙায় আছড়ে পড়চে, তখন তাদের মাথায় যেন অসংখ্য জোনাকি জ্বলচে।

কক্সবাজার থেকে গেলুম মংডু।

'নীলা' বলে একখানা ছোট স্টীমার চাটগাঁ থেকে কক্সবাজারে আসে, সেখানা প্রতি শুক্রবারে তখন মংডু পর্যন্ত যেতো। শুঁট্‌কি মাছ স্টীমারের খোলে বোঝাই না থাকলে এ সব ছোট জাহাজের ডেকে যাওয়া অত্যন্ত আনন্দদায়ক। উপকূল আঁকড়ে জাহাজ চলে, সুতরাং একদিকে সব সময়েই সবুজ বনশ্রেণী, মেঘমালা, জেলেডিঙির সারি, কাঠের বাড়ি, বৌদ্ধ মন্দির, মাঝে মাঝে ছোট নদীর মুখ, কখনো রৌদ্র কখনো মেঘের ছায়া—যেন মনে হয় সব মিলিয়ে সুন্দর একখানি ছবি।

কিছুদূরে গিয়ে খানিকটা ফাঁকা জায়গা। সেখানে কিসের কারখানা আছে, চর থেকে কলের চিমনির ধোঁয়া উড়চে দেখা যায়। স্টীমারের লোকে বললে—করাতের কল, বনের কাঠ চিরে ওখান থেকে জাহাজে বিদেশে রওনা করা হয়।

বিকেলে মংডুতে স্টীমার ভিড়লো। মংডু একেবারে ব্রহ্মদেশ। সেখানে পা দিয়েই মনে হ'ল বাংলা দেশ ছাড়িয়ে এসেচি! বর্মী মেয়েরা মোটা মোটা এক হাত লম্বা চুরুট মুখে দিয়ে জল আনতে যাচ্চে, টকটকে লাল রেশমী লুঙি পরা যুবকেরা সাইকেলে চড়ে সতেজে চলাফেরা করচে, পথের ধারে এক এক জায়গায় ছোট ছোট চালাঘর, সেখানে পথিকদের জলপানের জন্যে এক কলসী করে জল রাখা আছে।

এখানে একটি ব্রহ্মদেশীয় পরিবারের সঙ্গে আমার আলাপ হয়ে যায় খুব অদ্ভুত ভাবে। একদিন মংডুর পুরানো পোস্টাফিসের পেছনের রাস্তা দিয়ে সমুদ্রের ধারে যাচ্চি, একটি বৃদ্ধ চাটগেঁয়ে মুসলমান মাল্লা আমায় বললে, বাবু, আমায় মেহেরবানি করে একটা কাজ করে দেবেন, একখানা দরখাস্ত লিখে দেবেন ইংরিজিতে?

তারপর আমাকে সে একটা টিনের বাংলো ঘরে নিয়ে গেল। বাংলোর ভেতরটাতে কারা আছে তখন জানতুম না, বাইরের একসারি ছোট ঘরে অনেকগুলো জাহাজী মাল্লা বাসা করে আছে বলে মনে হ'ল। আমার হাতে তখন পয়সার সচ্ছলতা নেই, দরখাস্ত লিখতে ওরা আটখানা পারিশ্রমিক দিলে, আমিও তা নিয়েছিলাম।

দরখাস্ত লিখে চলে আসচি, এমন সময়ে সেই বৃদ্ধ মাল্লাটি বললে, বাবু, ওই বর্মী সাহেব আপনাকে ডাকচে, ভেতরের ঘরে থাকে ওরা।

আমি অবাক হয়ে গেলুম। অপরিচিত স্থানে যেতে মন সরল না, কি জানি কার মনে কি আছে! কিছুক্ষণ পরে একটি বৃদ্ধ বর্মী ভদ্রলোক আমায় হাসিমুখে বাঁকা চাটগাঁয়ের বুলিতে বললেন—আসুন বাবু, আপনাকে একটু দরকার আছে।

যে ঘরে তিনি আমায় নিয়ে গেলেন, সে ঘরে তিন চারটি সুবেশা তরুণী বসে ছিলেন, সকলেই দেখতে বেশ সুশ্রী। প্রত্যেকের সামনে একটা ছোট বাটি, তাতে সাদা মতো কি গুঁড়ো, একটু ঢুকেই চোখে পড়লো; ভদ্রতাবিরুদ্ধ হয় বলে আমি আর ওঁদের দিকে চাইনি। ভদ্রলোক আমায় বাংলায় বললেন—একটু চা খাবেন? আমার বিস্ময়ের ভাব তখনও কাটেনি, আমি কোনো উত্তর দেবার আগেই মেয়েরা ঘর থেকে বার হয়ে গেলেন।

বৃদ্ধ বললেন, আপনাকে ডেকেচি কেন বলি। আমি কাঠের ব্যবসা করি, বাজারে আমার কাঠের আড়ং আছে। একজন বাঙালী বাবু আমার আড়তে ইংরিজি চিঠি পত্র লিখতো আর আমার মেয়ে তিনটিকে ইংরিজি পড়াতো, সে চলে গিয়েচে আজ দুমাস। আর আসে না, চিঠি লিখলে জবাব দেয় না, অথচ আমার জরুরী চিঠি দু'তিন খানার উত্তর না দিলে নয়। আপনি মোবারক খালাসির দরখাস্ত লিখছিলেন শুনে আপনাকে ডাকলুম।

যদি দয়া করে লিখে দেন, আপনার উপযুক্ত পারিশ্রমিক যা হয় আমি দেবো।

আমি আনন্দের সঙ্গে রাজি হলুম। আমি যে-ক'দিন এখানে থাকবো, তিনি আমায় দিয়ে তাঁর চিঠি লিখিয়ে নিতে পারেন। যা ইচ্ছে হয় দেবেন, সে বিষয়ে আমার কিছু বক্তব্য নেই।

একটু পরেই ওঁর মেয়েরা চা নিয়ে এলেন। ভদ্রলোক আমার সঙ্গে মেয়েদের আলাপ করিয়ে দিলেন, সকলেই বাংলা বলতে পারেন বটে কিন্তু তাঁদের বাংলা বোঝা আমার পক্ষে বড় কষ্টকর হয়ে উঠছিল প্রতিবার। কথাটা তাঁদের বিনীত ভাবে বুঝিয়ে বললুম। আমার বাড়ি কলকাতায়, চট্টগ্রামের ভাষা ভাল বুঝি না, তার ওপরে বিকৃত চট্টগ্রামের বুলি তো আমার পক্ষে একেবারেই দুর্বোধ্য। ইংরিজিতে যদি বলেন তবে আমার সুবিধে হয়।

বৃদ্ধ ভদ্রলোককে কথাগুলি বললুম বটে, কিন্তু মেয়েদের উদ্দেশ করে। মেয়েরা আমার বাংলা বোঝেন না, তাঁদের বাবা বর্মিজ ভাষায় বুঝিয়ে দিলেন আমার বক্তব্য।

আমি বাটিতে সাদা গুঁড়ো দেখিয়ে বললুম—ওটা কি কোনো খাবার জিনিস?

মেয়েরা ভদ্রতার খাতিরে অতি কষ্টে হাসি চেপে গেলেন বুঝলুম, তাঁদের পরস্পরের মধ্যে কৌতুকপূর্ণ দৃষ্টিবিনিময় হ'ল।

বড় মেয়েটি বললেন—ওটা তা-না-খা, চন্দন কাঠের পাউডার, মুখে মাখে।

গম্ভীর ভাবে বললুম—ও!

মেয়েটি আমায় বললেন, তাঁরা ইংরিজি কথা বলতে পারেন না। বাঙালী বাবুরা ইংরিজি বিদ্যের জাহাজ, এমন একটি ইংরিজিতে সুপণ্ডিত ব্যক্তির সামনে তাঁরা তাঁদের বাজে ইংরিজির নমুনা বার করতে পারবেন না, ভারি লজ্জা করবে।

ওদের বাবা বললেন—আপনি এখানে ক'দিন থাকবেন ?

—দিন পনেরো বোধহয় আছি।

—দয়া করে রোজ সন্ধ্যেবেলা আমার এখানে আসুন না কেন ? এখানে চা খাবেন আর আমার মেয়েদের সঙ্গে ইংরিজিতে কথাবার্তা কইবেন। ওদের শেখা হয়ে যাবে। আপনাকে দিয়ে আমার আড়তের চিঠিপত্রও তা হ'লে লিখিয়ে নেবো। এক টাকা করে পাবেন এজন্যে---কি বলেন ? আমি আসতে রাজি হলুম। এক টাকাই দেবেন, আমার কোনো আপত্তি নেই। তবে দু' ঘণ্টার বেশি আমার পক্ষে থাকা সম্ভব হবে না, কারণ আমার নিজের আফিসের কাজও রাত্রে আমায় করতে হবে।

একদিন খুব বৃষ্টি হ'ল।

আমি সমুদ্রের ধারে বেড়াচ্ছি, এমন সময় দেখি চট্টগ্রামবাসী সুকবি ও সুলেখক সুরেন্দ্রনাথ ধর সেখানে আপন মনে এক জায়গায় চুপ করে বসে। সুরেনবাবু আমার বিশেষ বন্ধু, এবার চট্টগ্রামে যে-ক'দিন ছিলাম, কর্ণফুলির ধারে একসঙ্গে মাঝে মাঝে দুজনে বেড়াতুম।

সুরেন ধর খামখেয়ালী ও ভবঘুরে ধরনের লোক। বললেন—চলো হে আমার সঙ্গে কাল বন বেড়াতে যাই—

আমারও খুব উৎসাহ, বললুম—বেশ চলুন, কোন্ দিকে যাবেন ?

—আরাকান ইযোমা রেঞ্জ, যেটা এখান থেকে দেখা যাচ্ছে, ওইদিকে নিবিড় টিক-উড্ ফরেস্ট্। চলো ওদিকে যাবো—

সুরেনবাবুর জীবনে পায়ে হেঁটে এ রকম বেড়ানো অভ্যেস অনেকদিন থেকেই আছে জানি, তাঁর কথায় তখনি সম্মতি দিলুম। বললুম—এখানে কবে এলেন ?

—এখানে আমার এক বন্ধু আছেন ডাক্তার, তাঁর ওখানে বেড়াতে

এসেছিলুম, প্রায় দশ দিন আছি। শরীরটা ভালো ছিল না, এখন একটু সেরেচে। যদি বেরুতে হয়, এইবার—এই হপ্তার মধ্যেই।

আমি সন্ধ্যাবেলা বর্মী ভদ্রলোকের বাড়ি গিয়ে বেড়াতে যাওয়ার কথা বলতে তিনি আমায় অনেক ভয় দেখালেন। আরাকান ইয়োমা পর্বত-শ্রেণী বন্যজন্তুসঙ্কুল, দুষ্প্রবেশ্য ও প্রায় জনহীন। তা ছাড, সামনে যে পর্বত দেখা যায়, ওটা আসল রেঞ্জ নয়, ওর ত্রিশ বত্রিশ মাইল পেছনে যে ধোঁয়ার মতো পাহাডশ্রেণী দেখা যাচ্চে, ওখানে তাঁদের ফরেস্ট্ ইজারা করা আছে, কার্যোপলক্ষ্যে অনেকবার তিনি সেখানে গিয়েচেন, অত্যন্ত দুর্গম জায়গা। দুজন মাত্র লোকের পক্ষে সেখানে যাওয়া নিতান্ত দুঃসাহসের কাজ ছাড়া আর কিছু নয়। ভদ্রলোকের নাম মৌংপে। কাঠের ব্যবসা করে দুপয়সা করেচেন, তা তাঁর বাডির আসবাবপত্র দেখেই বোঝা যায়।

মৌংপে বললেন—আমার এই বড মেয়েটি আমার সঙ্গে একবার সেখানে গিয়েছিল—

আমি বিস্ময়ের স্বরে বললুম—গাডি যায় নাকি সেখানে? কিসে গেলেন?

—হাতীর পিঠে। কাঠ বয়ে আনবার জন্যে আমাদের হাতী আছে জঙ্গলে, আমার নিজের ছ'টা হাতী আছে—আপনাকে হাতীর সুবিধে করে দিতে পারি, কিন্তু নদী পেরিয়ে সে সব হাতী এদিকে তো আসে না। চিঠি লিখে আনাতে গেলে পনেরো দিন দেরি হয়ে যাবে।

মৌংপের বড মেয়েটি খুব বুদ্ধিমতী। লেখাপডায় আগ্রহ তারই বেশি। প্রাকৃতিক দৃশ্য বলে যে একটা জিনিস আছে—মংডু শহরের মধ্যে সে-ই একমাত্র বর্মী মেয়ে, যে এ খবর রাখে।

তার বাবা উঠে গেলে সে আমায় বললে—আপনি এখানে কতদিন থাকবেন?

—বেশিদিন না। দশ বারো দিন যদি থাকি খুব বেশি।

—তবে আপনি আরাকান ইয়োমা দেখবার আশা ছাড়ুন—পায়ে হেঁটে যাবেন বলচেন, তাতে এক মাসের মধ্যে ওখান থেকে ফিরতে পারবেন না। আমি আপনাকে আর একটা পথ বলে দিই—একটা রাস্তা আছে, দেরাং আর আরাকান ইয়োমার মাঝখান দিয়ে চীনদেশ পর্যন্ত গিয়েচে—এ পথে গভর্নমেণ্টের ডাক যায় মংডু থেকে। আপনি মেলভ্যানে সিংজু পর্যন্ত যান, সেখান থেকে হেঁটে যাবেন—আমি বন্দোবস্ত করে দিতে পারবো। কিন্তু তু'জন লোক নেবে না মেলভ্যানে।

আমি বললুম, তাহ'লে আমারও যাওয়া হবে না, কারণ বন্ধুকে ফেলে তো যেতে পারিনে!

মেয়েটি বড় ভালো। ওর এক মামা ডাক-বিভাগে কাজ করেন, তাঁকে দিয়ে সে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা মেলভ্যানে নিতে রাজি হ'ল না তুজনকে।

সুরেনবাবুও পিছিয়ে গেলেন। তিনি এগারো টাকা ভাড়া দিয়ে মেলভ্যানে যেতে রাজি নন। হেঁটে যতদূর হয় যেতে পাবেন।

এর কিছুদিন পরে সুরেনবাবু মংডু থেকে চলে গেলেন এবং আমি একা মেলভ্যানে সিংজু রওনা হলুম।

মংডু ছাড়িয়ে প্রথম পঞ্চাশ-ষাট মাইল যেতে যেতে মনে হয় বাংলা-দেশের নোয়াখালি বা ময়মনসিং জেলার ধানক্ষেতের মধ্যে দিয়ে চলেচি। এমন কি, আম-কাঁটালের বাগানও চোখে পড়ে। তার পর নিবিড় জঙ্গল, আরাকান ইয়োমা পর্বত-শ্রেণীর বহু নিচু শাখা-প্রশাখা পথের তুপাশে দেখা যেতে থাকে।

ছোটবড় গ্রাম সর্বত্র, নিবিড় বন কোথাও নেই, মাঝে মাঝে ঝোপ-ঝাপ ও সেগুন গাছের সাজানো বাগান। বৌদ্ধমন্দির প্রত্যেক গ্রামেই

আছে, আর আছে ছোটখাটো দোকানপশার-ওয়ালা বাজার। দু-তিনটি চা-বাগানও পথে পড়ে।

সিংজু পৌঁছে গেল প্রায় সন্ধ্যার সময়। ডাকগাড়ির চালক হিন্দুস্থানী, তার সঙ্গে ইতিমধ্যে খুব ভাব করে নিয়েছিলুম, রাত্রে তার তৈরী মোটা হাতে-গড়া রুটি খেয়ে তার ঘরেই শুয়ে রইলুম।

পরদিন সে বললে—চলুন বাবুজি, এখানে থেকে মেলপিওন ডাক-ব্যাগ নিয়ে জঙ্গলের পথে অনেকদূর যাবে, আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই, তার সঙ্গে যাবেন।

সকাল আটটার সময় সিংজু থেকে বার হয়ে আকিয়াবগামী বড় রাস্তায় পড়লুম। এখান থেকে আরাকান ইয়োমা পর্বতের উচ্চ অংশ দৃষ্টিগোচর হয়। এই পর্বতমালা সমুদ্রোপকূলের সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে আকিয়াব থেকে প্রায় রেঙ্গুন পর্যন্ত বিস্তৃত।

সিতাং এ অঞ্চলের একটি বড় নদী, এই নদীর শাখাপ্রশাখা অনেকবার পার হতে হয়, আকিয়াব রোডের ওপর অনেকগুলি সেতু আছে, এই নদীর বিভিন্ন শাখার ওপরে।

এদিকের আরণ্য-প্রকৃতির রূপ সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এক এক গাছের গুঁড়ির গায়ে এত ধরনের পরগাছার জঙ্গল আর কোথাও কখনও দেখিনি। অনেক পরগাছে অদ্ভুত রঙিন্ ফুল ফুটে আছে। মাঝে মাঝে পার্বত্য ঝরনা, বড় বড় ট্রি ফার্ণ, এ বনের চেহারা আমার কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত। এ ধরনের বন বাংলাদেশের কুত্রাপি দেখিনি, কিন্তু বহুদিন পরে আসাম অঞ্চলে বেড়াতে গিয়ে শিলং থেকে সিলেট যাওয়ার মোটর রোডের দুধারে, বিশেষ করে ডাউকি প্রভৃতি নিম্ন অঞ্চলে, অবিকল অরণ্যের এই প্রকৃতি আমার চোখে পড়েচে।

বাংলাদেশের পরিচিত কোনো আগাছা, যেমন শেওড়া, ভাঁট, কাল-

কাসুন্দে প্রভৃতি এদিকে একেবারেই নেই। এদিকের উদ্ভিজ্জসংস্থান সম্পূ স্বতন্ত্র, তাতেই বোধ হয় যা দেখি তাই যেন ছবির মতো মনে জাগায় অপূর্ব সৌন্দর্যের অনুভূতি। সর্বত্র অসংখ্য সবুজ বনটিয়ার ঝাঁক। বড় বড় বেত ঝোঁপ। কাঁটাবনের নিবিড় জঙ্গল মাঝে মাঝে।

এই পথে প্রথম রবারের বাগান দেখি।

আগে রবারের বাগান বলে বুঝতে পারিনি, বড বড় গাছ, অনেকটা কাঁটাল পাতার মতো পাতা। গাছের গায়ে নম্বর মারা—কোনো কোনো বাগান কাঁটাতার দিয়ো ঘেরা, কোনো কোনো বাগান বেষ্টনীশূন্য ও অরক্ষিত অবস্থায় পড়ে আছে—শুনেছিলাম অনেক বাগান পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে।

এক জায়গায় ডাকপিয়াদার থাকবার জন্যে বনের মধ্যে ছোট খড়ের ঘর।

আমার সঙ্গে যে পিয়াদা এসেছিল, সে এর বেশি আর যাবে না। রাত্রে আমরা সেই খড়ের ঘরেই রইলুম, সকালে অন্যদিকের পিওন এসে এর কাছ থেকে ডাকব্যাগ নিয়ে যাবে, এ পিয়াদা ওর ব্যাগ নিয়ে চলে আসবে সিংজুতে।

আমরা যখন সে ঘরে পৌঁছুলাম, তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেচে।

ডাকপিয়াদার ঘরে যাপিত সেই রাত্রিটি আমার জীবনে মনে করে রাখবার মতো। দুধারে আরাকান ইয়োমার উন্নতকায় শাখা-প্রশাখা, সারা পর্বত-সানু নিবিড় অরণ্যময়। অরণ্যের সান্ধ্য স্তব্ধতা ভঙ্গ করেচে পার্বত্য ঝরনার কুলকুল শব্দ, অন্ধকার বনের দিক থেকে কত কি পাখীর ডাক আসচে; যদিও স্থানটির মাইলখানেকের মধ্যে খুব বড় একটা রবারের বাগান, তবুও সন্ধ্যায় যেন মনে হচ্ছিল পৃথিবীর প্রান্তসীমায় এসে পড়েচি দুজনে, জন-মানুষ নেই বুঝি এর কোনোদিকে।

বেশি রাত্রে ডাকপিয়াদা এসে পৌছুলো।

নবাগত ডাকপিয়াদার নাম কাচিন, একটু একটু ইংরিজি জানে; লোকটির চেহারা এমন কর্কশ ও রুক্ষ যে পথে-ঘাটে দেখলে ডাকাত বলে ভুল হবার কথা। তার সঙ্গে সারাদিন কাটাতে হবে বলে প্রথমটা ইতস্তত করেছিলাম, শেষ পর্যন্ত সকালবেলা তার সঙ্গেই নতুন পথে পা দিলাম।

এবার পথ নিবিড় অরণ্যময়।

আমরা ক্রমশ এক মহারণ্যে প্রবেশ করলুম। দুধার বড় বড় বনস্পতিতে সমাচ্ছন্ন। মানুষ নেই, জন নেই, গৃহ নেই, পল্লী নেই, মাঠ নেই, এতটুকু ফাঁকা স্থান নেই। কেবল নিবিড় জঙ্গল, মাঝখান দিয়ে আকিয়াব থেকে প্রোমে যাবার রাস্তা এঁকে বেঁকে চলেচে।

ছোটবড় নানা রকমের গাছ, শাখায় শাখায় জড়াজড়ি করে যেন এ ওর গায়ে এলোমেলো ভাবে পড়ে। বড় গাছগুলির মাথা যেন আকাশ ছুঁয়ে আছে—এক একটা গাছ প্রায় দেড় শো ফুট উঁচু। বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেলাম, এমনটি কোথাও দেখেচি বলে মনে হ'ল না।

প্রকৃতি এখানে যেন ভৈরবীর বেশে দর্শকের মনে ভীতি ও শ্রদ্ধার ভাব জাগিয়ে দেয়।

সম্মুখে একটি নদী। পাহাড়ী নদী, বালুময় চড়া, ক্ষীণ নদীস্রোত উপলরাশির ওপর দিয়ে ঝির ঝির করে বইচে, নদীর এপারে ওপারে সুবিশাল অরণ্য স্তরে স্তরে ক্রমোন্নত বৃক্ষশ্রেণী। বৃক্ষশ্রেণীর পেছনে সুদূরবিস্তৃত পর্বতশ্রেণী, তাও স্তরে স্তরে সাজানো।

নদী হেঁটে পার হওয়া গেল—হাঁটু পর্যন্ত জল, তবে তীক্ষ্ণ প্রস্তরখণ্ডে পা কেটে যেতে পারে বলে আমরা একটু সাবধানে জল পার হই। আবার ঢুকে পড়ি বনের মধ্যে, বেলা প্রায় দশটা, কিন্তু শাখা-প্রশাখার এমন নিবিড় জড়াজড়ি মাথার ওপরে যে, অতবেলাতেও সূর্যের আলো ঢোকেনি বনের পথে।

এইবার প্রোম রোড পাহাড়ের ওপর উঠেচে। খুব বড় বড় ঘাস, হোগলা বা নল-জাতীয়, তার মধ্যে দিয়ে পায়ে চলার পথের মতো সরু রাস্তা—মাঝে মাঝে আবার খুব চওড়া হয়ে এসেচে।

আমার সঙ্গী ডাকপিয়াদা বললে—খুব সাবধানে চলো, এখানে বুনো হাতীর ভয় খুব।

ওরই মুখে শুনলুম এই বনের মধ্যে গবর্নমেণ্টের হাতী-খেদা আছে; বছরে অনেক হাতী নাগা পাহাড়ের লিচু উপত্যকা থেকে এখানে আসে ব্রহ্ম ও আসাম সীমান্তের পাহাড়শ্রেণী ডিঙিয়ে—হাতীর নাকি অগম্য স্থান নেই, কোনো উঁচু পাহাড়ই তার পথ রোধ করতে পারে না।

এখান থেকে পঁচিশ ত্রিশ মাইল দূরে বনের মধ্যে পেট্রলের খনি আছে, ওরই মুখে শুনলুম। আকিয়াব-প্রোম রোড থেকে তারা রাস্তা বের করে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে খনিতে নিয়ে যাবার চেষ্টা করচে।

আমি ওকে বললুম—হাতীর কথা তো শুনচি, কিন্তু এ বনে বাঘ থাকা তো বিশেষ আশ্চর্যের ব্যাপার নয়—তুমি কি বল ?

সে বললে, বাঘের ভয় এখন নয়, সন্ধ্যার পরে। তার আগে আমরা আশ্রয় পাবো। হাতী দিনের আলো মানে না।

বেলা চারটে বাজতে না বাজতে সে বনে সন্ধ্যা হয়ে এল। দুপুর থেকে চারটের মধ্যে আমরা কিন্তু খুব বেশি পথ অতিক্রম করিনি, বড় জোর আট মাইল, সকাল থেকে এ পর্যন্ত পনেরো মাইলের বেশি আসিনি।

খুব সতর্ক হয়ে চলতে হয় বলে বনের মধ্যে পথ মোটে এগোয় না।

পাঁচটার সময় রীতিমত অন্ধকার নামলো। আমাদের খড়ের ঘর এখনও কতদূরে তার ঠিকানা নেই, অথচ ঘণ্টাখানেক আগে থেকে আমার সঙ্গী বলচে সামনেই ঘর।

এ পথে ডাকপিয়াদা সশস্ত্র চলে তাই কতকটা রক্ষে। আমার সঙ্গী

দেখতে বেঁটে-খাটো লোকটি, কিন্তু তার দেহ যেন ইস্পাতে তৈরী, যেমন নির্ভীক, তেমনি আমুদে। ভাঙা ভাঙা ইংরিজিতে কত রকমের হাসির গল্প করতে করতে আসচে সারাপথ।

বনের মধ্যে যখন পথ আর দেখা যায় না, তখন আশ্রয় মিললো।

নিবিড় বনপর্বতের মধ্যে খড়ের ঘর। এত বড় নির্জন বনের মধ্যে আমরা মোটে দুটি প্রাণী।

রাত্রে রান্না হ'ল শুধু ভাত। অন্য কোনো উপকরণ নেই, নুন পর্যন্ত না, এদেশের লোকের দেখলুম নুন না হ'লেও চলে। এর আগেও অনেক বার দেখেচি, নুনকে এরা রন্ধনের একটা অত্যাবশ্যক উপকরণ বলে আদৌ মনে করে না। সমস্ত দিন পথ হাঁটার পর শুধু ভাতই অমৃতের মতো লাগলো আমাদের মুখে।

বিছানায় শুয়ে পড়বার আগে আমি একবার বাইরে গিয়ে অরণ্যানীর নৈশরূপ দেখতে চাইলুম, ডাকপিয়াদা আমাকে বাইরে যেতে বারণ করলে।

তারপর সে একটা গল্প বললে।

মান্দালে থেকে পঞ্চাশ ষাট মাইল দূরে কোথায় গবর্ণমেণ্টের রিজার্ভ ফরেস্ট্ আছে। সেখানে একজন নতুন ফরেস্ট্ রেঞ্জার এসে একবার ডাক বাংলোয় উঠলো। ডাকবাংলোটির চারিধারে নিবিড় বন, সঙ্গের কুলিরা বলে দিলে সন্ধ্যা হ'লেই সাহেব যেন আর বাইরে থাকে না, ডাকবাংলোর দরজা জানালা ভালো করে বন্ধ করে দেয়, আর বেশ ভালো করে রোদ উঠবার আগে যেন দরজা খুলে বারান্দাতে না আসে।

রেঞ্জার ছিল মাদ্রাজী মুসলমান, খুব সাহসী, ত্রিশের মধ্যে বয়স। সন্ধ্যা হবার একটু আগেই সে দরজা বন্ধ করে দিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকলো। কিছুক্ষণ পরেই তার মনে পড়লো তামাক খাওয়ার পাইপটা বারান্দায় টেবিলে ফেলে রেখে এসেচে। তখনও ভালো করে অন্ধকার হয়নি—সাহেবের সঙ্গে যে

আরদালি ছিল সেও এ সব অঞ্চলে নতুন লোক। আরদালি ভাবলে চট্ করে দরজা খুলে পাইপটা নিয়ে আসবে। বাইরে গেল কিন্তু সে ফিরলো না; তার দেরি হতে দেখে সাহেব বারান্দায় গিয়ে কোনোদিকে আরদালির চিহ্ন দেখতে পেলে না। বাংলোর বাইরে কিছু দূরে কুলিদের থাকবার ঘরে আট দশজন কুলি ছিল, সাহেবের চীৎকারে তারা মশাল জ্বালিয়ে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এসে জড় হ'ল। বারান্দার ও প্রান্তে দেখা গেল বাঘের পায়ের থাবার দাগ। পরদিন দূর বনের মধ্যে হতভাগ্য আরদালির দেহাবশেষ পাওয়া যায়। এ ধরনের গল্প আমি কিন্তু এর আগে সুন্দরবন সম্বন্ধে শুনেছিলুম। সুতরাং এ গল্পে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। তবে বনের মধ্যে খড়ের ঘরের কোণে শুয়ে মন্দ লাগে না শুনতে এ ধরনের কাহিনী।

আমি ওকে বললুম—তুমি ইংরিজি শিখলে কোথায়?

ডাকপিয়াদা বললে—গ্রামের মিশনারী স্কুলে।

—তোমার বাড়িতে কে কে আছে?

—কেউ নেই, আজ দশবছর হ'ল মা বাবা গিয়েচেন, তারপর বাড়িও নেই। ডাক-পেয়াদার কাজ করি, সিংজুতে বাসা নিয়ে থাকি।

লোকটাকে বেশ লাগলো। অনেক রাত পর্যন্ত জেগে ওর সঙ্গে গল্প করলুম। ওর ইচ্ছে বিয়ে করে, কিন্তু সামান্য মাইনে পায় বলে সাহসে কুলোয় না।

আমি বললুম—কেন, তোমাদের দেশে তো তোমার চেয়ে অনেক কম মাইনে পেয়েও লোকে বিয়ে করচে? মংডুতে তো সামান্য ফিরিওয়ালাকে সস্ত্রীক জিনিস ফিরি করতে দেখেচি?

—বাবু, ওরা লেখাপড়া জানে না, তাই অমনি করে। আমি ইংরিজি স্কুলে তিন-চার বছর পড়ে তো আর ওদের মতো ব্যবহার করতে পারিনে!

আরও জিগ্যেস করে জানলুম ওখানকার একটি মেয়ের সঙ্গে তার খুব

ভাব। মেয়েটি সিংজুতে চুরুটের কারখানায় কাজ করে, সপ্তাহে দুটাকা করে মাইনে পায়।

আমি বললুম—সে কি বলে ?

—সে বলে বিয়ে করো। আমি সাহস পাইনি কিন্তু, কোথায় রাখবো, কি খেতে দেবো। এই তো সামান্য মাইনে।

—তার বাপ মা নেই ?

—কেউ নেই, আমারই মতো অবস্থা।

ডাকপিয়াদা আসলে বড় প্রেমিক, যেমন তার প্রণয়িনীর কথা উঠলো, সে আর অন্য কথা বলে না প্রণয়িনীর কথা ছাড়া। মেয়েটি নাকি বড় ভালো, তাকে খুব ভালোবাসে, চুরুটের কারখানায় কাজ করে যা পায়, নিজের খাওয়া পরা বাদে সব জমিয়ে রাখে ওদের ভবিষ্যৎ সংসারের জন্যে, একটি পয়সা বাজে খরচ করে না।

অত বড় বনের মধ্যে কিন্তু রাত্রে কোনো রকম শব্দ শুনলাম না বন্যজন্তুদের। একটি শেয়াল পর্যন্ত ডাকলো না। খানিক রাত্রে দুজনেই ঘুমিয়ে পড়লুম।

সকালে এদিকের ডাকপিয়াদা এল। ঠিক করাই ছিল যে আমি তার সঙ্গে মোংকেট পর্যন্ত উনিশ মাইল পথ হেঁটে যাবো।

কিন্তু আমার সঙ্গী ডাকপিয়াদা কথায় কথায় রাত্রেই আমায় বলেছিল যে, পাহাড় জঙ্গলের পথ এখানে শেষ হয়ে গেল, এরপর আর বেশি জঙ্গল নেই, কেবল পড়বে রবারের বাগান আর ধান ক্ষেত। আবার জঙ্গল আছে মান্দালে ছাড়িয়ে গোয়েটেক্‌ সেতু পার হয়ে উত্তর-পূর্ব ব্রহ্মসীমান্তে। সেদিকের বন অত্যন্ত নিবিড়, সে পথ অনেক বেশি দুর্গম।

আমি ডাকপিয়াদাকে বললুম, এই নতুন লোকটিকে জিগ্যেস করো তো কতদূর আর জঙ্গল পড়বে; ততদূর ওর সঙ্গে যাবো—

নবাগত ডাকপিয়াদা খাস বর্মিজ ছাড়া অন্য কোনো ভাষা জানে না, তার সঙ্গে কথা বলা সম্ভব নয় আমার। আমার পূর্ব সাথী বললে---বাবু, ও বলচে সাত মাইল পর্যন্ত এই রকম জঙ্গল আর পাহাড়, তারপরে আবার বর্মা রবার কোম্পানির বড় একটা বাগান পড়বে দুতিন মাইল, তারপরে ধানের ক্ষেত আর বস্তি।

এই সাত মাইল আমি ওর সঙ্গে গেলুম।

প্রভাতের সূর্যালোক বনের ডালে ডালে বাঁকাভাবে পড়েছে, কারণ পাহাড়ের পূর্বদিকের অংশটা খুব নিচু।

অনেক রকমের বন্যপুষ্পের মধ্যে সাদা সাদা কি এক ধরনের ফুল ছোট-বড় সব গাছের মাথা ছেয়ে রেখেচে, কোনো লতার ফুল হবে, কিন্তু লতা আমার চোখে পড়লো না। খুব ঘন সুগন্ধ সে ফুলের, যে যে গাছের মাথায় সে ফুলের মেলা, তার তলা দিয়ে যাবার সময় উগ্র সুবাসে মাথার মধ্যে যেন ঝিম ঝিম করে, আমি ইচ্ছে করে খানিকটা দাঁড়িয়ে থেকে দেখেচি, মনে হয় যেন শরীর টলচে।

একটি জায়গায় সৌন্দর্যের ছবি মনে গভীর দাগ কেটে রেখে গিয়েচে।

পথের ধারে একটি পাহাড়ী নদী, মাথার ওপর সেখানে আকাশ দেখা যায় না, বড় বড় বনস্পতিদের শাখাপ্রশাখার মেলা, মোটা লতা ঝুলে জলের ওপর পর্যন্ত পৌঁছেচে, বাঁদিকের বন এত ঘন যে কালো-মত দেখাচ্চে, ডানদিকে জলের ওপরে শিলাখণ্ডের অগ্রভাগ জেগে আছে।

রাস্তাটা ওপার থেকে এসেচে টেরচা ভাবে, বনের মধ্যে ঘুরে ফিরে নদীর ধারে এসে যেন হঠাৎ খানিকটা ঢালু হয়ে নেমে নদীগর্ভে ঢুকেচে। সেই দিকটা এপার থেকে দেখাচ্চে যেন চীনা চিত্রকরের হাতে আঁকা

ছবির মতো। একটা শিলাখণ্ডের উপর বসে সেই দৃশ্য কতক্ষণ উপভোগ করলুম একমনে, আমার সঙ্গী ডাকপিয়াদা এখানে জলে স্নান করতে নামলো।

নদী চওড়া হবে হাত-কুড়ি কি বাইশ। হেঁটে পার হতে হয় অবিশ্যি, হাঁটুজলের বেশি নেই কোথাও! আমরা যখন বসে, তখন ওপার থেকে পাঁচ ছ'জন লোক একজন সম্ভ্রান্ত ব্রহ্মদেশীয় মহিলাকে সিডান চেয়ারে বসিয়ে নিয়ে এসে জলে নামলো।

আমার সঙ্গী ডাকপিয়াদা সিডান চেয়ার কখনো দেখে নি, হাঁ করে চেয়ে রইল। শুনলুম এদেশে এ জিনিসের প্রচলন নেই, রবার-বাগান-ওয়ালা ধনী লোকেরা চীন ও মালয় উপদ্বীপ থেকে এর আমদানি করেচে।

মহিলাটি যখন জল পার হ'লেন চেয়ারে বসে, তখন লক্ষ্য করলুম সাধারণ বর্মিজ মেয়ের তুলনায় তিনি অনেক বেশি সুন্দরী। এমন কি, আমার মনে হ'ল, গায়ের রং বর্মিজদের মতো নয়, গোলাপী আভা ধপ-ধপে সাদার ওপর।

আমার সঙ্গী জলে নেমে স্নান করছিল, সে তাড়াতাড়ি জল থেকে উঠে পড়লো।

এ ধারে এসে সিডান চেয়ারের বাহকেরা চেয়ার নামিয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করলে। মহিলাটি একবার কৌতূহল-পূর্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে চাইলেন, আমিও চেয়ে দেখলুম, বেশ সুন্দর মুখশ্রী।

পরে সিংজু'তে জিগ্যেস করে আমি জেনেছিলুম তিনি বর্মিজ নন, সান্ দেশীয় মেয়ে। সান্ মহিলারা সাধারণত ব্রহ্মদেশীয় মেয়েদের চেয়ে দেখতে অনেক সুন্দরী। মহিলাটি জনৈক ইউরোপীয় রবার-বাগানের মালিকের বিবাহিতা পত্নী, অনেক টাকার মালিক ওঁর স্বামী।

ওঁরা প্রায় আধঘণ্টা খেয়াঘাটে বসে রইলেন, আমার সঙ্গী ডাকপিয়াদা আরও দূরে গাছপালার আড়ালে গিয়ে স্নান সেরে এল।

সেদিনই ওখান থেকে সিংজুর দিকে ফিরলাম।

আবার সেই বনানী, আগের দিনের সেই খড়ের ঘরে রাত্রিযাপন।

মংডুতে ফিরে মিঃ মৌংপের সঙ্গে দেখা করতে গেলুম সন্ধ্যাবেলা। ওরা সকলেই খুব খুশি হ'ল আমায় দেখে। মেয়ে-দুটি রোজ বর্মিজ গান গাইতেন, বড় মেয়েটির গলা বেশ সুরেলা বলে মনে হত আমার কাছে, যদিও গানের অর্থ এক বর্ণও বুঝতুম না। এদিন ওঁরা দুজনেই অনেকগুলি গান গাইলেন, বনের অনেক গল্প শুনলেন, শেষে রাত্রে তাঁদের ওখানে খেতে বললেন।

ব্রহ্মদেশীয় পরিবারে একটি জিনিস লক্ষ্য করেচি, যাকে তারা একবার বন্ধুভাবে পরিবারের মধ্যে গ্রহণ করেচে, তার সঙ্গে ওদের ব্যবহার নিঃসঙ্কোচে ও উদার আত্মীয়তাতে ভরা। ব্রহ্মদেশীয় খাদ্য কখনও খাইনি, আমার ভয় ছিল হয়তো এমন সব খাবার জিনিস টেবিলে আসবে যা মুখে তোলা আমার পক্ষে শক্ত হয়ে উঠবে। কিন্তু ওঁদের ব্যবহার এত সুন্দর—এমন কোনো আহার তাঁরা আমার সামনে স্থাপিত করলেন না, যা আমার অপরিচিত। মিষ্টি পোলাও, মাংস, মাছ, মংডুর বাঙালী ময়রার দোকানের সন্দেশ ও রসগোল্লা।

আমি বড় মেয়েটিকে বললুম—আপনাদের বাড়ির রান্না ভারি চমৎকার —বাংলাদেশের রান্নার মতই ধরন তো অবিকল।

বড় মেয়ে মৌংকেট হেসে বললে, এ যা খেলেন, আমাদের দেশের খাবার কিন্তু এ নয়। হয়তো সে আপনি খেতে পারতেন না।

—তাই কেন খাওয়ালেন না?

—আপনার মুখে ভালো লাগতো না। আপনি শুটকি মাছ খেয়েচেন কখনো?

—খাইনি কখনো। তবে একবার খেয়ে না হয় দেখতুম। আর নাপ্পি? সেটা বাদ গেল কেন?

—নাপ্পি সব সময় বা সকল ভোজে খায় না। ও একধরনের চাটনি হিসেবেই খাওয়া হয়। নাপ্পি টেবিলে দিলে আপনি উঠে পালাতেন।

—বাঙালী-রান্না আপনারা জানেন ?

—আমাদের রান্না একটাও নয়। বাঙালী বাবুর্চি দিয়ে সব রাঁধানো। আমরা পোলাওটা রাঁধতে পারি, মংডু বাংলাদেশের কাছে, অনেক বাঙালী এখানে থাকেন, আমাদের খাওয়া-দাওয়া অনেকটা বাঙালী ধরনের হয়ে গিয়েচে।

হাসিগল্পের মধ্যে দিয়ে খাওয়া শেষ হ'ল।

পরদিন আমি ওঁদের একটি বাঙালী হোটেলে নিমন্ত্রণ করে খাওয়ালুম। ওঁদের সঙ্গে এত আলাপ হয়ে গিয়েছিল এ ক'দিনে যে, সাতদিন পরে যখন মংডু ছেড়ে চলে আসি তখন সত্যিই বড কষ্ট হয়েছিল ওঁদের ছেড়ে আসতে। আসবার সময় মিঃ মৌংপে মেয়েদুটিকে নিয়ে জাহাজঘাটে আমায় বিদায় দিতে এলেন। মৌংকেট একটা সুদৃশ্য চন্দনকাঠের ছোট বাক্স ভর্তি সমুদ্রের কড়ি, ঝিনুক আমায় উপহার দিলেন। দুঃখের বিষয় এই বাক্সটি সেইবারেই ঢাকা আসবার সময় ট্রেনে খোয়া যায়!

মংডু থেকে চাটগাঁ ফিরে আমার পূর্বপরিচিত সেই ভদ্রলোকের বাড়িতে এসেই উঠলুম। এই উপলক্ষ্যে একটা কথা আমার এখনও মনে আছে। চট্টগ্রাম আমার কাছে তো বহুদূর বিদেশ, কিন্তু যখন ডবল মুরিংস্ জেটি থেকে ঘোড়ার গাড়ি করে ওদের বাড়ি যাচ্ছি, তখন মনে হ'ল যেন অনেক-দিন পরে বাড়ি ফিরলুম।

ওদের সেই বৈঠকখানার পাশেই মুলী বাঁশের চাঁচে ছাওয়া ছোট্ট ঘর-খানি আমার কত প্রিয় পরিচিত হয়ে উঠেছিল, যেন আমার কতদিনের গৃহ কোণটি। উঠানের বাতাবীলেবুগাছের ছায়া যেন কতকালের পরিচিত আশ্রয়।

পথে পথে অনেকদিন বেড়িয়ে এই ব্যাপারটি আমি লক্ষ্য করেছি, মন যেখানে এতটুকু আশ্রয় পায় সেইখানেই তার আঁকড়ে ধরে থাকবার কেমন একটা আগ্রহ গড়ে ওঠে। সে আশ্রয় যখন চলে যায়, তখন মন আশ্রয়ান্তরে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে পারে অত্যন্ত সহজে ও অবলীলাক্রমে।

একটা ছবি আমার এই সম্পর্কে বহুদিন মনে ছিল।

যখন চাটগাঁ আসচি স্টীমারে, দূর থেকে দেখতে পেলাম কর্ণফুলির মোহানার বাইরে সমুদ্রের মধ্যে একখানা বড় পালতোলা জাহাজ নোঙর করা আছে। নীল সমুদ্রের মধ্যে বহুদূর থেকে জাহাজখানা দেখাচ্চে যেন একটি দ্বীপের মতো, যেন অকূল সমুদ্রের কূলে দুঃখসুখবিজড়িত একটি ক্ষুদ্র গৃহকোণ, তার সাদা ভাঁজকরা গোটানো পালগুলো, লম্বা লম্বা মাস্তুলগুলো আর মস্ত বড় কালো খোলটা আমার মনে বহুদিন স্থায়ী রেখাপাত করেছিল।

চাটগাঁয়ে ওদের বাড়ি আসতে ওরা আমাকে সাগ্রহ অভ্যর্থনা করলে—মুলী বাঁশে ছাওয়া সেই ছোট ঘরটাতে আবার বিছানা পেতে দিলে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জন্যে মংডু থেকে বর্মিজ পুতুল ও খেলনা এনেছিলুম—তারা সেগুলো পেয়ে খুব খুশি।

একদিন বাড়ির কর্তা বললেন, চলুন সীতাকুণ্ড যাবেন? আপনি তো চন্দ্রনাথ যাননি, অমনি চন্দ্রনাথ ঘুরে আসবেন, এ অঞ্চলে এসে চন্দ্রনাথ না দেখলে বাড়ি ফিরে লোককে বলবেন কি!

পরদিন সকালের ট্রেনে দুজনে গিয়ে নামলুম সীতাকুণ্ড।

বরিশাল থেকে চট্টগ্রাম আসবার পথে একদিন এই চন্দ্রনাথ পাহাড়কে দূর থেকে দেখেছিলুম, তখন মনে ভেবেছিলুম চাটগাঁ পৌঁছেই আগে চন্দ্রনাথ দেখতে হবে। অন্য কাজে ব্যস্ত থাকায় তা আর তখন হয়ে ওঠেনি।

আজ দেয়াং আর আরাকান ইয়োমা পর্বত-শ্রেণী ও অরণ্যভূমি বেড়িয়ে

এসে চন্দ্রনাথ পর্বতকে নিতান্ত উইটিবির মতো মনে হচ্চে। হাজার দেড় কি সতেরোশ' ফুট উঁচু পাহাড় আবার কি একটা পাহাড নাকি! কিন্তু এ ভুল আমার পরে ভেঙেছিল, সে কথা বলচি।

সীতাকুণ্ড গ্রামের মধ্যে কর্তার পরিচিত এক পাণ্ডার বাড়ি গিয়ে দুজনে উঠলাম। আমার সঙ্গী এ অঞ্চলের একজন বিখ্যাত লোক ও জমিদার, সীতাকুণ্ড গ্রামে তাঁর নিজের একখানা বাগানবাড়ি আছে, অপরিষ্কার হয়ে পড়ে আছে বলে সেখানে ওঠা হয় নি—এই পাণ্ডাটি এঁর আশ্রিত ও অনুগত ব্যক্তি, তাই এখানেই ওঠা হ'ল—তীর্থধর্ম করে পুণ্য অর্জন করবার জন্যে নয়।

পাণ্ডাঠাকুর অবিশ্যি বাঙালী ব্রাহ্মণ, আমায় বললে—পাহাড়ে উঠবেন না? চলুন নিয়ে যাই—

আমার সঙ্গী হেসে বললেন—তোমায় নিয়ে যেতে হবে না ঠাকুর মশাই। উনি নিজেই যেতে পারবেন, অনেক পাহাড জঙ্গল ঘুরেচেন একা—তোমাদের চন্দ্রনাথ পাহাড়ে একা যেতে আটকাবে না ওঁর!

পাণ্ডাঠাকুরের প্রাপ্য তাহ'লে মারা যায়—সে তা ছাড়বে কেন। আমাকে নিয়ে সে পাহাড়ে উঠলো। চন্দ্রনাথের বৃক্ষলতার শোভা আমার মন মুগ্ধ করলে ওঠবার পথে, বিরূপাক্ষ মন্দির ছাড়িয়েই। অনেক বড় লোক পাহাড়ে ওঠবার সিঁড়ি তৈরি করে দিয়েচে নিজেদের পরলোকগত আত্মীয়দের স্মৃতিরক্ষার জন্যে, মার্বেল পাথরের ফলকে তাদের নাম-ধাম লেখা আছে, আমার তো খুব ভালো লাগছিল প্রত্যেকখানি মার্বেল-পাথরের ফলক পড়তে, ওঠবার সময় অনেক দেরি হয়ে গেল সেজন্যে।

বিরূপাক্ষ মন্দির ছাড়িয়ে অনেক দূর উঠে একটা পাহাড়ী ঝরনা নেমে আসচে, সেখান থেকে পথ দু'ভাগে ভাগ হয়ে দুদিক দিয়ে ওপরে উঠচে।

এই পর্বতে উঠে হঠাৎ পিছন ফিরে চেয়েই দেখি নীল সমুদ্র ও সন্দ্বীপের অস্পষ্ট সবুজ তটরেখা।

সেখানে বাঁধানো সিঁড়ির ওপরে বসে রইলুম খানিকটা। সামনের পার্বত্যঝরনার কুলু কুলু ধ্বনি, বন-ঝোপের ছায়া, বন-কুসুমের সুবাস ও দূরের নীল সমুদ্রের দৃশ্য যেন চোখের সামনে এক মায়ালোকের সৃষ্টি করেচে, উঠতে ইচ্ছে হয় না।

পাণ্ডা বললে, বড দেরি হয়ে যাবে বাবু, চলুন ওপরে।

আবার দুজনে ওপরে উঠতে লাগলুম। নিবিড় মুলী বাঁশের বন, গাছ পাতা ও লতা ঝোপের বিচিত্র সমাবেশ। মাঝে মাঝে ঝরনা নেমে আসচে বড় বড পাথরের পাশ কাটিয়ে, মাঝে মাঝে বনের ফাঁক দিয়ে সমুদ্র দেখা যাচ্চে, মাঝে মাঝে আডাল পড়চে বন-ঝোপের।

চন্দ্রনাথে পাহাডের দৃশ্য এদিক দিয়ে অন্য অনেক পার্বত্য দৃশ্য থেকে সম্পূর্ণ পৃথক।

অন্য সব জায়গায় পাহাড আছে, কিন্তু হয়তো বনানী নেই; যদিও বন থাকে তবে একঘেয়ে বন। একই গাছের, ইংবেজীতে যাকে বলে homogenus forest, যেমন আছে সিংভূম, মানভূম, সারেণ্ডা প্রভৃতি অঞ্চলে। সে বনের বৈচিত্র্য নেই, মনকে তত আনন্দ দেয় না, চোখকে তত তৃপ্তি দেয় না।

আরাকান ইয়োমা পর্বতের বনভূমি যে প্রকৃতির, চন্দ্রনাথ পাহাডের বনও সেই একই প্রকৃতির, বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই; কেবল মাত্র এইটুকু যে, পূর্বোক্ত অরণ্যে বনস্পতিজাতীয় ফার্ণ যথেষ্ট, চন্দ্রনাথের বনে ও-জাতীয় ফার্ণ আদৌ নেই।

তাছাডা এমন পাহাড়, বনানী ও সমুদ্রের একত্র সমাবেশ আর কোথাও দেখা যাবে না বাংলাদেশে। ভারতবর্ষেও দক্ষিণ ভারতের

দক্ষিণ উপকূলের কয়েকটি স্থান ও মালাবার উপকূল ছাড়া আর কোথাও নেই।

অনেকে ভাবেন চন্দ্রনাথ ছোট একটি পাহাড হয়তো; আসলে চন্দ্রনাথ একটি পাহাড নয়, পাহাড-শ্রেণী। দৈর্ঘ্যে ষাট মাইলের কম নয়। পরস্পর সমান্তরাল ভাবে অবস্থিত এর চারটি থাক্ আছে, সামনের গুলি তেমন উঁচু নয়, সকলের পেছনের থাক্‌টির উচ্চতা গড়ে দেড হাজার ফুট।

চন্দ্রনাথ পাহাডশ্রেণী আসলে পূর্ব হিমালয়ের একটি ক্ষুদ্র শাখা, যেমন আরাকান ইয়োমা বা সমগ্র উত্তরব্রহ্ম, আসাম, পার্বত্য ত্রিপুরার ছোট-বড সকল শৈল শ্রেণীই হিমালয়ের দক্ষিণ বা পূর্বমুখী শাখাপ্রশাখার বিভিন্ন অংশ। সেই একই নগাধিরাজ হিমালয় বিভিন্ন নামে বিভিন্ন মূর্তিতে পরব্রহ্মের বহু অবতারের মতো এসব অঞ্চলে ছডিয়ে আছে।

এদিন পাণ্ডাঠাকুরের তাডায় বেশিক্ষণ পাহাডের চুড়ায় বসা সম্ভব হ'ল না। সন্ধ্যা হয়ে যাবে এত বনে, সারা পথে একটাও লোক নেই।

সেদিন নেমে এলুম বিকেলের দিকে।

ওদের সুপুরি বাগানের মধ্যে ছোট্ট চাঁচের আর টিনের বাড়ি, পথের ধারে পাটি-পাতা গাছ আর বেতবন। পাটিপাতার গাছ থেকে শীতল পাটি বোনা হয়—এ অঞ্চলে সর্বত্র এ গাছ বনে-জঙ্গলে দেখা যায়; ঘন সবুজ চওড়া পাতা, অনেকট আমাদের দেশের বন-চালতে গাছের মতো ডাল-পালার আকৃতি।

সেদিন সন্ধ্যায় সুপুরি বনের মধ্যে ছোট ঘরে একা চুপ করে বসে আছি, সামনে একটা মাটির প্রদীপ জ্বলচে, বাইরে তারাভরা আকাশ, দূরে চন্দ্রনাথ পাহাড-শ্রেণীর কৃষ্ণ সীমারেখা।

কতবার দেখেচি এমন সব সময়ে যেন মাটির পৃথিবী আর জ্যোতি-র্লোকের গ্রহতারা এক হয়ে যায়—স্বপ্ন ভেঙে উঠে চাঁদের বাতির তলায়

নিদ্রামগ্ন পৃথিবীর রূপ দেখে কতবার অবাক হয়ে গিয়েচি—খানিকটা চিনি, খানিকটা চিনি না একে।

কি বিরাট ইঙ্গিত সমগ্র ছায়াপথের, পত্রপল্লবের মর্মরধ্বনির, শান্ত জ্যোৎস্নালোকের ঝিল্লীমুখর নিশীথরাত্রির!—

পথের ধারে শুধু ওদের ডাক, বহুদূর পথ ব্যেপে। ঘর থেকে অন্য রকম শোনাবে, পথ থেকে অন্য রকম।

তারপর যা বলছিলুম—

ঘরের মধ্যে বসে আছি, এমন সময়ে একটি তরুণী বধূ ঘোমটা দিয়ে ঘরে ঢুকে আমার সামনে একবাটি মুগের ডাল ভিজে আর একটু কি গুড় রাখলেন। কোনো কথা বললেন না। আমি একটু আশ্চর্য না হয়ে পারলুম না—হেমন্তের শিশিরার্দ্র রাত্রে মুগের-ডাল-ভিজে কি রকম জলখাবার!

ভাবলুম—হয়তো এখানে এইরকমই খায়। পরের বাড়ি অতিথি, আহার্য সম্বন্ধে নিজের মতামত এখানে চলবে না আমার। ডাল-ভিজে কিছু খেয়ে যখন বাটিটা রেখে দিয়েচি, তখন বধূটি একবাটি গরম দুধ এনে সামনে রাখলেন। এবার আমার সন্দেহ হ'ল, আমি বললুম—এখন দুধ কেন মা? সন্ধেবেলা আমি তো দুধ খাইনে?

পাণ্ডাঠাকুরের স্ত্রী চট্টগ্রামের কথ্য ভাষায় নিম্নস্বরে কি বললেন ভালো বুঝলাম না। যাইহোক, ভাবলাম দুধ খাওয়ানোর জন্য যখন এত পীড়াপীড়ি, না হয় দুধটা খেয়েই নিই।

পুনরায় পাণ্ডাঠাকুরের স্ত্রী দু-টুকরো হর্তুকি নিয়ে এসে আমার সামনে রাখলেন! ব্যাপার কি, আমায় কি এরা সন্ন্যাসী ভেবেচে?…সবাই খাচ্চে পান, আমার বেলা হর্তুকি কিসের? রাত্রে আমার সাথীর খাবার ডাক পড়লো, আমায় কেউ ডাকলে না—আমি তো অবাক, ব্যাপার কিছু বুঝতে পারিনে।

আমার সঙ্গী খেতে গেলেন, কারণ তিনি বেড়িয়ে ফিরেছিলেন অনেক রাত্রে, ভাবলেন আমি বোধহয় খাওয়া-দাওয়া সেরে বসে আছি।

আমি কিছু না বলে চুপ করে রইলুম। খিদে বেশ পেয়েচে, এত লম্বা রাত না খেয়ে কাটাই বা কি করে? বড় মুশকিলে ফেলেচে এরা।

অবশেষে শুয়ে পড়লুম রাত্রে। সকালে উঠে আমার সঙ্গীর চা এল, আমাকে কেউ চা দিলে না। বিরক্ত হয়ে ভাবলুম, এরা বড় অভদ্র, এদের এখান থেকে চলে যাবো, বড়লোক দেখে ওঁর খাতির করচে খুব, আর আমাকে কাল রাত্রে খেতে দিলে না, সকালে একটু চা পর্যন্ত দিলে না—আজই চলে যাবো।

আমার সঙ্গী বললেন, চলুন বেড়িয়ে আসি—

পাণ্ডাঠাকুর ইতিমধ্যে একটা পুঁটুলি, খান-দুই কুশাসন, একটা ঘটি হাতে এসে আমায় বললেন—চলুন যাই, এর পরে বেলা হয়ে যাবে—

আমি অবাক হয়ে বলি, কোথায় যাবো?

—শ্রাদ্ধের কাজগুলো সকাল সকাল সারি—

—কার শ্রাদ্ধ?

—আপনি মা-বাপের শ্রাদ্ধ করবেন তো—

—কে বললে আমি শ্রাদ্ধ করবো?

পাণ্ডাঠাকুরের মুখ দেখে মনে হ'ল জীবনে তিনি কখনো এত বিস্মিত হন নি, আমায় বললেন—সে কি! আপনি কাল রাত থেকে সংযম করে আছেন কেন তবে? আমার স্ত্রী বললেন—

আমার এতক্ষণে সব পরিষ্কার হয়ে গেল—কাল রাত্রের গোটা ব্যাপারটার অর্থ এতক্ষণে বুঝলাম। আমি ওঁর স্ত্রীর কথা বুঝতে পারিনি, তা থেকেই সমস্ত ভুলটার উৎপত্তি। আমার সঙ্গী সমস্ত ব্যাপারটা শুনে তো হো হো করে হেসে উঠলেন। পাণ্ডাঠাকুর মহা অপ্রতিভ। তিনি

বাড়ির মধ্যে স্ত্রীকে গিয়ে তিরস্কার আরম্ভ করলেন—আমি তাঁকে শান্ত করে বাইরে নিয়ে এলুম।

পাণ্ডাঠাকুর আমার কাছে যথেষ্ট ত্রুটিস্বীকার করলেন, কাল রাত্রে না খেতে দিয়ে রেখে দিয়েচেন সেজন্যে খুব লজ্জিত হ'লেন।—সংযম করবেন আপনি সে কথা ভেবেই আমায় স্ত্রী দুধ আর মুগের ডাল ভিজে খেতে দিয়েছিলেন সন্ধ্যাবেলা।

আমার সাথী বললেন—আপনিই বা বললেন না কেন যে আপনি শ্রাদ্ধ করবেন না? আপনি তো দিব্যি দুধ খেয়ে বসে রইলেন—

আমি বললুম—তা কি করে জানবো? আমি কি ছাই মায়ের কথা কিছু বুঝলুম?

—বেশ, বেশ! কথা না বোঝার দরুন আপনাকে উপোস করতে হ'ল সারারাত—

পাণ্ডাঠাকুর বাঙালী ব্রাহ্মণ, বড় ভালো লোক স্বামী-স্ত্রী দুজনেই, আর বড় নিরীহ। এই ব্যাপারে দুজনে এত লজ্জিত ও অপ্রতিভ হয়ে গেলেন যে তারপরে যে দুদিন ওখানে ছিলাম, ওঁরা যেন নিতান্ত অপরাধীর মতো সঙ্কুচিত হয়ে রইলেন আমার কাছে।

একটু বেলা হ'লে আমি বললুম—আজ আমি একা বাড়বাকুণ্ড আর সহস্রমায়া যাবো—

পাণ্ডাঠাকুর বললেন—দুটো দুদিকে—আজ একদিকে যান, সহস্রমায়া কিন্তু একা যেতে পারবেন না—বাড়বাকুণ্ড যাওয়া সহজ। রাস্তা বলে দেবো, চলে যাবেন।

আবার বনের মধ্যে দিয়ে পথ। এবার সম্পূর্ণ একা চলেচি। লোক সঙ্গে থাকলে প্রকৃতিকে ঠিক চেনা যায় না, বোঝা যায় না। আরাকান

ইয়োমার পথে দেখেচি, সঙ্গে লোক থাকলে এত বক্ বক্ করে যে মন কিছুতেই আত্মস্থ হতে পারে না।

বাড়বাকুণ্ডের পথের দুধারে ঘন জঙ্গল, সমস্ত পথের পাশে কোথাও একটি লোকালয় নেই। মাঝে মাঝে বন্য পেয়ারা ও বন্য কদলীর বন, করবীফুলের সমারোহে শৈল সজ্জিত। কোথাও বা একটি পাহাড়ী ঝরনা সংকীর্ণ পথের ওপর দিয়ে বয়ে চলেচে, আশেপাশে বনঝোপের শান্ত, শ্যামল সৌন্দর্য।

পথের ধারে দু-জায়গায় পাহাড়ের ফাটল দিয়ে নীলবর্ণ অগ্নিশিখা বার হয়ে সমস্ত শৈলশ্রেণীর আগ্নেয় প্রকৃতি প্রমাণ করে দিচ্চে।

বাড়বাকুণ্ড পৌঁছতে প্রায় তিন ঘণ্টা লেগে গেল। এর প্রধান কারণ আমি একটানা পথ হাঁটিনি, মাঝে মাঝে বনগাছের ছায়ায় শৈলাসনে বসে বিশ্রামের ছলে চারিপাশের অনুপম গিরিবনরাজির শোভা উপভোগ করছিলুম। এক এক জায়গায় শৈলসানুতে এত বন্য কদলীর বন, প্রথমটা মনে হয় সেখানে কেউ কলার বাগান করে রেখেচে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করে জানা গেল মানুষের বসতি নিকটে কোথাও নেই, ওগুলি পাহাড়ী বনকলার গাছ।

পরে এই পাহাড়ী কলা খেয়ে দেখেচি, অনেকটা বাংলাদেশের দয়া কলার মতো বীচিসর্বস্ব। তেমন সুমিষ্টও নয়। বাড়বাকুণ্ড স্থানটি একটি উষ্ণ প্রস্রবণ, গরম জলের সঙ্গে সধূম অগ্নিশিখা বার হচ্চে, জলে ও আগুনে ভীষণ গন্ধকের গন্ধ। পাণ্ডাঠাকুরেরা নিজেদের সুবিধের জন্যে জায়গাটা বাঁধিয়ে রেখেচে—যাত্রীরা গিয়ে দাঁড়ালেই তারা নানারকমে পয়সা আদায় করবার চেষ্টা করে, আমাকেও তারা ঘিরে দাঁড়ালো।

আমি বললুম—আমি যাত্রী নই, পথিক, পুণ্য করতে আসিনি, দেখতে এসেচি।

তারা ভয়ানক আশ্চর্য হয়ে গেল, এমন অদ্ভুত কথা যেন জীবনে কোনোদিন শোনেনি।

বললে—কোথা থেকে আসচেন ?

—কলকাতা থেকে—

—হিন্দু না খৃষ্টান ?

—হিন্দু।

একটি অল্পবয়সী পাণ্ডাঠাকুর আমায় একপাশে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললে—আমি সস্তায় আপনার কাজ করিয়ে দেবো—পাঁচসিকে পয়সা দেবেন আমায়। আমি বড় গরিব, বাবা মারা গিয়েচেন আজ দুবছর হ'ল, সংসার চালানো কঠিন হয়ে উঠেচে। আমায় যা দেবেন, তাই নেবো।

ছেলেটির ওপর মমতা হ'ল। আমি বললুম—বেশ, তোমায় আমি একটা টাকা দেবো—কিন্তু কোনো কাজকর্ম করার দরকার নেই আমার। তোমার প্রণামী স্বরূপ টাকাটা নাও—

ও বললে—আমার বাড়ি এবেলা খেয়ে যান—দুপুর ঘুরে গেল, না খেয়ে গলে কষ্ট হবে।

দরিদ্র পাণ্ডাঠাকুরের ঘরবাড়ি দেখবার আগ্রহেই আমি তার সঙ্গে তার বাড়ি গেলাম। পাহাড়ের একপাশে কয়েকটি ক্ষুদ্র মুলী-বাঁশের ঘর, তারই একখানাতে সে আর তার বিধবা মা বাস করে।

আমি যেতে ওর মা বার হয়ে এসে হাসিমুখে আমার জন্যে একখানা মোটা বুহুনির শীতল পাটি পেতে দিলেন।

আমি তাঁকে প্রণাম করে একটা টাকা তাঁর পায়ে রাখলুম।

পাণ্ডাঠাকুরের মায়ের খাঁটি দেহাতী চাটগেঁয়ে বুলি আমার পক্ষে ভীষণ দুর্বোধ্য হয়ে উঠলো।

তিনি বললেন—বাবা, তুমি কি চা-পানি খাও?

—না মা, এত বেলায় আর চা খাব না।

—আমাদের বাড়ি চা নেইও। যদি অসুবিধে হয় তবে দোকান থেকে আনিয়ে দিতাম, তোমরা কলকাতার লোক কিনা, চা না খেলে হয়তো কষ্ট হতে পারে, তাই বলচি।

আমি তাঁকে আশ্বস্ত করে বললুম, চা খেয়ে আমি সীতাকুণ্ড থেকে রওনা হয়েচি সকালে, এখন না খেলে আমার কোনো কষ্ট হবে না।

তারপর আহারের ব্যবস্থা।

আমি নগদ একটাকা প্রণামী দিয়েচি বলে আমার খাতির করতে তাঁরা বিশেষ ব্যগ্র হয়ে পড়লেন—কিন্তু দরিদ্রের সংসারে অনেক চেষ্টাতেও কিছু জোগাড় করতে পারলেন না। কিছু পরেই সে কথা বুঝলুম।

খাবার এল ভাত আর ডাল, এর সঙ্গে আর কোনো ভাজাভুজি পর্যন্ত নেই। আমি প্রথমে ভাবলুম ডাল দেবার পরে আরও কিছু দেবে। এদেশে তাই করে থাকে। ডালই এদেশে একটা পৃথক তরকারির মধ্যে গণ্য।

বরিশাল থেকে শুরু করে কক্সবাজার পর্যন্ত দেখেচি সর্বত্র এই একই নিয়ম।

প্রথমে বরিশালে যেদিন এক ভদ্রলোকের বাড়িতে খেতে বসেচি, শুধু দিয়ে গেল ভাত আর এক বাটি ডাল, তখন আমি তো অবাক। অতিথিকে শুধু ডাল দিয়ে ভাত দেওয়ায় আমি প্রথমটা একটু আশ্চর্য না হয়ে পারিনি, কিন্তু তারপর শুধু ডাল দিয়ে ভাত খাবার পরে অন্যান্য অনেক ব্যঞ্জন একে একে আসতে শুরু করলে। এখানে অবিশ্যি তা হ'ল না।

ডালের পরে অন্য কোনো ব্যঞ্জন এসে পৌঁছলো না দেখে শুধু ডাল দিয়ে ভাত মেখেই ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে হ'ল।

সন্ধ্যার দিকে আবার বাড়বাকুণ্ড থেকে চন্দ্রনাথের পথে উঠলুম।

আসবার সময় পাণ্ডাঠাকুরের মা আমার নাম-ঠিকানা লিখে নিলেন, পুনরায় আসতে বার বার অনুরোধ করলেন। দেখলুম, তিনি এমন খুশি, যেন খুব একজন বড়লোক যজমান পেয়ে গিয়েচেন, এবার থেকে যেন তাঁর সকল দুঃখ ঘুচবে। কষ্ট হ'ল ভেবে যে এই দরিদ্র পরিবার আমার কাছে যে আশা করেচেন, আমার দ্বারা তা কতটুকু পূর্ণ হবে! হায়রে মানুষের আশা।

সন্ধ্যার কিছু পরে সীতাকুণ্ড গ্রামে ফিরে এসে দেখি আমি যাঁর সঙ্গে এসেছিলুম, তিনি জরুরী চিঠি পেয়ে চাটগাঁ চলে গিয়েচেন। আমায় আরও তিনদিন এখানে থাকতে বলেচেন, তিনি আবার আসবেন তিনদিন পরে। পাণ্ডাঠাকুর আমাকে যত্ন করে ভাল বিছানা পেতে দিয়েচে বাড়ির মধ্যে একটা ঘরে।

আমি যেতেই বললে, বাবু, আপনার জন্যে চায়ের জল চড়ানো রয়েচে, বসুন বেশ আরাম করে। আমার স্ত্রীকে বলে দিয়েচি, বাবুর সামনে বেরুবে, কথা বলবে, তাতে কি! উনি তো আমাদের যজমান, বাড়ির লোক।

আমি বললুম—ঠিক, উনি তো মায়ের মতো। আমার সামনে আসবেন, এ আর বেশি কথা কি।

কিছুক্ষণ পরে পাণ্ডাঠাকুরের স্ত্রী চা নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। বয়েস তেইশ চব্বিশ, একহারা গৌরবর্ণা মেয়ে। মোটা লালপাড় শাড়ি পরনে। আমায় চাটগাঁয়ের বুলিতে যা বললেন তার মর্ম এই যে, আমি রাত্রে ভাত খাই না রুটি খাই?

আমি বললুম—যা-ইচ্ছে করুন মা, আমার খাওয়ার কিছু বাঁধাবাঁধি নেই।

আর কিছু না বলে তিনি ঘর থেকে চলে গেলেন। যেন কত সঙ্কুচিত, লজ্জিত হয়ে আছেন নিজেদের আতিথ্যের ত্রুটির জন্যে। বাড়বাকুণ্ডুতে

দেখেচি, এখানেও দেখলুম এই সব দরিদ্র পাণ্ডাঠাকুরেরা অত্যন্ত সৎ ও ভদ্র। সুদূর চট্টগ্রাম অঞ্চলের ক্ষুদ্র পল্লীতে বাস করে বলে এরা নিতান্ত অনাড়ম্বর, সরল। বাইরের জগৎ সম্বন্ধে বিশেষ কোনো খবর এরা রাখে না। একটু পরেই সেটা কি চমৎকার ভাবেই ফুটে উঠেছিল পাণ্ডাঠাকুরের কথাবার্তার মধ্যে।

রাত্রে আহারাদির ব্যবস্থা এ অঞ্চলে সব জায়গায় যেমন দেখেচি তেমনি।

প্রথমে শুধু ভাত আর এক বাটি ডাল। অন্য কিছুই নেই এর সঙ্গে।

ডাল দিয়ে মেখে কিছু ভাত খাওয়ার পরে এল বেগুন ভাজা। শুকনো ভাত দিয়ে বেগুন ভাজা খেতে হবে। তারপর গুঁড়ি কচুর তরকারি, কিন্তু তাতে এত সাংঘাতিক ঝাল দেওয়া যে আমার পক্ষে তা খাওয়া সম্ভব হ'ল না। খাওয়ার পর্ব এখানেই শেষ।

রাত্রে পাণ্ডাঠাকুর আমার কাছে বসে নানারকম কথা বলছিলেন। আমি কলকাতা থেকে যখন এসেচি, তখন তাঁদের কাছে যেন কোনো অদৃষ্ট-পূর্ব জীব। কলকাতায় যারা বাস করে, তারা সবাই খুব বিদ্বান আর খুব ধনী। বোধ হয় আমি কোনো ছদ্মবেশী ক্রোড়পতি হবো।

আমায় বললেন, আপনি কলকাতায় কোন্ জায়গায় থাকেন?

—শেয়ালদ'র কাছে।

—কোথায় কাজ করেন বাবু?

—কেশোরাম পোদ্দারের আপিসে।

—কতটাকা মাইনে পান?

—তিনশো টাকা।

কথার মধ্যে সত্য ছিল না। মাইনে পেতুম পঞ্চাশ টাকা।

—বাবু বেশ বড়লোক।

আমি বিনীত হাস্যের সঙ্গে মাথা নিচু করে রইলাম।

—বাবুর কি কলকাতায় বাড়ি?

—হুঁ।

—ক'খানা বাড়ি আছে?

—তা আছে খান পাঁচেক। ভাড়াও পাই মাসে মাসে প্রায় তিনশো টাকা।

—উঃ!

আমার মুখে পুনরায় লজ্জা ও বিনয়ের হাস্যরেখা ফুটে উঠলো।

—বাবু, আপনি যখন আমার বাড়ি এলেন, তখন আপনার চাল-চলন ধরন-ধারন দেখে আমার স্ত্রী বলেছিল, এই বাবু খুব বড়লোকের ছেলে। আমরা বাবু, দেখলেই মানুষ চিন্‌তে পারি।

সে বিষয়ে অবিশ্যি কোনো সন্দেহ রইল না।

—বাবু, আপনি বিয়ে করেচেন?

—ওঃ, কোন্ কালে। তিন চারটি ছেলেমেয়ে হয়ে গেল।

—তাহ'লে খুব অল্প বয়সে আপনার বিয়ে হয়েছিল?

—হাঁ, তখন আমার বয়স আঠারো। আমার শ্বশুর একজন বড়লোক। কলকাতায় মস্ত ব্যবসা।

—তা তো হবেই বাবু তা আপনি যখন আমার যজমান হ'লেন, যদি কখনো কলকাতায় যাই, আমার একটা থাকবার জায়গা হ'ল।

—নিশ্চয়। আমার বাড়িতে গিয়েই দয়া ক'রে উঠবেন।

পাণ্ডাঠাকুর আমার কথায় খুশি হয়ে তাঁর স্ত্রীকে ডেকে বললেন—ওগো শোনো, বাবু কি বলচেন।

আমি বিপদে পড়লুম, মেয়েদের কাছে বাজে কথা বলি কি করে? কিন্তু ভগবান আমায় সে-বার দায় থেকে মুক্ত করলেন; পাণ্ডাঠাকুরের স্ত্রী

এসেই আমাকে বললে, আপনি যদি কাল কুমারী পূজো কল্লেন তবে আমায় বলবেন, আমি জোগাড় করে রেখে দিয়েচি তুজনকে।

আমি বললুম, কাল আমি বারিয়াডাল যাবো, ওদিকের পাহাড় আর জঙ্গলগুলো দেখে আসি, কাল আমার দরকার হবে না।

এদের আমার বড ভালো লেগেছিল। অত্যন্ত সরল এরা, যা বলেচি, সব এরা বিশ্বাস করে নিয়ে খুশি হয়ে উঠেচে।

প্রতিদিন বেলা পডলে আমি চন্দ্রনাথ পাহাডের তলায় একটি ঝরনার ধারে বেডাতে যেতুম। সন্ধ্যাবেলায় স্থানটি একটি অপরূপ শ্রী ধারণ করতো। গাছপালাব শ্যামলতা বনকুসুমের শোভা, সম্মুখের শৈলশ্রেণীর গম্ভীর উন্নত সৌন্দয, বনেব পাখীর ডাক, ঝরনাব কুলুকুলু শব্দ—আর সকলের ওপবে স্থানটির নিবিড নির্জনতা আমাকে প্রতিদিন সন্ধ্যায় টেনে নিয়ে যেতো সেখানটিতে।

চুপ করে বসে থাকবার মতো জায়গা বটে।

তু'ঘণ্টা বসে থেকেও আমার যেন তৃপ্তি হত না। সন্ধ্যার ঘণ্টাখানেক পর পর্যন্ত ঝরনাটার ওপরে একটা ছোট কাঠের পুল আছে সেখানে বসে থাকতুম।

কোনো স্থানের প্রাকৃতিক সৌন্দয উপভোগ করবার একটি বিশেষ টেকনিক আছে। আমার জীবনে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার দ্বারা আমি সে টেক্‌নিক্ অর্জন করেচি, যাতে হয়তো অপরের উপকার নাও হতে পারে। আমাব মনে হয় প্রত্যেক প্রকৃতি রসিক ব্যক্তি অভিজ্ঞতার দ্বারা নিজের টেক্‌নিক্ নিজেই আবিষ্কার করেন।

প্রকৃতিব রাজ্যে মানুষের যেতে হয় একাকী, তবেই প্রকৃতি-রাণী অবগুণ্ঠন উন্মোচন করেন দর্শকের সামনে, নতুবা নয়। চুপ করে বসে থাকতে হয়, একমনে ভাবতে হয়, মাঝে মাঝে চারিদিকে চেয়ে দেখলে মনে আপনিই কত ভাবনা এসে পড়ে।

সে সব চিন্তার সঙ্গে কখনোই পরিচয় ঘটে না লোকালয়ের ভিড়ে।

এমন কি, সঙ্গে কোনো দ্বিতীয় ব্যক্তি থাকলেও প্রকৃতির সৌন্দর্যকে পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করা যায় না।

সন্ধ্যার পরে অস্পষ্ট মেটে জ্যোৎস্না উঠে সে বনপর্বতের শোভা শতগুণ বাড়িয়ে তুলতো, কি একটা বনফুলের সুবাস ছড়াতো বাতাসে, মনে হ'ত সমগ্র পৃথিবীতে আমি ছাড়া যেন আর দ্বিতীয় মানুষ নেই, সমস্ত পৃথিবী আমার, গোটা তারাভরা আকাশটা আমার। অলস স্বপ্নাতুর মনের অবকাশভরা এক-একটি দিন, এক-একটি জ্যোৎস্নালোকিত সন্ধ্যা, যেন সহস্র সহস্র বর্ষজীবী কোনো দেবতার জীবনে এক-একটি পল বিপল।

অন্য সময়ে সেখানে কখনো যাইনি, যেতুম শুধু সন্ধ্যাবেলা—যখন সে পথে লোক চলাফেরা করতো না, মানুষজনের কণ্ঠস্বর কোনোদিকে শোনা যেতো না।

একদিন সেখানে বসে আছি, এমন সময়ে পথের দিকে কাদের কথাবার্তা শোনা গেল। চেয়ে দেখি কয়েকজন লোক লণ্ঠন জ্বেলে এইদিকেই আসচে। তাদের হাতে বড় বড় লাঠি।

আমাকে দেখে বিস্ময়ের সুরে বললে—এখানে কি করেন বাবু এত রাত্রে?

আমি বললুম—এই বসে আছি।

তারা দস্তুরমত অবাক হয়ে গেল। বললে—এখানে একা বসে আছেন? বাড়ি কোথায় বাবুর?

—কলকাতায়—

—আমরাও তাই ভেবেচি, বিদেশী লোক।

—কেন বল তো?

—বাবু, এখানকার কোনো লোক এখানে এই সময় একা বসে থাকবে? বিদেশী লোক আপনি, কিছুই জানেন না, তাই দিব্যি বসে আছেন। চন্দ্রনাথ পাহাড়ে বড় বাঘের ভয়। বিশেষ করে এই যে ঝরনার ধারে আপনি বসে আছেন, সন্ধ্যার পরে বাঘে এখানে জল খেতে নামে। প্রতি বছর দু-তিনটি মানুষকে বাঘে নিয়ে থাকে চন্দ্রনাথে। আপনি এখন আমাদের সঙ্গে চলুন—

—কোথায় যাবেন আপনারা?

—আমরা চন্দ্রনাথের মন্দিরে আরতি করতে যাচ্চি, এই দেখুন আমরা চারজন লোকে আলো নিয়ে লাঠি নিয়ে যাচ্চি—রাত্রে ফিরবো না। সকালে পাহাড় থেকে নেমে আসবো—আপনিও চলুন, একা গাঁয়ে যাবেন না এই জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে।

আমি তাদের সঙ্গে যেতে রাজি হয়ে গেলুম। বন পাহাড়ের নৈশ সৌন্দর্য উপভোগ করবার এ সুযোগ কি ছাড়া যায়? তবে আমি ওদের বললুম, যাঁর বাড়ি উঠেচি, সন্ধ্যার পবে না ফিরলে তিনি খুব ভাববেন। তারা বললে—আপনার কোনো বিপদ ঘটলে তাঁকে আরও বেশি ভাবতে হবে, আপনি চলুন। ওদের সঙ্গে ওপরে উঠতে উঠতে একবার পিছনে ফিরে চেয়ে দেখলুম—দূরের সমুদ্র জ্যোৎস্নালোকে অতি অস্পষ্ট দেখা যায়—সমুদ্র বলে মনে হয় না, সমুদ্র হতে পারে, মাঠও হতে পারে।

সেই বিশাল বনস্পতিদের তলা দিয়ে পথ, জ্যোৎস্নার আলো সেখানে প্রবেশ করতে পারে নি, রীতিমত অন্ধকার।

আর, কি জোনাকির মেলা! অন্ধকারে বনের মধ্যে জোনাকির এমন ঘোরাফেরা, এমন ওঠানামা, এমন মেলা আর কখনো দেখেচি বলে মনে হয় না। লক্ষ লক্ষ জোনাকির সে কি বিচিত্র সমারোহ! আরণ্য প্রকৃতিকে যিনি ভালোবাসেন, তিনি এই ধরনের অন্ধকার রাত্রে গভীর বনের

মধ্যে গিয়ে যদি অরণ্যের নৈশরূপ না দেখে থাকেন, তবে তিনি একটি অদ্ভুত সৌন্দর্যময় অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত আছেন জীবনে। বড় বড় গাছের গুঁড়ি অন্ধকারে দৈত্যের মতো দাঁড়িয়ে, মাথার ওপর শাখাপ্রশাখার অন্ধকার চন্দ্রাতপ, মাঝে মাঝে এক-আধটু ফাঁক দিয়ে আকাশ চোখে পড়ে। সে আকাশকে ঠিক তারা-ভরা বলা চলে না, কারণ, জ্যোৎস্নালোকে নক্ষত্রের ভিড় অনেক পাতলা হয়ে গিয়েচে। তবুও বহু নক্ষত্র দেখা যায় ডালপালার ফাঁকে।

মাঝে মাঝে মূলী বাঁশের বন। নৈশ বাতাসে বাঁশপাতার মধ্যে সরসর শব্দ। রাত-জাগা কি পাখীর ডাক বাঁশবনের মগডালের দিকে! মাঝে মাঝে দূরের সমুদ্র দেখা যায়—এবার বেশ স্পষ্ট দেখা যায় জ্যোৎস্না-লোকিত সমুদ্রবক্ষ, তবে সন্দীপের তীররেখা চিনে নেবার উপায় নেই।

চন্দ্রনাথের মন্দিরে আমরা গিয়ে পৌঁছুলাম।

চন্দ্রনাথ পাহাড়ের সর্বোচ্চ শিখরে চন্দ্রনাথের মন্দির—এখান থেকে একটা দৃশ্য বড় অদ্ভুত দেখলুম এই রাত্রে। মন্দিরের পাদদেশ থেকে ধাপে ধাপে গাছপালাব ও বনঝোপের মাথা নেমে গিয়েচে কত নিচে, জ্যোৎস্না-মণ্ডিত বনঝোপের মাথাগুলি অনেকদূর পর্যন্ত দেখা যায়—তারপর নৈশ-কুয়াশায় বিলীন হয়ে অদৃশ্য হয়ে গিয়েচে।

মনে হয় আমি একা আছি, আমার পায়ের তলায় সারা বনময় পৃথিবীটা—জ্যোৎস্নালোকিত সমুদ্র, শৈলশ্রেণী। মন্দিরেব চারপাশের বারান্দাতে বসে রইলুম অনেক রাত পর্যন্ত।

চাঁদ অস্ত গেলে আমার পায়ের তলায় বনভূমি গভীর অন্ধকারে ভরে গেল।

সে রকম গম্ভীর দৃশ্য দেখবার সুযোগ জীবনে বেশিবার আমার ঘটেনি—দেখে বুঝেছিলাম মৃত্যুর আগে প্রত্যেক মানুষ যেন গভীর নিস্তব্ধ রাত্রে

আরণ্য-প্রকৃতির অন্ধকার রূপ কোনো উত্তুঙ্গ শৈলশিখরে বসে দেখে, নতুবা সে বুঝতে পারবে না বিশ্বপ্রকৃতির অসীম ঐশ্বর্য।

মন্দিরের পাশে একটা ছোট ঘরে আমরা শুয়ে রাত কাটাই।

রাত্রে আমার ভালো ঘুম হ'ল না—একটা বিরাট শৈলারণ্যের মধ্যে আমি শুয়ে আছি এ চিন্তাটা মন থেকে ঘুমের ঘোরেও গেল না, কতবার মনে হয়েচে জানালা দিয়ে চেয়ে বসে থাকি।

নামবার পথে একটা পাহাড়ী ঝরনায় হাতমুখ ধুয়ে নিলাম।

বড্ড শিশির পড়েচে সারারাত ধরে গাছপালায় বনঝোপে। টুপটাপ করে শিশির ঝরে পড়চে, প্রভাতের সূর্যালোক মাঝে মাঝে গাছপালার ফাঁক দিয়ে বাঁধানো সোপানশ্রেণীর ওপর আলোছায়ার জাল বুনচে।

পাণ্ডাঠাকুরের বাড়ি এসে দেখি--যা ভেবেচি তাই।

তাঁরা কাল অনেক রাত্রি পর্যন্ত আমায় খোঁজাখুঁজি করেচেন। গ্রামের আট দশজন লোক একত্র হয়ে লণ্ঠন ও লাঠি নিয়ে পাহাড়ের তলা পর্যন্ত এসে অনুসন্ধান করেচেন। আজ সকালে থানায় খবর দেবার আয়োজন করচেন। আমার আকস্মিক অন্তর্ধানে গ্রামের মধ্যে সোরগোল পড়ে গিয়েচে। তবে শেষ পর্যন্ত অনেকে নাকি ধরে নিয়েছিলেন যে আমি সন্ধ্যার ট্রেনে হঠাৎ কোনো কাজে হয়তো চাটগাঁয়ে চলে গিয়েচি।

পাণ্ডাঠাকুরের বাড়িতে অনেকে একসঙ্গে আমায় ঘিরে নানা প্রশ্ন করতে লাগলেন, আমি কোথায় ছিলুম, রাত্রি কোথায় কাটালুম—ইত্যাদি।

আমি রাত্রের ঘটনা বলতে ওরা সবাই মিলে, যারা আমায় সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিল, তাদের দোষ দিতে লাগলো। না জানিয়ে তাদের এ রকম নিয়ে যাওয়া উচিত হয়নি পাহাড়ের ওপরে।

আমি বললুম—কেন, বাঘ?

পাণ্ডাঠাকুর বললে—সেকথা কিন্তু ঠিক! বাঘের ভয় বিলক্ষণ আছে

ওখানে। আপনি যে সন্ধ্যার সময় ঐ ঝরনার ধারে গিয়ে বসে থাকচেন তা আমি কি করে জানবো? আমি ভেবেচি আপনি ইষ্টিশানে বেড়াতে যান সন্ধ্যাবেলা ট্রেন দেখবার জন্তে।

পাণ্ডাঠাকুরের স্ত্রী আমায় বললেন এর পরে—আমি আপনার জন্তে ভাত রেঁধে কতরাত পর্যন্ত বসে রইলুম। শেষে রাতে ঘুমুতে পারিনি আপনার কি হ'ল ভেবে।

এতগুলি নিরীহ লোক আশঙ্কা ও উদ্বেগের মধ্যে রাত কাটিয়েচে আমার জন্তে এবং আমিই এজন্তে মূলত দায়ী, এতে আমি যথেষ্ট লজ্জিত হলুম।

সেদিন দুপুরের ট্রেনে আমি পরের স্টেশনে নেমে বারিয়াডাল রওনা হই।

শুধু বারিয়াডাল নয়, পায়ে হেঁটে এই সময় আমি চন্দ্রনাথ পাহাড়-শ্রেণীর অনেক অংশ দেখে বেড়িয়েছিলুম। বারিয়াডাল একটা গিরিবর্ত্ম, পাহাড়শ্রেণীর যেখানটাতে নিচু খাঁজ, সেখান দিয়ে একটা রাস্তা পাহাড় টপকে ওপারে নেমে গিয়েচে।

বারিয়াডাল অঞ্চলে কয়েকটি বড়বড় ঝরনা ও সহস্রধারা নামে জল-প্রপাত আছে।

আমি সহস্রধারা দেখবার সুযোগ পাইনি—কিন্তু শৈলশ্রেণীর অনেক অংশে প্রায় তিনদিন ধরে ঘুরেছিলুম।

একটা কথা আমার মনে হয়েচে এই শৈলমালা ও অরণ্যের সম্বন্ধে। বাংলাদেশের মধ্যে এমন পাহাড় ও বনের শোভা আর কোথাও নেই। এই বনের প্রকৃতি যেরূপ, আসাম ছাড়া ভারতের কুত্রাপি এ ধরনের বন দেখা যাবে না।

বারিয়াডাল পার হয়ে পাহাড়ের পূর্ব সানুতে এসে বনের শোভা

আরও চমৎকার লাগলো। এত বড় বড় ঝোপ, আর বড় বড় লতা চন্দ্রনাথ তীর্থ যেদিকে, সেখানে নেই। এদিকে খুব বড় বড় গাছ যেমন দেখচি, আমার মনে হয় আরাকান-ইয়োমার জঙ্গলেও অত বড় বড় গাছ নেই। গাছের গুঁড়িগুলো সোজা উঠেচে অনেকদূর, যেন কলের চিমনির মতো। একটা গাছের কথা আমার মনে আছে। শিমুল গাছের গুঁড়ির মতো তিন দিকে তিনটি বড় বড খাঁজ, এক একটা খাঁজের মধ্যে এতটা জায়গা যে সেখানে এক একটি ছোটোখাটো পরিবারের রান্নাঘর হতে পারে। এই জাতীয় গাছ চন্দ্রনাথ পর্বত ছাড়া অন্য কোথাও দেখিনি—বা এখানে যত অপরিচিত শ্রেণীর গাছ দেখচি, এমনটিও বাংলাদেশের আর কোথাও দেখেচি বলে মনে হয় না।

এবার একটি beauty spot-এর কথা বলি।

স্থানটি আমার আবিষ্কার, এর বিবরণ কারো মুখে আমি শুনিনি বা কেউ কোথাও লেখেনি! বারিয়াডাল ছাড়িয়ে সাত মাইল উত্তরপূর্ব দিকে পাহাড়ের তলায় তলায় গেলে আওরঙ্গজেবপুর বলে একটা গ্রাম পড়ে। গ্রামটিতে মুসলমানের বাস, হিন্দু আদৌ নেই। আমি যে জায়গাটির কথা বলচি, আওরঙ্গজেবপুর থেকে সেটা আড়াই মাইল কি তিন মাইল দূরে দু-টি পাহাড়ের মধ্যে।

আওরঙ্গজেবপুরের মুসলমান গৃহস্থদের অতিথিবৎসলতা আমাকে মুগ্ধ করেছিল। আজকালকার উগ্র সাম্প্রদায়িকতার যুগে চোদ্দ পনেরো বৎসর পূর্বেকার সে কথা ভেবে আমার কষ্ট হয়।

এই গ্রামটির পথের ওপর একটা গাছতলায় দুপুরে বসে বিশ্রাম করছিলাম। সারা সকাল লেগে গিয়েছিল বারিয়াডাল থেকে এতদূর আসতে। বনজঙ্গল অঞ্চল, কোথাও খাবারের দোকান নেই, কিছু পাওয়াও যায় না, সকাল থেকে কিছু খাইনি।

কাছেই গ্রাম দেখে সেখানে ঢুকলাম, মুড়ি বা চিঁড়ের সন্ধানে। প্রথমেই একটি লুঙ্গিপরা প্রৌঢ় মুসলমান গৃহস্থের সঙ্গে দেখা। তার ভাষা উৎকট দেহাতী চাটগেঁয়ে। আমার কথার উত্তরে প্রথমেই সে কপালে হাত ঠেকিয়ে আমায় সেলাম করলে, তারপরে বললে—বাবু কোথা থেকে আসচেন ?

তার ভদ্রতা আমায় যেন লজ্জা দিলে। সে আমায় শিষ্ট নমস্কার জ্ঞাপন করলে, আমি তো করলুম না! গ্রাম্য লোক শিষ্টাচারে আমাকে হারিয়ে দিলে।

আমার পরিচয় শুনে সে আমায় তার বাড়ি নিয়ে গেল। তাদের প্রকাণ্ড মুলী-বাঁশের ছাউনি বড় আটচালা ঘর, দাওয়াতে নিয়ে গিয়ে পাটি পেতে বসালে। গ্রামের আরও চার পাঁচজন মাতব্বর লোক এসে আমায় ঘিরে নানা প্রশ্ন করতে লাগল। আর কি সব সরল প্রশ্ন!

—বাবু, ইদিকে কেন আসচেন, জঙ্গল কিনবেন না কি ?

—না, বেড়াতে এসেচি তোমাদের দেশে।

—তা বাবু, আপনাদের কলকাতা তো খুব বড় শহর, এখানে কি দেখবারই বা আছে আপনাদের উপযুক্ত!

—কলকাতা দেখা আছে নাকি ?

দুজন নীল লুঙ্গি পরা লোক পেছন দিকে বসে ছিল, তাদের দেখিয়ে একজন বললে—এরা বাবু সব জায়গায় গিয়েচে, বম্বে, বিলেত, জাপান—

আমি তো অবাক। বললুম—এরা কি করে গেল ?

তখন পেছনের লোক-দুটি বললে—বাবু, আমরা জাহাজে কাজ করি। আমাদের এই গাঁয়ের বারোআনা লোক জাহাজ আর স্টীমারের খালাসী। আমরা এখন ছুটিতে আছি, তিন মাস বাড়ি থাকবো, তারপর আবার কলকাতায় গিয়ে জাহাজে উঠবো।

ওদের সঙ্গে বসে অনেক কথা হ'ল। সত্যিই দেখলুম অনেক দেশ বেড়িয়েচে ওরা। রেঙ্গুন, সিঙ্গাপুর, কলম্বো, জাপান—এমন কি লণ্ডনের কথা পর্যন্ত ওদের মুখে শোনা গেল।

খানিকটা গল্প-গুজবের পরে ওরা বললে—বাবুর এবেলায় খাওয়া-দাওয়া ?

—অমনি কিছু মুড়ি বা চিঁড়ে কিনে—

—সে কি কথা, তা হবে না, ভাত না খেয়ে যেতে পারবেন না। হাঁড়ি, কাঠ, চাল, ডাল সব দেবো, আমাদের গ্রামে এখন আপনি তুদিন থাকুন না। একখানা ঘর দিচ্চি আপনাকে—

আমার কোনো আপত্তি ওরা শুনলে না। রান্নার জোগাড ওরা করে দিলে। আবার এমন ভদ্রতা, আমি বললুম রান্না করবার আমার দরকার নেই, ওদের রান্না খেতে আমার আপত্তি নেই—তা ওরা শুনলে না। আমি হিন্দু ব্রাহ্মণ—কেন তারা আমার সামাজিক প্রথা ও আচারে একদিনের জন্যে হস্তক্ষেপ করবে ? ওরা রেঁধে দেবে না। আমাকেই রান্না করতে হবে।

আওরঙ্গজেবপুর হতে বের হয়ে আমি যদৃচ্ছাক্রমে পাহাড়ের ধারে বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ সেই অপূর্ব স্থানটিতে এসে পড়লুম।

একদিকে পাহাড়, একদিকে বন, পাহাড় থেকে বন নেমে এসেচে যেন সবুজ জলস্রোতের মতো, একটা অবিচ্ছিন্ন সবুজের প্রবাহের মতো উচ্ছ্বসিত প্রাচুর্যের উল্লাসে নৃত্যশীল সাগরোর্মির মতো।

তারই মধ্যে অনেকগুলি পত্রবিহীন অদ্ভুত ধরনের গাছ—তাদের ডালপালা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কেমন যেন আলুথালু ছন্নছাড়া অবস্থায়, নটরাজ শিবের নৃত্যভঙ্গির মতো।

এক রকম লতা উঠেচে গাছপালার সর্বাঙ্গ বেয়ে, তাদের মগডাল পর্যন্ত

সাদা সাদা ফুলে লতাগুলো ভর্তি—গাছের মাথা সেই সাদা ফুলে ছাওয়া। একদিকে একটা ক্ষীণস্রোতা পাহাড়ী ঝরনা সেই অপূর্ব বনভূমির মধ্যে দিয়ে বয়ে চলেচে, ছোটবড় শিলাখণ্ড বিছানো অগভীর পথে। তার দুধারে জলের ধারে ধারে ফুটে আছে রাঙা বন-করবী।

আমি কতক্ষণ সেখানে একটা পাথরের ওপর বসে রইলুম। একদৃষ্টে কতক্ষণ চেয়ে দেখেও যেন দেখবার পিপাসা মেটে না। গাছপালা, পুষ্পিত লতা, বনভূমি, দীর্ঘ শৈলমালা ও ক্ষুদ্র পাহাড়ী নদী—সব নিয়ে একটা অতি চমৎকার ছবি, এই ছবির কি একটা অস্ফুট রহস্যময় ভাষা আছে, খানিকটা বা বোঝা যায়, খানিকটা যায় না।

বিকেলে বেশ ছায়া পড়ে এসেচে স্থানটিতে—কতরকমের পাখী ডাকচে, বনলতার ফুলের সুগন্ধ ভুর ভুর করচে বাতাসে। এখানে হঠাৎ যদি কোনো বনদেবীকে আবির্ভূতা দেখতুম, তবে যেন তার মধ্যে বিস্ময়ের কিছু ছিল না, এখানে তো তাঁরা নামতেই পারেন, লোকালয়ের বাইরে এই বিহগকূজিত নির্জন বন-প্রান্তেই তো তাঁদের আসন।

সন্ধ্যার পূর্বে সেখান থেকে আবার আরঙ্গজেবপুরে চলে এলুম।

এরা থাকে যে গ্রামে, বাইরের খবর সেখানে যথেষ্ট পৌঁছোয় অন্য অনেক গ্রামের চেয়ে, কারণ এ গ্রামের অধিকাংশ লোক কাজ করে বাইরে। জাহাজে স্টীমারে চড়ে তারা অনেক দূরের সমুদ্রে পাড়ি জমিয়েচে বহুবার।

শৈলপাদমূলের এই ক্ষুদ্র গ্রামখানিতে বসে তাদের মুখে জাপানের, লণ্ডনের, সিংহলের অনেক গল্প শুনলুম। ওরা সে রাত্রে আমার জন্যে একটা খাসি ছাগল মারলে। যার বাড়ি ছিলুম, সে তার অনেক প্রতিবেশী ও বন্ধু-বান্ধবকে নিমন্ত্রণ করলে ওর বাড়িতে।

আমাকে আলাদা রান্না করতে হ'ল—কিছুতেই ওরা ওদের রান্না

আমায় খেতে দিতে রাজি হ'ল না। এদের মধ্যে জনৈক বৃদ্ধ খালাসী ছিল, তার নাম আবছুল লতিফ ভুঁইয়া। আবদুলের বয়স নাকি একানব্বুই বছর, অথচ তার চুলদাড়ি এখনও সব পাকেনি। দেখলে পঞ্চান্ন কি ষাট বলে মনে হয় তার বয়স। সে আগে সমুদ্রগামী বড় বড় জাহাজে মাল্লার কাজ করেচে। এখন তার নাতি সমুদ্রে বার হয়, সে বাড়ি বসে চাষবাস দেখে।

আমি তাকে বললুম—আবছুল, তুমি বিলেত গিয়েচ?

—ও! বিলেত তো ঘরবাড়ি ছিল।

—কোথায় থাকতে?

—সেলবস্ হোম আছে আমাদের জন্য। সেখানেই থাকতুম।

—কেমন জায়গা?

—উঃ, পরীর দেশ বাবু, মেয়েমানুষ তো নয়, যেন সব পরী।

—মিশতে ওদের সঙ্গে?

—বাবু, ওসব দেশের তাবা আপনি গায়ে এসে পড়ে। তাদের এড়িয়ে আসা যায় না। তারপর সে তার ডজনখানেক প্রণয়কাহিনী আমার কাছে বলে যেতে লাগলো। লোকটির অভিজ্ঞতা সত্যিই অদ্ভুত, তার সঙ্গে একটি মেমের নাকি বিয়ে হয়। দুবছর তাকে নিয়ে ও ইংলণ্ডের কোনো একটা গ্রামে ছিল, গ্রামের নাম উইটেনহ্যাম। নামটা আবদুল বেশ স্পষ্ট উচ্চারণ করেছিল, যদিও ইংরিজি কিছুই জানে না সে। আমি বললুম, তুমি তোমার স্ত্রীর সঙ্গে কি-ভাষায় কথা বলতে?

—ভাঙা ভাঙা ইংরেজীতে বলতুম, আর হাত নেড়ে পা নেড়ে তাকে বুঝিয়ে দিতুম।

—কি করে চালাতে সে গাঁয়ে? চাকরি করতে?

—না বাবু, জিনিসপত্র ফিরি করে বেড়াতুম, মাঝে মাঝে আপেল

বাগানে চাকরিও করেচি। উইটেনহ্যামে অনেক আপেল বাগান ছিল। বেশ জায়গা বাবু—

—তোমার স্ত্রী বেশ ভালো ছিলেন নিশ্চয়ই—

—ভালো মানুষ ছিল আর খুব ছেলেপুলে ভালোবাসতো। আমায় যত্ন করতো খুবই। আমায় বলতো, তোমার দেশে আমায় নিয়ে যাও, কি রকম দেশ দেখবো—

—এনেছিলে নাকি ?

—আনতাম হয়তো, কিন্তু বাবু সে দুবছর পরে মরে গেল। আমার কিছু ভালো লাগলো না, সেখান থেকে বেরিয়ে একেবারে সোজা দেশে চলে এলুম। সে বাঁচলে উইটেনহ্যামেই বরাবর থাকতুম হয়তো। আপেলের বাগান করবার বড্ড শখ ছিল—

—আচ্ছা এসব কতদিন আগের কথা হবে ?

—পঞ্চাশ পঞ্চান্ন বছর আগেকার কথা বাবু, কি তারও আগের কথা। উইটেনহ্যামে একবার ধুমধাম হ'ল, গির্জায় গান-বাজনা হ'ল, শুনলাম নাকি মহারাণীর কত বছর বয়স হ'ল, সেই জন্যে ওরকম হচ্চে। মহারাণী তখন বেঁচে—কি ধুমধাম হ'ল পাড়াগাঁয়ে!

আবদুল লোকটা ভিক্টোরিয়ান যুগের লোক, মহারাণীর ডায়মণ্ড জুবিলী দেখে এসেচে বিলেতে বসে। কিন্তু ওকে দেখে কে ভাববে সে কথা! আবদুল এখন পাহাড়ের ধারের ধানের ক্ষেতে ছোট্ট কুঁড়ের মধ্যে বসে পাহারা দেয় আর শীতলপাটি বোনে। বয়স হ'ল এত, তবু সে বসে থাকে না।

আওরঙ্গজেবপুর গ্রামে সবই মুসলমান। আমার বড় ভালো লেগেছিল ওদের, আমাকেও বড় পছন্দ করতো ওরা। যেদিন আসি, অনেকে গ্রাম ছেড়ে অনেকদূর পর্যন্ত এসে আমায় এগিয়ে দিয়ে গেল।

পথ বেয়ে চলেচি। এবার দেখলুম পাহাড়ের নিচে মাঝে মাঝে অনেক গ্রাম পড়ে এ দিকটাতে। পাহাড়ই এসব গাঁয়ের একটা বড় সম্পদ। পাহাড় জোগায় জ্বালানি কাঠ, ঝরাপাতা; ঝরনা জোগায় জল, তা ছাড়া পাথর কুড়িয়ে এনে এরা ঘরবাড়ির দেওয়াল করেচে, রোয়াক করেচে।

লম্বা টানা চন্দ্রনাথ পাহাড়শ্রেণীর দৃশ্য এখান থেকে দেখা যায় বড় সুন্দর। বনের শোভাও অদ্ভুত। মনে হয়, এ একটা আলাদা জগৎ। যারা এ বনের কোলে গ্রামে বাস করে, এর বিচিত্র বৃক্ষলতার সমাবেশ, বনফুলের শোভা, পাখীর ডাক, ঝরনার কলতানের মধ্যে যাদের শৈশব কেটেচে, তারা একটা বড় সৌন্দর্যময় অভিজ্ঞতাকে লাভ করেচে জীবনে।

তবে মাঝে মাঝে বাঘ আসে এ অভিযোগ সকল গ্রামেই শুনেচি। শীতকালের দিকে বেশি বার হয়, গোরু ছাগল ভেড়া তো নেয়ই, মানুষ পেলেও ছাড়ে না।

গ্রামের লোকদের বিশ্বাস, সন্ধ্যার পরে পাহাড়ে ওঠা-নামা বা জঙ্গলে ঢোকা উচিত নয়। ভূত আছে, অপদেবতা, আছে, আরও কত কি আছে। সন্ধ্যার পরে এরা প্রাণান্তেও পাহাড়ে যাবে না।

এখানকার এক গ্রামে এক ব্রাহ্মণবাড়ি মেয়ের বিয়ের নিমন্ত্রণ খেয়েছিলাম। স্থানটি ফেণী সবডিভিসনের অন্তর্গত ধূম স্টেশন থেকে পনেরো ষোল মাইলের মধ্যে। এদের দেশে ভোজের পূর্বে ফল ও মিষ্টান্ন খেতে দেয়, তারপর আনে লুচি, তারপরে ভাত আর তরকারি। মেয়ের বিয়েয় ভাত খাওয়ায়, এ অন্য কোথাও দেখিনি।

ধূম স্টেশনে এসে ট্রেনে চড়ে চলে এলুম আখাউড়া।

এক সময়ে এ অঞ্চল বঙ্গোপসাগরের কুক্ষিগত ছিল তা বেশ স্পষ্ট

যায়—বিশাল সমতলভূমি ক্রমশ নিচু হতে হতে সমুদ্রের জল ছুঁয়েচে। ধানের সময় মনে হয় সবুজের সমুদ্র গোটা দেশটা।

আগাউড়া থেকে আগরতলা মাইল পাঁচ-ছয় দূরে। স্বাধীন ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলা অনেকদিন ধরে দেখবার বড় শখ ছিল। আমি যে সময়ের কথা বলচি, তখন মোটর বাস হয়নি, আখাউড়া থেকে ঘোড়ার গাড়িতে আগরতলা গিয়ে পৌছুলাম বেলা প্রায় দশটার সময়।

কোথায় গিয়ে উঠবো কিছু ঠিক ছিল না, গাড়িতে একজন বলেছিল বিদেশী ভদ্রলোক গেলে মহারাজার অতিথিশালায় উঠতে পারে। আমার দেখবার ইচ্ছে হ'ল, সে ব্যাপারটি কি রকম একবার দেখতে হবে। শুনলুম মহারাজের দপ্তরের কোনো একজন কর্মচারীর সই-করা চিঠি ভিন্ন রাজার অতিথিশালায় থাকতে পারা যায় না। আমি রাজদপ্তরের কাউকে চিনতুম না, তবুও সাহস করে গেলাম এবং কেশোরাম পোদ্দারের প্রদত্ত পরিচয়পত্র দেখিয়ে সেখান থেকে একখানা টিকিট জোগাড় করে রাজার অতিথিশালায় এসে উঠলুম।

অতিথিশালায় অনেকগুলো ঘর, মুলী বাঁশে ছাওয়া বেশ বড় বাংলো, দুদিকে বড় বারান্দা, পেছনদিকে রান্নাঘর ও বাবুর্চিখানা। দুরকম থাকার কারণ অতিথিরা ইচ্ছামত ভারতীয় খাদ্য ও সাহেবী-খানা দুরকমই খেতে পাবেন। প্রত্যেক ঘরে কলকাতার মেসের মতো তিন চারটি খাট পাতা, তাতে শুধু গদি পাতা আছে, অতিথিরা নিজেদের বিছানা পেতে নেবেন। খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা চমৎকার। সকালে চা, বিস্কুট, টোস্ট, দেয়, দুপুরে ভাত, তিন-চারটি ব্যঞ্জন, মাছ, মাংস ও পোয়াটাক দুধ, রাত্রে অতিথির ইচ্ছামত ভাত বা রুটি। শীতকালে ব্যবহারের জন্যে গরম জল দেওয়ার বন্দোবস্ত আছে।

যে ক'জন চাকরবাকর আছে, তারা সর্বদা তটস্থ, মুখের কথা খার

করতে দেরি সয় না, তখুনি সে কাজ করবে। তিনদিন এখানে থাকবার ব্যবস্থা আছে স্টেটের খরচে—তারপর থাকতে হ'লে অনুমতি-পত্রের মেয়াদ বাড়িয়ে আনতে হয় রাজদপ্তর থেকে।

প্রকৃতপক্ষে অনেকে সাতদিন আটদিন কি তার বেশিও থাকে, চাকর-বাকরদের কিছু দিলে তারাই ওসব করে নিয়ে এসে দেবে।

আমি গিয়ে দেখি অত বড় বাংলোতে একজন মাত্র সঙ্গী—আর কোনো অতিথি তখন নেই। জিগ্যেস করে জানলুম তিনি প্রায় মাসখানেকের বেশি আছেন রাজ-অতিথিরূপে। ইনি অদ্ভুত ধরনের মানুষ, একাধারে ভবঘুরে দার্শনিক, কবি ও মাইনিং এঞ্জিনিয়ার।

অনেক দিন হয়ে গেলেও এই ভদ্রলোকের কথা আমার অতি স্পষ্ট মনে আছে। আমার বইগুলির দু-একটি চরিত্রের মূলেও ইনি প্রচ্ছন্নভাবে বর্তমান। পরে এঁর কথা আরও বলচি।

আগরতলা ছোট্ট শহর, রাজপথে বেজায় ধূলো, ঘরবাড়িগুলোও দেখতে ভালো নয়—এ শহরেব কথা বলবাব মতো নয়। আমার ভালো লেগেছিল মহারাজার নতুন প্রাসাদ, ছোট্ট একটা চিড়িয়াখানার কয়েকটি বন্যজন্তু, 'কুঞ্জবন' প্রাসাদ ও বড় একটা ফুলের বাগান। আর ভালো লেগেছিল সুলেখক ও সুপণ্ডিত কর্নেল মহিমচন্দ্র দেব বর্মনকে। ইনি মহারাজের জ্ঞাতি ও খুল্লতাত, রাজদপ্তরে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন সে সময়ে বৌদ্ধদর্শন ও ইতিহাসে তাঁর যথেষ্ট পড়াশুনো। অত্যন্ত অমায়িক ভদ্রলোক, যখন আমি তাঁর বাড়ি দেখা করতে গিয়েছিলুম তাঁর সঙ্গে, তখন আমি তরুণ-বয়স্ক, তার বয়স ছিল পঞ্চান্ন বৎসরের কাছাকাছি—কিন্তু আমার সঙ্গে সমবয়সী বন্ধুর মতো মিশেছিলেন, কত আগ্রহ করে তাঁর বৌদ্ধগ্রন্থের লাইব্রেরি দেখিয়েছিলেন, সে কথা আমার আজও মনে আছে।

মহারাজার নতুন প্রাসাদের বড় ফটকে বন্দুকধারী গুর্খা বা কুকি

পাহারওয়ালা দাঁড়িয়ে। অনুমতি ভিন্ন কাউকে প্রাসাদ দেখতে দেওয়ার নিয়ম নেই।

একদিন আমি নিঃসঙ্কোচে ছড়ি ঘুরিয়ে সহজভাবে ফটকের মধ্যে ঢুকে গেলুম, যেন আমি নতুন লোক নই, মহারাজের প্রাসাদে যাতায়াত করা আমার নিত্যকর্ম। কুকি পাহারওয়ালা চেয়ে চেয়ে দেখলে কিন্তু কিছু বলতে সাহস করলে না, কেন যে সে কিছু বললে না, তা আমি আজও জানিনে।

একাই প্রাসাদের মধ্যে ঢুকে পড়লুম—বিভিন্ন ঘর দেখে বেড়ালুম, কেউ কিছুই বললে না। একটা বড় হলঘরে অনেকগুলো বড় বড় বিলিতি ছবি। হলঘরটিতে সুন্দর সুন্দর কোচ কেদারা পাতা, সুদীর্ঘ ভিনিসিয়ান আয়না দেওয়ালে, সিল্কের কাজ করা পরদা, ভেলভেটে মোড়া গদি, চমৎকার কার্পেট পাতা মেজের ওপর।

একটি ছোট্ট সুন্দরী খুকি ঘরটিতে বসে প্রাইভেট টিউটারের কাছে লেখাপড়া করচে। খুকিটি এত চমৎকার দেখতে! আমি প্রাইভেট্ টিউটারের সঙ্গে আলাপ করলুম। তাঁর বাড়ি কুমিল্লা জেলায়, নামটা আমার মনে নেই, আমার সঙ্গে অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই তাঁর খুব ভাব হয়ে গেল।

তিনি বললেন—আপনাকে দরবার ঘর দেখাই চলুন। ওখানে সকলকে যেতে দেওয়া হয় না—ঘর বন্ধ থাকে, দাঁড়ান চাবিটা আনিয়ে নিই।

দরবার ঘরে ঢুকে তার ঐশ্বর্য ও জাঁকজমক দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। এককোণে উঁচু বেদীর ওপর হাতীর দাঁতের সিংহাসন, সোনালী ব্রোকেডের কাজকরা লাল মখমলের গদি মোড়া। পাছে ধুলো-বালি জমে নষ্ট হয় বলে সিংহাসনটি তুলো দিয়ে ঢাকা। দুটি প্রকাণ্ড হাতীর দাঁত সিংহাসনের দুদিকে, দেওয়ালের গায়ে দাঁড় করানো। মাস্টার মশায় বললেন, হাতীর

হাত-জোড়া স্বাধীন ত্রিপুরা রাজ্যের পার্বত্য অঞ্চল থেকে কোনো কুকি সামন্ত-সর্দার রাজদরবারে নজর দিয়েছিল।

—কুকি সামন্তেরা কোথায় থাকে?

—পার্বত্য অঞ্চলে ওদের জায়গীর, মহারাজ ওদের ফিউডাল চিফ্, দরবারের সময়ে কুকি সামন্ত সর্দাররা তাদের জাতীয় পোশাক পরে যখন আসে, সে একটা দেখবার জিনিস! ওদের সঙ্গে তীর ধনুক নিয়ে কত অনুচর আসে। সে সময় থাকেন তো দেখতে পাবেন।

—কতজন সামন্ত আছে?

—ঠিক বলতে পারবো না, তবে পনেরো কুড়ি জনের কম নয়। ওদের অঞ্চল ওরা নিজেদের ধরনে শাসন করে, ওদের নিজেদের আইন ও রীতি-নীতি সেখানে চলে।

বিকেলে আমি 'কুঞ্জবন' প্যালেসের দিকে বেড়াতে গেলুম।

পথে এক জায়গায় একটা ছোট চিড়িয়াখানা আছে মহারাজের। তার মধ্যে Circo Cat জাতীয় একটি বন্যজন্তু আমার বড় ভালো লেগেছিল।

সেটা দেখতে কতকটা বিড়ালের মত—কিন্তু বিড়ালের চেয়ে অনেক বড়। যতবার গায়ে লাঠি দিয়ে খোঁচা দেওয়া যায়, ততবার সেটা দাঁত মুখ খিঁচিয়ে 'ফ্যাঁচ' করে তেড়ে আসে, খাঁচার লোহার ডাণ্ডার গায়ে মারে এক থাবা। এ যেন তার বাঁধা নিয়ম—যতবার খোঁচা দেওয়া যাবে, ততবার সেটা ঠিক ওই একই রকম ভাবে ফ্যাঁচ্ করে তেড়ে আসবেই।

তার ওই ব্যাপারটা দেখা শেষকালে আমার এমন ভালো লেগে গেল যে অতিথিশালা থেকে প্রায় আধ মাইল হেঁটে দু'বেলা আমাকে চিড়িয়াখানা যেতে হ'ত, যে ক'দিন আগরতলা ছিলাম।

'কুঞ্জবন' প্যালেস একটা অনুচ্চ পাহাড়ের ওপর অবস্থিত। পুরানো আমলের তৈরী বলেই দেখতে ঢের ভালো লাগলো, মার্টিন কোম্পানির

তৈরী মহারাজের নতুন প্রাসাদের চেয়ে। কুঞ্জবন প্যালেসের একটা ঘরে অনেক প্রাচীন চিত্র, হাতীর দাঁতের শিল্প, ত্রিপুরা রাজবংশের পূর্বপুরুষদের বড বড় ছবি ইত্যাদি আছে—এসব খুঁটিনাটি করে দেখতে অনেক সময় গেল।

একটি হাতীর দাঁতের ক্ষুদ্র নারীমূর্তি আমার কি ভালোই লেগেছিল! চার পাঁচ ইঞ্চির বেশি বড নয়, পুরানো হাতীর দাঁত, হলদে হযে গিয়েচে—কি কমনীযতা আব জীবন্ত লাবণ্য মূর্তিটির সারা গায়ে। বার বার চেয়ে দেখত ইচ্ছে হয়। শুনলুম এক সময়ে এখানে হাতীর দাঁতেব জিনিস-পত্রের ভালো শিল্পী ছিল। এই ক্ষুদ্র মূর্তিটি কোন্ অজ্ঞাত কারিগরের শিল্পপ্রতিভার অবদান জানিনে, মন কিন্তু তার পায়ে আপনিই শ্রদ্ধা নিবেদন করতে ব্যগ্র হয়ে পড়ে।

প্রাসাদের ছাদ থেকে সূর্যাস্ত দেখে মনে হ'ল এমন একটা সূর্যাস্ত কতকাল দেখিনি!

গোটা আকাশটা লাল হয়ে এল, যেন পশ্চিম দিগন্তে লেগেচে আগুন, তারই ছোঁয়াচে রক্তশিখা সারা আকাশের হালকা সাদা মেঘে আগুন ধবিয়েচে, প্রকাণ্ড আগুনেব গ্লোবেব মতো সূর্যটা কুঞ্জবন প্রাসাদের পিছনকার ঢেউ খেলানো অনুচ্চ শৈলমালা ও সবুজ অরণ্যভূমিব মধ্যে ডুবে যাচ্ছে।

যতদূর চোখ যায়, শুধু উঁচুনিচু পাহাড আর উপত্যকা, উপত্যকা আর পাহাড; ঘনবনানীমণ্ডিত রাঙা সরু পথটি বনেব মধ্যে এঁকেবেঁকে পাহাড়ের ওপর একবার উঠে একবার নেমে, কতদূর চলে গিয়ে ওদিকের দিগন্তে মিশে অদৃশ্য হয়েচে।

একদিন আমি একা এই পথে অনেকদূর গিয়েচি, সেও বিকেল বেলা। কুঞ্জবন প্যালেসের চূড়া আর দেখা যায় না, চারিপাশে শুধু বন আর পাহাড়।

একজন টিপ্রাই লোক তীর-ধনুক হাতে সে পথে আসচে। আমি তাকে জিগ্যেস্ করলুম—এদিকে কি দেখবার আছে? গ্রাম্য টিপ্রাই জাতির কথা বোঝা ভীষণ শক্ত। সে কি বললে প্রথমটা ভালো বুঝতেই পারলুম না, তারপর মনে হ'ল সে বলচে, ও দিকে আর যাবেন না সন্ধ্যার সময়।

—কেন?

—বুনো হাতীব ভয়, এই সব বনে এই সময় আসে।

—তুমি কোথায় থাকো?

— ওদিকে আমাদের গ্রাম আছে এই পাহাড়ের ওপারে—

—তীর ধনুক হাতে কেন?

—তীর ধনুক না নিয়ে আমরা বেরুই না, জঙ্গলের পথে নানা উৎপাত।

—আমাকে তোমাদের গ্রামে নিয়ে চল, দেখবো।

—এখন আর সময় নেই, সেখান থেকে ফিরতে রাত হয়ে যাবে—

—তুমি আমায় পৌছে দিও শহরে, বখশিস দেবো—

লোকটা রাজি হ'ল না। তার অনেক কাজ আছে, সে যেতে পারবে না।

অতিথিশালায় ফিরে দেখি আমার সঙ্গী টেবিলে আলো জ্বেলে কি লেখা-পড়া করচেন। এই ভদ্রলোকটিকে আমার কেমন যেন রহস্যময় বলে মনে হ'ত—কি কাজ করে, কি ভাবে, কি ওর জীবন, এসব জানতে আমার খুব আগ্রহ ছিল মনে মনে। কিন্তু কোনো কথা সে সব নিয়ে জিগ্যেস করা ভদ্রতাসঙ্গত হবে না বলে তার নিজের সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন ইতিপূর্বে করিনি।

আজ হঠাৎ কি জানি কেন বললুম—কি লিখচেন?

ভদ্রলোক আমার দিকে চেয়ে হেসে বললেন—একটা রিপোর্ট লিখচি—

—কিসের রিপোর্ট ?

—আমি পাহাড়ে পাহাড়ে বেড়িয়ে দেখলুম ত্রিপুরার পাহাড় অঞ্চলের খনিজ সম্পদ যথেষ্ট আছে। কিন্তু এ নিয়ে কেউ কখনো মাথা ঘামায়নি। মহারাজের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট করবার চেষ্টা করচি। এমন কি, আমার মনে হয় পেট্রোলিয়ামের সন্ধানও এখানে পাওয়া কঠিন হবে না। সেই সব সম্বন্ধে একটা রিপোর্ট লিখচি। বসুন, আপনাকে বুঝিয়ে দিচ্চি এখানে পেট্রোলিয়ামের খনি থাকা অসম্ভব নয় কেন।

তারপর ভদ্রলোক আমাকে স্বাধীন ত্রিপুরার পার্বত্য অঞ্চলের ভূ-তত্ত্ব বিস্তৃতভাবে বোঝাতে শুরু করলেন। অনেক কিছু বললেন, আমি কিছু বুঝলাম। বেশির ভাগই বুঝলাম না। কেমন করে পৃথিবীর স্তর দুমড়ে বেঁকে উৎসের সৃষ্টি করে, পেট্রোলিয়াম আর কয়লা একই পর্যায়ভুক্ত জিনিস, আরও সব কত কি।

ভদ্রলোকের কথাবার্তা আমার বড ভালো লাগলো।

আমি তাঁর বিষয়ে কখনও কোনো প্রশ্ন করিনি, কেবল পূর্বের প্রশ্নটি ছাড়া। তাঁকে দেখে আমার মনে হ'ল লোকটি বৈষয়িক নয়, অর্থোপার্জন এঁর ধাতে নেই, পয়লা নম্বরের ভবঘুরে মানুষ। সে রাত্রে তাঁর কথাবার্তা শুনে আমার সে ধারণা আরও দৃঢ় হ'ল।

আমায় তিনি বডলোক হবার অনেক রকম ফন্দি বাৎলে দিলেন। সামান্য মাইনের চাকুরি করে কোনো লাভ নেই। এই সব অঞ্চলের পাহাড়ে কয়লা আছে, পেট্রোলিয়াম আছে, সোনা আছে, জঙ্গলের কাঠ কেটে চালান দিতে পারলে দুবৎসরের মধ্যে ফেঁপে ওঠা যায়। তিনি মহারাজকে ভজিয়ে সত্বর একটা মাইনিং সিন্‌ডিকেট গড়ে তুলবেন, এই

আগরতলাতেই তার হেড্ আপিস হবে, কোনো বড় বিলিতি কোম্পানির সঙ্গে তিনি চিঠি চালাচালি করবেন এ নিয়ে—ইত্যাদি অনেক কথা।

আমি বললুম—আপনি আর কতদিন আছেন এখানে?

—তা কি বলা যায়? কাজ শেষ না হ'লে তো যাচ্চিনে। একমাসের কম নয়, দুমাসও হতে পারে।

—কলকাতায় বুঝি থাকেন আপনি?

—সেখানে ছিলাম কিছুদিন। ঢাকাতেও ছিলাম—আরও অনেক জায়গায় ছিলাম। এখানকার কাজ সেরে রেঙ্গুন যাবার ইচ্ছে আছে। আপার বর্মা অঞ্চলে একবার ঘুরে প্রস্পেকটিং করবো। যেতাম এতদিন, শুধু আমার এই শরীরের জন্যে—

—আপনার কি অসুখ?

—হজম হয় না যা খাই। তবুও তো আগরতলা এসে অনেক ভালো আছি। দেখেচেন তো কত লেবু খাই, সারা দিনে পনেরো কুড়িটা কাগজি লেবু না খেলে আমার শরীর ভালো থাকে না!

—আপনার দেশ বুঝি কলকাতায়?

এ প্রশ্নটি করার উদ্দেশ্য ছিল তাঁর বাড়ি ও আত্মীয়স্বজনের সম্বন্ধে কিছু জানা যায় কিনা। কিন্তু তিনি আমার অযথা কৌতূহলকে তেমন প্রশ্রয় দিলেন না বলেই মনে হ'ল। অন্য কথা পাড়লেন, আবার সেই ভূতত্ত্ব-সংক্রান্ত তথ্য। ধীরভাবে কিছুক্ষণ তাঁর বক্তৃতা শুনবার পরে গেস্ট্ হাউসের ভৃত্য নৈশ আহারের জন্যে ডাক দিয়ে আমায় সে-যাত্রা উদ্ধার করলে।

খেতে গেলে চাকর আমায় বললে, বাবু, আপনি সাহেবের খবর কি জিগ্যেস করছিলেন? উনি এখানে অনেকদিন আছেন, আমরা ওঁর টিকিট বদলে আনি আপিস থেকে। তিনদিন থাকবার পরে টিকিট না

বদলালে এখানে থাকতে দেবার নিয়ম নেই। একটা কথা বলচি বাবু, উনি এতদিন আছেন, কখনও কোনো চিঠি আসেনি ওঁর নামে! কেউ নেই বাবু, বাড়িঘরও নেই, থাকলে আর চিঠি দেয় না!

আমি ধমক দিয়ে চাকরকে চুপ করালুম। তার অত কথার দরকার কি? একদিন দেখি ভদ্রলোক গ্যেটের ফাউস্ট-এর ইংরিজি অনুবাদ পড়ছেন। আমায় ডেকে দু-এক জায়গা শোনালেন, গ্যেটে সম্বন্ধে অনেক কথা বললেন। বায়রন যখন যুবক, গ্যেটে তখন বৃদ্ধ, বায়রনের মতো সুশ্রী তরুণ কবিও প্রেমিক গ্যেটের মনে কি রেখাপাত করেছিলেন প্রধানত সেই সম্বন্ধে অনেক কথা বললেন। এই বইখানা তাঁর অত্যন্ত প্রিয়, বহুবার পড়েচেন, সর্বদা সঙ্গে রাখেন।

আমি তাঁর টেবিলে 'ফাউস্ট'-খানা পড়ে থাকতে দেখলুম বিকেলেও, তখন তিনি বেরিয়ে গিয়েচেন। বই দেখে মনে হয় ভদ্রলোকের অবস্থা ভালো নয়। বইয়ের পাতাগুলো ময়লা, বাঁধুনি আলগা, এত প্রিয় বই অথচ এমন অযত্নে রেখেচেন কেন? হাতে পয়সা থাকলে কি আর বই বাঁধাতেন না?

বড় দরের কবিকে ভালোবাসে, এমন লোক দুজন দেখলুম আমার ভ্রমণের মধ্যে, বরিশালের সেই শেক্‌সপিয়ারের ভক্ত ভদ্রলোক, আর ইনি। কিন্তু দুজনের মধ্যে একটা বড় তফাৎ রয়েচে, বরিশালের সে ভদ্রলোকের অবস্থা যথেষ্ট সচ্ছল, এমন কি তাঁকে ছোটখাটো জমিদার বলা চলে, কিন্তু ইনি একেবারে নিঃসম্বল। অথচ কি অদ্ভুত কাব্যপ্রিয়তা। যত রাত্রেই ফিরতেন, তাঁকে দেখতাম 'ফাউস্ট'-এর কয়েকখানা পাতা না পড়ে কিছুতেই ঘুমোতেন না।

আমি যেদিন 'কুঞ্জবন' প্যালেস দেখতে গেলুম দ্বিতীয় বার, সেদিন সকালবেলা ধোপা তাগাদা করতে এসে ভদ্রলোককে অনেক কড়া কথা

শুনিয়ে গেল দেখে আমার বড় কষ্ট হ'ল। হিন্দুস্থানী ধোপা, সে গেস্ট হাঁউসের অনেক বাবু সাহেবের কাপড় কেচেছে, এমন তাগাদা কাউকে কখনও করতে হয়নি, আজ সাত আট দিন হাঁটাহাঁটি করচে, আর সে কতদিন হাঁটবে? আমার ইচ্ছে হ'ল ভদ্রলোককে বলি, যদি তাঁব কাছে না থাকে, আমার কাছ থেকে কিছু না হয় নিতে, কিন্তু তাতে যদি তিনি কিছু মনে করেন?

আগরতলায় আমার থাকবার দিন ফুরিয়ে এল। কর্নেল মহিমচন্দ্র দেব বর্মন মহাশয়ের দুটি তরুণ আত্মীয় যুবকের সঙ্গে আমার খুব আলাপ হয়ে গিয়েছিল, এদের যুবক না বলে বালক বলাই সঙ্গত, কারো বয়স সতেরোর বেশি না।

ওরা রোজ গেস্ট হাউসে আসতো, গল্পগুজব করে চলে যাবার সময় আমায় টেনে নিয়ে যেতো তাদের সঙ্গে। একদিন ওরা বললে, চলুন পিকনিক করা যাক শহরের বাইরে কোথাও—

আমি বললুম, পাহাড়ের দিকে যাওয়া যাক—

আমার গেস্ট হাউসের সঙ্গীটি তখন ছিলেন না, রাত্রে তাঁর কাছে প্রস্তাব করতেই তিনি তখনি রাজি হয়ে গেলেন। বললেন, আমায় কি দিতে হবে?

আমরা হিসেব করে দেখেছিলুম জন-পিছু এক টাকা করে দিলেই চমৎকার পিকনিক হয়ে যায়। সস্তার দেশ, তা ছাড়া সাদাসিদে সাধারণ জিনিস ছাড়া পাওয়াই যখন যায় না। ওঁকে সেকথা বললুম, উনি তখন বললেন, তাহ'লে টাকাটা আমার কাছ থেকে নিয়ে নেবেন সকালবেলা।

আমার ইচ্ছে ছিল না টাকার কথা তোলবার, উনিই তুললেন, কাজেই আমায় বলতে হ'ল। রাত্রে শুয়ে কেবলই মনে হতে লাগলো উনি এখন

একটা টাকা পাবেন কোথায় ? বলে ভালো করিনি। কিন্তু টাকা নিতে না চাইলে ভদ্রলোকের আত্মসম্মানে আঘাত দেওয়া হয় এদিকে, সুতরাং টাকা দিতে চাইলে নেবো নিশ্চয়।

ভোরে উঠে দেখি আমার সঙ্গী কোথায় বেরিয়েচেন আর আসেন না। আটটার সময় আমাদের রওনা হবার কথা, ছেলে দুটি আমায় ডাকতে এসে বসে রইল, দশটা বাজে, তখনও দেখা নেই তাঁর। প্রায় সাড়ে দশটার সময় তিনি এলেন, আমাদের দেখে যেন কেমন হয়ে গেলেন। আমরা বললুম, আপনার জন্যেই বসে আছি। চলুন, বেলা হয়ে গেল।

ভদ্রলোক আমতা আমতা করে বললেন—হাঁ এই একটু কাজে বেরিয়ে ছিলাম। তা এইবার—খানিক পরে আমায় আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন, আমার তো যাওয়া হবে না বিভূতিবাবু, আমার একটু কাজ আছে আজ—

আমি বললুম, তা কখনো হয় ? আপনাকে যেতেই হবে। আপনার জন্যে আমরা বসে আছি দেখুন কতক্ষণ থেকে।

তিনি কিছুতেই যেতে চাইলেন না। তাঁর মুখ দেখে যেন বিষণ্ণ ও নিরুৎসাহ বলে মনে হ'ল। আমার তখন কিছু মনে হয়নি কিন্তু তারপরে আমার এ ধারণা হয়েছিল যে ওঁর যাবার ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও চাঁদার একটি টাকা জোগাড় করে উঠতে না পেরে যাওয়া বন্ধ করেছিলেন। হয়তো বা সকালে টাকার চেষ্টাতেই বেরিয়ে থাকবেন।

আমি বিশেষ নিরুৎসাহ হয়ে পড়লাম ভদ্রলোক না যাওয়াতে। কিন্তু কি করি, কোনো উপায় ছিল না। কুঞ্জবন প্যালেস ছাড়িয়ে আরও প্রায় দুমাইল পিছনে একটা ভাঙা বাড়ি আছে কাদের। সেখানে চারিদিকে ঘন বন, পাহাড়ী ঝরনা, মুলী বাঁশের ঝাড়, বাঁশবনের আড়ালে টিপ্রাইদের ক্ষুদ্র গ্রাম—চমৎকার নিরিবিলি জায়গা। একটা টিলার মাথায় সেই ভাঙা

বাড়িটা। নিচে বাঁশবনের ছায়ায় ঝরনার ধারে আমরা রান্নাবান্না করলাম, গান গাইলাম, কবিতা আবৃত্তি করলাম, কাঠ কুড়িয়ে আনলাম রান্নার জন্যে, জল তুললাম। গ্রাম থেকে টিপ্রাইদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা দূরে দাঁড়িয়ে গম্ভীর মুখে আমাদের কাণ্ড দেখতে লাগলো।

বেলা যখন প্রায় তিনটে বাজে, তখন হঠাৎ 'বিভূতিবাবু! বিভূতিবাবু!' বলে কে যেন ডাকচে—দূর থেকে শুনতে পেলুম। আমরা সবাই উৎকর্ণ হয়ে রইলাম। বাঁশবনের ওপারের পথে টিলার পাশে দূর থেকে কে যেন ডাকচে ঠিকই। আমরা প্রত্যুত্তরে খুব জোরে হাঁক দিলাম, এই যে এখানে! আমাদেব একজন রাস্তার দিকে ছুটে গেল।

অল্পক্ষণ পরেই দেখি আমার গেস্ট হাউসের বন্ধুটি লম্বা লম্বা পা ফেলে বাঁশবন ভেঙে হাসিমুখে আমাদের দিকেই আসচেন।

—এলুম আপনাদের কাছে, না এসে কি পারি? কাজটা শেষ হয়ে গেল তাই বলি যাই; তারপর, কতদূর হ'ল?

অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁকে পেয়ে আমরা তো অত্যন্ত খুশি। আমার সত্যিই মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল ভদ্রলোক না আসাতে। তিনি বললেন —এসব জায়গা আমার পরিচিত, পায়ে হেঁটে কতবার এসেচি। আপনারা যখন বললেন কুঞ্জবন প্যালেসের উত্তরের পাহাড়ে যাবেন, তখনই ভেবেচি এই জায়গা। একটু চা খাওয়ান তো আগে, উঃ হাঁপিয়ে গিয়েচি—

আমবা তাঁকে পেয়ে যেমন খুশি, তিনিও আমাদের পেয়ে তেমনই খুশি।

একটু পরে আমরা সবাই মিলে গান আরম্ভ করলুম—তার মধ্যে দুজন রান্না করতে লাগলো। আমার সঙ্গীটি তাঁর বয়স ভুলে আমাদের সঙ্গে গানে আমোদে এমন করে যোগ দিলেন যে সেদিন বুঝলুম তাঁর মনের তারুণ্য, যা জীবনের আর্থিক অসাফল্যে বিন্দুমাত্র ম্লান হয়নি।

সেইদিন রাত্রে ফিরে এসে তিনি তাঁর জীবন সম্বন্ধে কিছু কিছু আমায় বললেন। শুনে আমার পূর্বের অনুমান আরও দৃঢ় হ'ল, লোকটি পয়লা নম্বরের ভবঘুরেও বটে, স্বপ্নালুও বটে।

তখন আমার অটোগ্রাফ নেবার বাতিক ছিল—বললুম তাঁকে আমার অটোগ্রাফের খাতায় কিছু লিখে দিতে, আজও আমার কাছে তাঁর লেখা আছে—নামটি প্রকাশ করবার অনুমতি তাঁর কাছ থেকে আমি নিই নি, কাজেই নাম এখানে দিলাম না। তবে আমার মনে হয় যে প্রকাশ করলেও কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি ছিল না—আজকাল কেউ তাঁর নাম জানে না।

আগরপাড়া থেকে এলুম ব্রাহ্মণবেড়িয়া।

এখানে যে বৃদ্ধ ভদ্রলোকের বাড়িতে উঠি, তিনি ওখানকার একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন, কয়েক বৎসর পূর্বে সংবাদপত্রে তাঁর মৃত্যুসংবাদ জেনেছিলাম।

আমি তাঁর ওখানে গিয়ে পৌঁছুই বিকেল বেলা। সন্ধ্যার কিছু আগে তিনি বললেন—আপনি ব্রাহ্মণ, আমার বাড়িতে রাঁধুনী ঠাকুর নেই, আপনাকে নিজে কিন্তু রাঁধতে হবে। আমাদের রান্না তো আপনাকে খেতে দিতে পারিনে—

আমার কোনো আপত্তি ছিল না অবিশ্যি—কিন্তু তাঁদের দিক থেকে ছিল।

সেটা বুঝেই আমি রাঁধতে রাজি হয়ে গেলুম।

সন্ধ্যার সময় চাকর এসে আমায় বাড়ির মধ্যে রান্নাঘরে ডেকে নিয়ে গেল। আয়োজন দেখে তো আমার চক্ষুস্থির! তিন চার রকমের মাছ, কপি, বেগুন, শাক, আলু আরও কত কি পৃথক পৃথক থালায় কোটা। হলুদ বাটা, জিরে বাটা, ছোট ছোট পাত্রে সাজানো।

একবার জীবনে নিজে রান্না করে খাওয়ার প্রয়োজন উপস্থিত হয়েছিল

—শুধু ভাতে ভাত রাঁধবার অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলাম সেই ক'দিন। এত আয়োজনের মহাসমুদ্রে তাতে পাড়ি জমানো যায় না। আমি বিষণ্ণ-মুখে এটা ওটা নাড়াচাড়া করচি পাশের ঘর থেকে একটি অল্পবয়সী বিধবা মহিলা এসে আমার রান্নাঘরের দরজার পাশে দাঁড়ালেন।

বোধ হয় আমার হাতা-খুন্তি ধরবার ভঙ্গি দেখেই তিনি এক চমকে আমার রন্ধন-বিদ্যার দৌড় বুঝে নিলেন।

চাকরকে ডেকে আমায় কি বলতে বললেন—চাকর বললে, দিদিমণি বলচেন আপনি রাঁধতে জানেন তো? আমি দেখলাম, যদি বলি রাঁধতে জানিনে এদের মুশকিলে ফেলা হয়। আমার জন্যে এরা কি ভাবে কি খাওয়া-দাওয়ার অযোজন করবে এই রাত্রিকালে। সেভাবে এদের এখন বিব্রত করা অত্যন্ত অসঙ্গত হবে।

সুতরাং তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বললুম—রান্না? কেন জানবো না? —কত রেঁধেচি—

ভাবলুম আর দেরি করা উচিত নয়। যা হয় একটা হাঁড়িতে চড়িয়ে দিই।

কি একটা হাঁড়িতে চড়িয়েচি মহিলাটি আবার এসে দাঁড়ালেন দরজার কাছে। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে আমার রান্নার বহর দেখে তিনি বুঝলেন এভাবে রন্ধনকার্য চললে আমার অদৃষ্টে আজ খাওয়া নেই। অতিথির প্রতি কর্তব্য স্মরণ করেই বোধহয় তিনি আমার সঙ্গে কথা কইলেন। বললেন—আমি দেখিয়ে দিচ্চি আপনি রাঁধুন তো—হাঁড়িটা নামিয়ে ফেলুন। তারপর তিনি সারাক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বলে দিতে লাগলেন। দুতিন ঘণ্টা লেগে গেল সব জিনিস রাঁধতে।

যখন খেতে বসেচি তিনি একটু দূরে বসে আমায় যত্ন করে খাওয়ালেন। হেসে বললেন—আপনি যে বললেন রাঁধতে জানেন?

—একটু একটু জানি, সামান্য। মানে খুব ভালোরকম নয়।

—কিছুই জানেন না আপনি রান্নার।

আমি চুপ করে রইলাম। বিদ্যে যেখানে ধরা পড়ে গিয়েচে সেখানে কথা বলা সঙ্গত নয়। দুদিন আমি তাঁদের বাড়ি ছিলাম। ভদ্রমহিলা চারবেলা কেবল আমার রান্নার জায়গায় দাঁড়িয়ে যে আমার রান্না দেখিয়ে দিতেন তাই নয়, তিনি শুধু হাঁড়িটা ছুঁতেন না, বাকি কাজ সব নিজের হাতেই করতেন, তরকারিতে মশলা মাখানো, তরকারি হাঁড়িতে ছেড়ে দেওয়া—সব।

তিনি গৃহস্বামীর বিধবা কন্যা, যেমন শান্ত তেমনি স্নেহময়ী ও কর্তব্য-পরায়ণা। আমি তাঁকে দিদি বলে ডেকেছিলুম। তিনিও আমার ওপর ছোট ভাইয়ের মত ব্যবহার করেছিলেন যে-দুদিন তাঁদের ওখানে ছিলাম।

আমার ভ্রমণপথে আর একটি মহিলার সাক্ষাৎ পেয়েছিলুম সেকথা যথাস্থানে বলবো।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে নোয়াখালি রওনা হই দুপুরের ট্রেনে।

এখানে এসে স্থানীয় জনৈক উকিলবাবুর বাড়িতে উঠি। এক একটা জায়গা আছে যা মনের মধ্যে অবসাদ ও অস্বস্তির সৃষ্টি করে, নোয়াখালি সেই ধরনের শহর।

হয়তো এখানে একটি দিন মাত্র থেকেই চলে যেতাম কিন্তু যে ভদ্রলোকের বাড়ি গিয়ে উঠেছিলাম তিনি আমায় যেতে দিলেন না। তাঁর আতিথেয়তার কথা আমার চিরদিন স্মরণে থাকবে। ভদ্রলোক নোয়াখালি 'বারে'র একজন বড় উকিল, তাঁর বাড়ি যেন একটি হোটেল-খানা। বাইরের দিকে এক সারি টিনের ঘরে কয়েকটি দরিদ্র স্কুলের ছাত্র থাকে, ভদ্রলোক তাদের শুধু যে খেতে দেন তা নয়, ওদের সমুদয় খরচ

নির্বাহ করেন। এ ছাড়া আহূত এবং অনাহূত কত লোক যে তাঁর বাড়ি দুবেলা পাতা পাতে তার কোনো হিসেব নেই। এই ভদ্রলোকের নাম আমি এখানে উল্লেখ করলুম না, তার কোনো প্রয়োজনও নেই। আশা করি তিনি আজও বেঁচে আছেন এবং ভগবানের কৃপায় দীনদরিদ্রের উপকার সমান ভাবেই করে যাচ্চেন।

আমার চেয়ে তাঁর বয়স অনেক বেশি, কিন্তু আমার সঙ্গে তিনি মিশতেন ঠিক যেন সমবয়সী বন্ধুর মতো। সকালে উঠে আমার ঘরে এসে বসে কত গল্প করতেন। খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা ভালো ছিল না তাঁর বাড়ি, অত লোককে খেতে দিতে গেলে রাজভোগ দেওয়া চলে না গৃহস্থের বাড়ি। কিন্তু ভদ্রলোকও আমাদের সঙ্গে বসে সেই মোটা চালের ভাত, ডাল আর হয়তো একটা চচ্চড়ি কি ভাজা দিয়ে খেয়ে উঠতেন। তিনি গৃহস্বামী, এত টাকা উপার্জন করেন, নিজের পৃথক ভোগের আয়োজন ছিল না তাঁর।

দেশ বেড়িয়ে যদি মানুষ না দেখলুম, তবে কি দেখতে বেরিয়েচি ?

চিরযৌবনা নিসর্গসুন্দরী সব কালে সবদেশেই মন ভুলায়, মন ভুলায় তার শ্যামল চেলাঞ্চল, বনময় ফুলসজ্জা, মধুমল্লীর সৌরভভরা তার অঙ্গের সুবাস।

তাকে সব স্থানে পাওয়া যায় না সে রূপে, কিন্তু মানুষ সব জায়গাতেই আছে। প্রত্যেকের মধ্যেই এক একটা অদ্ভুত জগৎ, দেখতে জানলেই সে জগৎটা ধরা দেয়। তাই দেখতেই পথে বার হওয়া। মানুষের বিভিন্ন রূপ দেখবার আমার চিরকাল আগ্রহ, নতুন মানুষ দেখলেই মনে হয় ওর সঙ্গে বসে একটু আলাপ করে ওকে চিনি। দেখতে চেয়েছিলুম বলেই বোধহয় কত রকমের মানুষকেই যে দেখালেন জীবনে!

মানুষকে জেনে চিনে লাভই হয়েচে, ক্ষতি হয়নি, একথা আমি মুক্ত-

কণ্ঠে বলবো। হয়তো কোনো কোনো ক্ষেত্রে আপাতত ক্ষতি বলে মনে হ'লেও, ভবিষ্যতে মনের খাতায় তাদের অঙ্ক পড়ে গিয়েচে লাভের দিকেই। মানুষের অন্তর একটি রহস্যময় বিরাট বিশ্ব, এর সীমা নেই, শেষ নেই। মানুষের অন্তর্লোক আবিষ্কারের অভিযান, উত্তর-দক্ষিণমেরু অভিযানের মতই কষ্ট- ও অধ্যবসায়সাপেক্ষ, সেই রকমই বৈচিত্র্যময়।

ভদ্রলোক আমাকে বললেন, আপনি এখানে থাকুন আরও কিছুদিন।

আমি বললুম, আমার থাকবার যো নেই, নইলে নিশ্চয়ই থাকতুম।

—এখন আপনাকে ছাড়তে ইচ্ছে হয় না, আবার কবে আসবেন বলুন।

—তার কোনো ঠিক নেই, তবে এদিকে এলেই আপনার এখানে আসবো।

ভদ্রলোকের বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি হ'লেও চেহারা এখনও যুবকের মতো। অমন উদার মুখশ্রী আমি খুব বেশি লোকের দেখিনি। আর সব সময়েই আনন্দ হাসিখুশি নিয়েই আছেন।

আমায় বললেন, দেখুন, আমার ইচ্ছে করে লোকজন নিয়ে খুব আমোদ করি। সকলেই আমার এখানে খাওয়াদাওয়া করুক, সবাইকে নিয়ে থাকি। একবার কি হ'ল জানেন, ক'দিন ধরে একটি পয়সা আর নেই, আমার জমানো টাকা বলে কিছু বড় নেই তো—যা আয়, তাইই ব্যয়। একদিন আমার স্ত্রী বললেন, শুধু ডাল আর ভাত ছাড়া আর কিছুর ব্যবস্থা নেই। শুধু ডাল দিয়ে ভাত মেখেই সবাই নিয়ে আমোদ করে খাওয়া গেল। আমি একা বসে খেতে পারিনে।

সত্যিই তাই দেখেচি এঁর বাড়ি। দিনমানে সকলের একসঙ্গে খাওয়া বড় একটা হয়ে ওঠে না, কারো কাছারি, কারো স্কুল। কিন্তু রাত্রে ভিতর-বাড়ির রান্নাঘরের দাওয়ায় আঠারো উনিশ-খানা পিঁড়ি পড়বে। উকিল বাবুর পিঁড়ি মাঝখানে, তাঁর আশেপাশে তাঁর আশ্রিত দরিদ্র ছাত্রগণ,

তাঁর ছেলেমেয়েরা, অতিথি অভ্যাগতের দল। সবাই যা খাবে তাঁকেও তাই দেওয়া হবে।

খাওয়ার সময় সে একটা মজলিসের ব্যাপার।

উকিলবাবু গল্প করতে ভালোবাসেন, গল্প করতে পারেনও। ছাত্রদের উপদেশ দেন, তাঁর প্রথম জীবনের ছোটখাটো ঘটনা বলেন, হাসির গল্প করেন। আমি এই মজলিসে বিশেষ কোনো আনন্দ পাইনি তার কারণ আমি নবাগত, ওদের কাউকে চিনিনে, অল্পদিনের পরিচয়। এ সব ক্ষেত্রে যেমন হয়, উকিলবাবু যখন কথা বলচেন, সেখানে আর কেউ বলতো না কিছু, তিনিই একমাত্র বক্তা। যেমন, আমাকে কখনো তিনি কিছু বলবার অবকাশ দেননি। আমার ইচ্ছে করলেও বলতে পারতাম না। আমার মনে হ'ত ভদ্রলোক খুব ভালো কিন্তু বড় সংকীর্ণ জগতে নিজেকে আবদ্ধ রেখেচেন।

ওঁব জগৎ এই নিজের বাড়িটি নিয়ে, এই আশ্রিতজনদের নিয়ে, এদের মধ্যে রাজত্ব করেই তাঁর প্রতিষ্ঠা। এদের বাইরে অন্য কোনো জগৎ ইনি দেখেচেন কি? কখনও দেখবার তৃষায় ব্যাকুল হয়েচেন কি? না দেখলেও কোনো ক্ষতি নেই, যদি অতৃপ্ত আকাজ্ক্ষার আকুলতা মনের মধ্যে সদাজাগ্রৎ থাকে।

বাসনা ও ব্যাকুলতা মনের যৌবন। ও দুটো চলে গিয়েচে যে মন থেকে সে মনে জরা বাসা বেঁধেচে। নিজে তো সুখ পায় না, অপরকেও দিতে পারে না। সব বাসনার অবসান যে মনে, আকুলতা তীব্রতা যে মন থেকে—তৃপ্তির দ্বারা ভোগের দ্বারাই হোক, বা ক্ষীয়মাণ কল্পনার জন্যেই হোক—চলে গিয়েচে, সে মন স্থবির।

যেখানে গিয়েচি, সেখানেই দেখেচি উর্ণনাভ যেমন নিজের জালের মধ্যে জড়িয়ে বসে থাকে, গুটিপোকা যেমন গুটির মধ্যে নিজেকে বন্দী

রাখে, প্রত্যেকে এক এক নিজস্ব ক্ষুদ্র জগতে নিজেদের বন্দী রেখে হৃষ্টমনে জীবনের পথে চলেচে, এজন্যে তারা অসুখী নয়, অতৃপ্ত নয়।

কত জগৎ দেখে বেড়ালে তবে সংকীর্ণতাব জ্ঞান মানসপটে প্রতিভাত হয়। এই জ্ঞানটাই বড়, এই জ্ঞান অর্জন করা সময়সাপেক্ষ তাও জানি; মনুষ্যত্বকে পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত করবাব পথে প্রধান সহায় প্রসারতাকে চেনা, তাহ'লেই সংকীর্ণতাকেও চেনা যায়।

নোয়াখালি থেকে আমি গেলুম মেঘনার তীরবর্তী একটি ক্ষুদ্র গ্রামে।

সেখানে কোনো কাজের জন্যে যাইনি, বিস্তৃত মেঘনা নদীর তীরে বসে একটা দিন অলসভাবে কাটাতে গিয়েছিলুম। বিদায় নিয়েই এসেচি নোয়াখালি থেকে, এখানে দুদিন কাটিয়ে অন্য দিকে চলে যাবো।

আমার কাজ ছিল মেঘনার ধারে একটি ক্ষুদ্র ঝোপের ছায়ায চুপ করে সারাদিন বসে থাকা। বড গাছ সেখানটাতে নেই, নদীব ধারে বর্ষার ভাঙনে সব গিয়েচে, আছে এখানে ওখানে দুএকটা ছোটখাটো ঝোপ।

ভারি আনন্দে কাটিয়েছিলাম এখানে এই দুটি দিন।

এত বড নদী আমাদের দেশে নেই, মেঘনার বিবাট বিস্তৃতিকে সমুদ্র বলে মনে হ'ত, যেন কক্সবাজারের সমুদ্রতীরে বসে আছি, আমার সামনে যেন চিরজীবন অবসব, কত স্বপ্নজাল বোনবার অবকাশ, দীর্ঘ, দীর্ঘ অবকাশ। সব চেয়ে ভালো লাগতো বিকেলে।

ধীরে ধীরে ছায়া পডে আসতো বড বড ধানের মঠের উপর, মেঘনার বিস্তৃত জলরাশির উপর। জলচর পাখীব বিবাট দল আকাশ অন্ধকার করে যেন কোন সুদূর কালের চরের দিকে উড়ে যেতো—সন্ধ্যারাগরক্ত আকাশের আভা পডত জলে, দূরের বৃক্ষশ্রেণীব মাথায়; তারপরে আকাশে

নবেন্দুলেখা ফুটে উঠতো আমার মাথার ঠিক উপরে। খুব বড় পাল উড়িয়ে মহাজনী বহর চলে যেতো নদী বেয়ে সন্দ্বীপে কি চাটগাঁয়ে!

যাদের বাড়ি উঠেছিলাম, তারা এখানকার বেশ বড ধরনের গৃহস্থ। কোনো পুরুষে কেউ কাজ করে না, বিস্তৃত ধানের জমির ফসলে বছর চলে যায়—বাড়িতে অনেক গোরু, হাঁস ও ছাগলের পাল।

আমি থাকতাম বাইরের একটা ঘরে। সেদিন বেড়িয়ে ফিরলে গৃহ-স্বামী আমার কাছে তামাক টানতে টানতে গল্প আরম্ভ করলেন। আমার কৌতূহল হ'ল ওঁদের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে জানবার।

জিগ্যেস করলাম—আপনাদের এ বাড়ি কতদিনের?

—আজ প্রায় বিশ বছরের, এদিকে ভাঙন ধরেনি অনেক দিন।

—ধানের জমিতেই আপনাদের চলে বোধ হয়?

—তা আড়াইশো বিঘে জমি আছে।

—নিজেরা লাঙলে চাষ করেন, না ভাগে?

—বর্গা দিই, অত জমি কি নিজ লাঙলে চষা যায়।

—ধান ছাড়া অন্য কোনো চাষ আছে?

—আর যা আছে তা সামান্যই। ধানই এদেশের প্রধান ফসল। গোলার ধান বেচে সংসারের কাপড়চোপড, ওষুদবিষুদ, বিয়ে-থাওয়া সব হয়।

শুধু মাত্র ধানের ফসলের ওপর এখানকার জীবনযাত্রা প্রতিষ্ঠিত। দেখেছি সকালে উঠে ছেলেমেয়েরা পান্ত ভাত খায়, বড়লোকেরা খায় চিঁড়ে, মুড়ি বা খই। মুড়ির চেয়ে এখানে চিঁড়ে বা খইয়ের চলনই বেশি। দুপুরে গরম ভাত—বিকেলে ছেলেমেয়েদের জন্যে আবার বাসি ভাত বা খই চিঁড়ে। রাত্রে সকলের জন্যে আবার গরম ভাত। ধান থেকে যা পাওয়া যায়—তা ছাড়া অন্য কোনো খাদ্য এখানে মেলে না, খেতেও এরা

অভ্যস্ত নয়। অবিশ্যি তরিতরকারি, মাছ দুধের কথা বাদ দিই। ফলের মধ্যে নারিকেল ছাড়া অন্য কিছু পাওয়া যায় না।

যেদিন সন্ধ্যাবেলা আমি এখান থেকে চলে যাই, সেদিন সকালবেলায় গৃহস্বামী বৈষয়িক কাজে কোথায় চলে গেলেন। আমি তাঁর কাছে বিদায় নিয়ে রাখলুম, তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হ'লেন যে, আমার যাবার সময় তাঁর সঙ্গে দেখা হবে না।

বাড়িতে পুরুষমানুষের মধ্যে একজন চাকর, ক্ষেত খামারের কাজ দেখে আবার ক্ষেতের তরি-তরকারি হাটে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে। আমার খাওয়ার জায়গা বাইরের ঘরের সঙ্গে একটা ছোট কুঠুরিতে হ'ত, এদিন সে-ই খাবার সময় উপস্থিত রইল। মেয়েরা আমার সামনে বেরুতেন না, ভাত দিয়ে তাঁরা চলে যেতেন, খেতে বসে কোনো জিনিসের দরকার হ'লে ন'দশ বছরের একটি ছোট মেয়ে নিয়ে আসতো।

সন্ধ্যার পূর্বে গরুর গাড়ি এল। আমি জিনিসপত্র গাড়িতে তুলে দিতে বললাম। এমন সময় সেই ছোট মেয়েটি এসে বললে—বাডির মধ্যে আসুন—ডাকচে মা—

আমি ভাবলাম আমায় ভুল করে ডাকচে ছেলেমানুষ। আমায় কেন ডাকবেন তাঁরা ?

বললুম—কাকে ডাকচেন খুকি ? আমি নয়, তোমার ভুল হয়েচে।

—না, মা বললেন আপনাকে ডেকে নিয়ে আসতে—

অগত্যা খুকির সঙ্গে আমি বাডির মধ্যে গেলাম। গিয়ে দেখি নিচুমত চালা-ওয়ালা একটা দাওয়ায় একখানা আসন পাতা, তার সামনে থালায় খাবার সাজানো।

খুকি বললে—আপনাকে মা খেতে বলচেন—আপনি গাড়িতে যাবেন, কোথাও খাওয়া হবে কি না, খেয়ে নিন।

আমি সত্যই অবাক হয়ে গিয়েচি তখন।

এখান থেকে চার মাইল দূরবর্তী স্টেশনে গিয়ে রেলে চাপবো এবং প্রায় সারারাতই ট্রেনে কাটাতে হবে—এ অবস্থায় খাওয়া হবে না তো নিশ্চয়ই, কিন্তু মেয়েরা সেকথা আন্দাজ করলেন কি ক'রে—এই ভেবে আমি আশ্চর্য না হয়ে পারলাম না।

খেতে বসে গেলুম অবিশ্যি। আমি ব্রাহ্মণ মানুষ, সূর্য ডুববার পূর্বে দু'বার ভাত খাবো না—বোধ হয় এই কথা ভেবে মেয়েরা খেতে দিয়েচেন চিঁড়ে খইয়ের লাড্ডু, নারকোলের লাড্ডু, মুড়কি, দুধ, কলা ইত্যাদি।

আমার মনে আছে ছোটবড় নানা আকারেব লাড্ডু, কতগুলো খেলার মার্বেলের মতো ছোট।

যতক্ষণ থালার সমস্ত খাবার নিঃশেষ না করলাম, ততক্ষণ মেয়েরা ছাড়লেন না—ছোট মেয়েটিকে দিযে বাববার অনুরোধ করতে লাগলেন এটা খেতে, ওটা খেতে। তাঁদের আগ্রহে ও আন্তরিকতায় আমার মনে যে ভাব জাগলো—তা হ'ল নিছক বিস্ময়ের ভাব।

কেন আমাকে খাওয়ানোর জন্যে এদের এত আগ্রহ? অতিথি বিদায় নিয়ে গেলে তো ঝামেলা মিটে যায়—সে লোকটা রাত্রে আবার পেট ভরে খেলে না খেলে তার জন্যে মাথাব্যথা করার কার কি গরজ?

জগতে নিঃস্বার্থ স্নেহ ও সেবা খুব বেশি দেখা যায না বলেই অনেক বৎসর পূর্বেব সেই সন্ধ্যায় সেই অজানা গৃহলক্ষ্মীদের স্নেহের স্মৃতি আমার মন থেকে আজও মুছে যায়নি।

শীতলক্ষ্যা নদীর ওপর পুল পার হয়ে আবার ট্রেন এসে থামলো ঘোড়াশাল স্টেশনে।

ঘোড়াশালা ঢাকা জেলায়—এখান থেকে কিছুদূরে নরসিংদি গ্রামের

হাই স্কুলে আমার এক বন্ধু হেডমাস্টার, অনেকদিন তার সঙ্গে দেখা হয়নি, বিদেশভ্রমণের সময় পরিচিত বন্ধুজনের দেখাসাক্ষাৎ বড় আনন্দদান করে, সেজন্যে ঠিক করেছিলাম ঢাকা যাবার পথে বন্ধুটির ওখানে একবার যাবো।

নরসিংদি বেশ বড় গ্রাম, তবে স্কুলের জায়গাটি কিছু দূরে, গ্রামের বাইরে মাঠের মধ্যে স্কুল। আমি যখন গিয়ে সেখানে পৌঁছুলাম—তখন বেলা প্রায় এগারোটা। একটি ছাত্রকে জিগ্যেস করতে, বললে হেড্‌মাস্টার বাবু এখন ক্লাসে আছেন।

ছেলেটিকে বললুম, আমি এখানে অপেক্ষা করচি, তুমি হেড্‌মাস্টার বাবুকে গিয়ে বল তাঁর একজন বন্ধু দেখা করতে এসেচে। কিছুক্ষণ পরে দেখি আমার বন্ধু ছেলেটির পিছু পিছু আসচেন। এ ভাবে এই দূর প্রবাসে আমাকে হঠাৎ দেখে তিনি খুব খুশি।

বললেন, তারপর, কোথা থেকে এলে হে?

আমি কি ভাবে ঘুরতে ঘুরতে এখানে এসে পড়েচি, তা সব খুলে বললাম। বন্ধু বললেন--বেশ ভালো, ভালো। এখানে যখন এসে পড়েচ, কিছুদিন থাকো। কলকাতা থেকে এসে একেবারে হাঁপিয়ে পড়েচি হে—আজ দুবছর এই 'গড-ফরসেক্‌ন্' জায়গায় যে কি কষ্টে আছি তা আর কি বলবো! একটা লোকের মুখ দেখতে পাইনে—

—সুন্দরবনে বাস করচো নাকি? এত লোকের মধ্যে থেকেও লোকের মুখ দেখতে পাওনা কি রকম?

অজ পাড়াগাঁয়ের স্কুল। পূর্ববঙ্গের একটি ক্ষুদ্র গ্রাম—স্কুলের শিক্ষক যাঁরা সকলেরই বাড়ি এখানে, হেডমাস্টার আর হেডপণ্ডিত এই দুজন মাত্র বিদেশী। আমার বন্ধুটি ছাত্রজীবনে পড়াশুনোয় ভালো ছিলেন, খুব স্মার্ট, ভালো ক্রিকেট খেলোয়াড়, চেহারাও খুব সুন্দর।

এহেন স্টাইলবাজ, সুপুরুষ, ইংরেজিতে উঁচু সেকেণ্ড ক্লাস পাওয়া ছেলে

মাত্র ষাট টাকা মাইনেতে এই সুদূর ঢাকা জেলার এক পাড়াগাঁয়ে এসে আজ তিন বছর পড়ে আছে।

চাকুরির বাজার এমনি বটে।

এই সব কথা মনে মনে ভাবছিলুম সারা পথ আসবার সময়ে।

কিন্তু এখানে এসে মনে হ'ল বন্ধুটি যে জায়গায় আছে, আর কিছু না হোক, অন্তত প্রাকৃতিক দৃশ্য হিসেবে জায়গাটা ভালো। গ্রামের বাইরে দিগন্তবিস্তীর্ণ মাঠ মেঘনার তীর ছুঁয়েচে, তারি মাঝে মাঝে ছোট ছোট বেতঝোপ, মাঝে মাঝে বুনো শঠিব গাছ। এদিকে একটা ছোট খাল।

স্কুলের বাড়িটি এই ছোট খালের ধারে, বড় বড় ঘাসের বনের আড়ালে। নিকটে লোকালয় আছে বটে কিন্তু এখানে দাঁড়িয়ে হঠাৎ মনে হয় অস্ট্রেলিয়ার বা দক্ষিণ আমেবিকার বিস্তীর্ণ প্রান্তরের মধ্যে এসে পড়েচি কোনো মায়াবলে।

স্কুল-বাড়ির পাশে বোর্ডিং। তিনচারটি বড় বড় ঘর, সেগুলির মেঝে হয়নি এখনও, সুতরাং মাটির সঙ্গে প্রায় সমতল, অত্যন্ত নিচু ভিতের ওপর বাড়িটা গাঁথা। আমার বন্ধুর কথামত একটি ছেলে আমায় সঙ্গে করে এনে বোর্ডিংএর একটা ঘরে বসিয়ে বেখে গেল।

আমার বন্ধুটি এই ঘরে থাকেন। একটা কাঠের তক্তপোষ, তার ওপর আধময়লা একটা বিছানা, আর তার ওপর খানকতক বই ছড়ানো। অন্যদিকে কতকগুলো চায়েব পেয়ালা, একটা স্টোভ্ দুটি টিনের তোরঙ্গ, একজোড়া পুরোনো জুতো ইত্যাদি। হেডমাস্টারের জন্যে বোর্ডিংএর এই ঘরটি ছেড়ে দেওয়া হয়েচে বুঝলাম।

স্কুলের ছুটি হয়ে গেল ঘণ্টা-দুই পরেই।

আমার বন্ধু হাসিমুখে এসে ঘরে ঢুকলেন। আর দুটি আধময়লা কাপড় পরা শিক্ষক তাঁর সঙ্গে বোর্ডিংএর দোর পর্যন্ত এসে সম্ভবত হেডমাস্টারকে

পৌঁছে দিয়ে গেলেন তাঁর ঘরে। আমার বন্ধু তাঁদের বললেন, আপনারা আসবেন কিন্তু এখুনি—বেশি দেরি না হয়, চা খাবার সময় হয়েচে প্রায়।

আমি ভাবলুম আমার বন্ধু বোধ হয় ওই দুটি শিক্ষককে চায়ের নিমন্ত্রণ করলে। বন্ধুকে সে কথা জিগ্যেস করতে তিনি ঠোঁট উল্টে তাচ্ছিল্যের সুরে বললেন—ওদের আবার নেমন্তন্ন করবো কি। ওরা তো দিনরাত এখানে পড়ে থেকে আমায় খোসামদ করে—আমাদের ড্রইং মাস্টার একজন, আর একজন সেকেণ্ড পণ্ডিত। ওদের বললাম এসে চা করতে আমাদের জন্যে—ওরা আমার অর্ধেক কাজ করে দেয়।

সেই পুরোনো চালবাজ বন্ধু আমার! কিছুই বদলায় নি ওর।

তারপর আমার বন্ধু বিছানায় লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে বললেন—সব বাঙাল হে, সব বাঙাল! মুখ দিয়ে ভাষা উচ্চারণই হয় না। আমাদের মতো ইংরিজি বাংলা মুখ দিয়ে বেরুবে কোথা থেকে ওদের? আমার ইংরিজি শুনে ওরা সবাই ভারি আশ্চর্য হয়ে যায়। বলে, এমন উচ্চারণ কখনো শুনিনি। তাই সবাই খুব খাতির করে।—বন্ধু গর্বভরে আমার দিকে চেয়ে রইলেন।

অনেকদিন পরে সতীর্থের সঙ্গে সাক্ষাতে বড় আনন্দ হ'ল। কলেজ-জীবনের কথা মনে পড়লো। পটুয়াটোলার একটা মেসের ঘরে বসে বন্ধুটির মুখে এমনি কত চালবাজির কথাই যে শুনেচি।

কিছুক্ষণ পরে সেই দু'টি মাস্টার এসে ঘরে ঢুকলেন। আমার বন্ধু মিথ্যা নেহাৎ বলেনি, ঘরে ঢোকবার মুহূর্ত থেকে আর যতক্ষণ তারা ছিল ততক্ষণ এমন একটা নম্র, লাজুক, নিতান্ত দাসসুলভ ব্যবহার করলে আমার বন্ধুর সামনে যে দেখে, আমার নিতান্ত কষ্ট হ'ল।

এদের কথায় খুব বেশি ঢাকাজেলার টান, কিন্তু আমার কানে বেশ লাগতো। ড্রইং মাস্টারটির বয়স একটু বেশি, তিনি ঢোকবার কিছু পরেই আমার বন্ধুর রূপগুণ ও বিদ্যার প্রশংসা সেই যে শুরু করলেন, আর

হঠাৎ সে প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে আসতেই চান না। আমায় বললেন, বাবুর বাড়ি ?

—কলকাতায়—

—আপনি আর হেড্‌মাস্টারবাবু পড়েছিলেন একসঙ্গে ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ—

—আপনিও এম-এ পাশ ?

—আমি বি, এ পাশ করেছিলুম—আর পড়া ঘটেনি।

—কি করেন এখন বাবু ?

—একটা চাকবি করি, তাতে বেড়িয়ে বেড়াতে হয়। সেজন্যেই তো আপনাদের দেশে এসে পড়েচি—

—খুব ভালো হয়েচে এ গবিবদের দেশে এসেচেন। আপনারা কলকাতার কলেজের ভালো ছেলে, আপনাদের মুখের ভাষাই অন্যরকম। বড় ভালো লাগে হেডমাস্টারবাবুর মুখের বাংলা আর ইংরিজি শুনতে। এ রকম এদেশে কখনও শোনে নি—

এই দু'টি শিক্ষক দেখলুম আমার বন্ধুর সমস্ত কাজ করে দেয়। ওরাই চা করে আমাদের খেতে দিলে, আবার তামাক সেজে দিলে, একজন গিয়ে বাজাব থেকে পান নিয়ে এল, কারণ পান ফুরিয়ে গিয়েছিল।

ওরা অনেক বাত পযন্ত বইল। সন্ধ্যার পরে ওরা আমার বন্ধুকে বললে—মাস্টারবাবু, তাহলে আপনি বসুন, বাবুর সঙ্গে কথা বলুন, আমরা দুজনে খাবারটা তৈরি করে ফেলি।

আমি বললুম, কেন, বোর্ডিংএর ঠাকুর নেই ?

—আছে, তা উনি ঠাকুরের হাতে খান না। নিজেই রাঁধেন, আমরা জোগাড়-যন্ত্র করে দিই—

—বোর্ডিংএর চাকরে সে সব কাজ করে না ?

—চাকর নেই এ বোর্ডিংএ। ছেলেরা নিজেদের কাজ নিজেরা করে।

আমি বন্ধুকে বললুম, চলো আমরাও রান্নাঘরে গিয়ে বসি।

রান্নাঘরে আমরা এসে বসলুম বটে, কিন্তু সেখানে আমাদের জন্য ময়দা মাখা, রুটি সেঁকা, তরকারি রাঁধা প্রভৃতি যাবতীয় কাজ করলে শিক্ষক দু'টি।

আমার বন্ধু বেশ চুপ করেই বসে রইলেন—ওদের কাজে এতটুকু সাহায্য করলেন না। এমনভাবে ওদের সেবা নিলেন, যেন এ সেবা তাঁর ন্যায্য প্রাপ্য। ব্যাপার দেখে মনে হ'ল রোজই এই ব্যাপার চলে—শিক্ষক-দুটিই প্রতিরাত্রে হেডমাস্টারের রান্নাবান্না করে দিয়ে যায়।

আমাদের পরিবেষণও করলে ওরা।

ড্রইং মাস্টারটি আমায় বললে, আপনি কিছু খাচ্চেন না কেন বাবু? ভালো করে খান।

কত যত্নে ওরা আমায় বসে খাওয়ালে। হেডমাস্টারের বন্ধু, সুতরাং আমিও ওদের খাতিরের ও খোসামোদের পাত্র—অমন যত্ন আমার আপনার জনও বোধহয় কোনদিন করেনি।

রাত্রে ওরা বাড়ি চলে গেল। যাবার সময় আমাদের জন্যে পান পর্যন্ত সেজে রেখে গেল। আমি কিছুদূর গেলুম ওদের এগিয়ে দিতে।

ড্রইং মাস্টারটিকে দেখে মনে কেমন অনুকম্পা জাগে। যেমন নিরীহ তেমনি দরিদ্র। কাপড়চোপড় বেশি নেই, একটা আধময়লা পিরানের ওপর একটা উড়নি; একখানা আধময়লা মোটা ধুতি, এই ওর পরিচ্ছদ।

আমি মাঠের মধ্যে গিয়ে ওকে বললুম—

—এই কাছেই, শাটিরপাড়া গ্রাম।

—কতদিন স্কুলে আছেন?

—তা প্রায় সাত বছর আছি বাবু।

—কিছু মনে করবেন না—এখানে কত পান?

—পনেরো টাকা—আর হেডমাস্টারবাবু এসে আমায় দিয়ে স্কুলের খাতাপত্র লেখার কাজ কিছু কিছু করিয়ে নিয়ে স্কুল থেকে তিনটাকা মাসে দেওয়ান। বড় উঁচু মন ওঁর।

—বাড়িতে কে কে আছে আপনার?

—বাবা মা, দুই বোন, আর আমার স্ত্রী, আমার একটি ছোট ছেলে।

—মাইনে তো খুব বেশি না। অন্য স্কুলে যান না কেন?

—কে দেবে বাবু? আজকাল চাকুরির বাজার যা, বি এ পাশ করে বেকার বসে আছে আর আমি তো মোটে নর্ম্যাল ত্রৈবার্ষিক পাশ। আমাদের চাকুরি কি হঠাৎ জোটে বাবু?

—জমিজমা আছে বাড়িতে?

—সামান্য ধানজমি আছে, তাতে ছ'মাসের খোরাকী চালটা ঘরে আসে। বাকি ছ'মাস টানাটানি করে সংসার চলে। কি করবো বাবু, যখন এর বেশি রোজগারের ক্ষমতা নেই—এতেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়।

নর্ম্যাল পাশকরা একজন পণ্ডিত আজ সাত বছর পনেরো টাকায় ঘসচে, কোনোখানে উন্নতির আশা নেই। শেয়ালদা স্টেশনের একজন কুলিও মাসে অন্তত পনেরো টাকার দেড়গুণ থেকে তিন-চারগুণ রোজগার করে।

এদের দিকে চাইলে কষ্ট হয়, এরা আমাদের ছেলেপুলেকে মানুষ করে দেবার ভার নিয়েচে, পরম নিশ্চিন্তে সে ভার এদের ওপর চাপিয়ে আমরা বসে আছি। একথা কি কখনও ভাবি যে এরা কি খেয়ে আমাদের সন্তানদের মানুষ করে দেবে? হাওয়া খেয়ে তো মানুষ বাঁচে না।

আবার সকাল হ'তে না হ'তে এরা ফিরে এসে জুটলো হেডমাস্টারের ঘরে। সকালের চা এরাই করে দিলে, বোঝা গেল এ কাজ ওরা রোজই করে। আসবার সময় এরা আবার একছড়া কাঁচকলা ও গোটাকতক ডিম

এনেচে, ওদের ওপরওয়ালা হেডমাস্টারকে খুশি রাখবার জন্যে কত না আয়োজন ওদের।

আমার বন্ধুটি আগের মতো পড়াশুনো করেন না। এখানকার এই সব অর্ধশিক্ষিত লোকদের ওপর সর্দারি করে বেশ আনন্দেই দিন কাটাচ্চেন।

ইনি এক সময় নিজেকে সচল এন্‌সাইক্লোপিডিয়া করবার দুরূহ প্রচেষ্টায় অনেক সময় ব্যয় করেছিলেন, বন্ধুবান্ধব মহলে বাজি রেখে পরের ভুল ধরে ছাত্রাবস্থায় আত্মপ্রসাদ লাভ করতেন।

এঁকে জিগ্যেস কল্লুম—কি হে, এখানে পড়াশুনো কি রকম করচো?

—না ভাই, এখানে কিছু বই নেই, নিজেরও অত পয়সা নেই যে বই আনাই।

—তা হলে কষ্টে আছো বলো?

—তা নয়, আমার মত বদলাচ্ছে ক্রমশ।

—কি রকম শুনি?

—কতকগুলো ইন্‌ফরমেশনের বোঝা মাথার মধ্যে চাপিয়ে নিয়ে আগে ভাবতুম খুব বিদ্যে হয়েচে আমার। যাদের মাথার মধ্যে এসব থাকতো না, তাদের ভাবতুম মূর্খ, কিছু জানে না। এখন দেখচি জীবনে সব কিছু জানবার প্রযোজন নেই—কয়েকটি বিষয় বেছে নিয়ে শুধু তাদের সম্বন্ধে জানতেই সারা জীবন কেটে যেতে পারে। অন্য বিষয় সম্বন্ধে কিছু জানবার দরকার হয়—রেফারেন্সের বই খোলো, দেখ। মানুষের মস্তিষ্কের ওপর অনাবশ্যক বোঝা চাপিয়ে লাভ নেই।

—সত্যিই তোমার অনেক বদলেচে দেখচি—

—তার মানে কি জানো, তখন ছিলুম সদ্য কলেজের ছোক্‌রা, রক্ত বেজায় গরম, এখন ক্রমশ অভিজ্ঞতা দ্বারা অনেক বুঝচি। অভিজ্ঞতা না হ'লে কিছু হয় না জীবনে।

—সে কি হে! জীবনে অভিজ্ঞতা তো হবেই। তাই নিয়েই তো জীবন। এক জায়গায় যদি চুপটি করে বসেও থাকো বেঁচে, তা হ'লেও অভিজ্ঞতা আটকায় কে। কি বুঝলে অভিজ্ঞতায়?

—বুঝলুম এই, জীবনে যদি কিছু দিতে হয় তবে নির্জনে ভাবার দরকার বড্ড বেশি। পড়ার চেয়েও অনেক বেশি। এখানে এই নির্জন জায়গায় আজ দুবছর একা বাস করে অনেক বদলে গিয়েচি হে—অনেক কিছু বুঝেচি।

—কিন্তু যার মাথায় কিছু নেই—দুনিয়ার কোনো খবর রাখে না, তার চিন্তার মূল্য কি দাঁড়াবে?

—অন্তত আমার সম্বন্ধে তুমি একথা বলতে পারো না। আমি এখন যদি চিন্তা করি, তার খানিকটা মূল্য অন্তত আমার কাছেও দাঁড়াবে। আমার নিজের জীবন সম্বন্ধে—পরের কথা আমি ভাবিনে, নিজের জীবনের কথা। অনেক কাজ হয় এতে।

—কোন্ বিষয় ভালো লাগে পড়তে?

—পলিটিক্স্ সম্বন্ধে জানবার বড় ইচ্ছে। আগে এই জিনিসটা ভালো করে পড়িনি—এখন মনে হয়, না পড়ে ভালো করিনি।

—দেশের পলিটিক্স্ না বিদেশের পলিটিক্স্?

—সব দেশেরই—বিশেষ করে নিজের দেশের।

—আমার মত এসব সম্বন্ধে অন্য রকম।

—কি শুনি তোমার মত?

—আমার মতে ইউনিভার্সকে বুঝতে চেষ্টা না করলে মানুষের কিছুই হ'ল না।

—গ্রহ-নক্ষত্র, এই সব?

—শুধু গ্রহনক্ষত্র নয়, সব কিছু। পশুপক্ষী, গাছপালা, পৃথিবী, গ্রহনক্ষত্র,

Space—এক কথায় আমাদের জীবনের গোটা পটভূমিই। ইউনিভার্সকে না বুঝলে তার স্রষ্টার সম্বন্ধে কিছুই বোঝা যাবে না। ভগবানের বিরাট ঐশ্বর্যরূপটা আগে প্রত্যক্ষ করি—তারপর তাঁর সম্বন্ধে ভাববো।

আমাদের মধ্যে কথা হচ্চিল স্কুলের সামনের ফাঁকা মাঠে একটা বেঞ্চির উপর বসে। সময়টা ছিল সন্ধ্যার কিছু পরেই। মাঠভরা জ্যোৎস্না সেদিন, এখানে ওখানে দু-একটি ক্ষীণ তারা আকাশের গায়ে, জ্যোৎস্না পড়ে সবুজ বেতের ঝোপ চিক চিক করচে।

অনেকদিন এমন ফাঁকা মাঠের মধ্যে বসে বন্ধুর সঙ্গে কথা বলিনি। দুজনেরই মনে বোধহয় একথা উঠেছিল, কারণ আমার বন্ধুটি চারিদিকে চেয়ে বললেন—কেমন জায়গাটা, ভালো নয় হে ?

—চমৎকার। এখানে এতদূরে ঢাকা জেলায় চাকরি পেলে কি করে ?

—খবরের কাগজে দেখে দরখাস্ত করেছিলুম, আমাকে এরা তখুনি এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট দিলে।

—এখানে কতদিন থাকবে ?

—যতদিন না অন্য কিছু একটা পাই। কলকাতার কাছে যাবার বড় ইচ্ছে—

—আমি কিন্তু তোমার এই জায়গা বেশ পছন্দ করচি। এই রকম ফাঁকা জায়গায় বাস করবার খুব ইচ্ছে আমার মনে, যদিও কখনো হয়নি।

—তুমি ভাই যে-সব ভাবনার কথা বললে, Space, God absolute, Stars ইত্যাদি—ও নিয়ে কখনও মাথা ঘামাইনি। আমি চাই যাতে দেশের আর দশের উপকার হয়, পলিটিক্স্ ভিন্ন অন্য কিছুর চর্চা ভালো লাগে না—সমাজে বাস করে, মানুষের মধ্যে বাস করে, তাদের কথা ভাবলুম না, তাদের বুঝবার চেষ্টা করলুম না—কিনা কোথাকার নক্ষত্র, কোথাকার Space—এ সব আমায় appeal করে না—

—নানা রকমের মানুষ আছে, নানারকমের মত আছে। তোমার যা ভালো লাগে তোমার কাছে তাই ভালো। তবে আমি যদি থাকতে পেতুম, তবে অন্য কথা চিন্তা করতুম। পলিটিক্সের কথা আমার মনেও উঠতো না।

—তুমি যদি থাকতে এখানে, তোমাকে আমার দলে ভিড়িয়ে নিতুম একমাসে—

—অর্থাৎ পলিটিক্সের দলে? আমার মনে হয় না যে তুমি সাফল্যলাভ করতে সে কাজে। আমি তোমার দলে যেতুম না। এমন মুক্ত মাঠের মধ্যে বসে পলিটিক্সের কথা যদি মনে উঠতো, তবে মেঘনা নদীর পারে অমন সান্‌সেট্ হওয়ার সার্থকতা কি রইল?

—থাকো না কেন এখানে? আমি চেষ্টা করবো স্কুলে?

—না ভাই, এখন একটা চাকরি হাতে রয়েচে, এখন থাক্। পরে দরকার হ'লে জানাবো। কিন্তু তুমিই বা এ অজ পাড়াগাঁয়ে কতকাল পড়ে থাকবে?

—তা তো জানিনে। এখানে থাকলে সব ভুলে যাবো। অল্‌রেডি মনে সন্তোষ এসে গিয়েচে, অর্থাৎ মনে হচ্চে বেশ তো আছি।

—ওই তো Danger signal—পুরুষের পক্ষে নিজের অবস্থায় সন্তোষ বড্ড খারাপ লক্ষণ বলে বিবেচনা করি—

—আমারও ভয় হয়। তবে চাক্‌রির যা বাজার তাতে তো নড়তে পারিনে এখান থেকে। কোথায় যাবো ছেড়ে দিয়ে? অথচ এ যেন মনে হচ্চে কোথায় পৃথিবীর এক কোণে পড়ে আছি, কোনো কিছু খবর রাখচিনে দুনিয়ার, একেবারে পুরোনো হয়ে গেলুম হে—

—কাণ্টের মতো দার্শনিক একটা ছোট্ট শহরে ছিলেন জার্মানির, এত বড় চিন্তা করবার খোরাক পেয়েছিলেন সেখানে থেকেই। শহরে না

থাকলেই লোক পুরোনো হয় বলে মনে কর কেন? নতুন পুরোনো অত্যন্ত সাধারণ ধরনের শ্রেণীবিভাগ—নতুন মাত্রেই ভালো নয়, পুরোনো মাত্রেই মূল্যহীন নয়—একথা তোমাকে তো বলবার দরকার করে না।

এই সময় শিক্ষক দুটি এসে পৌছুলো। তারা দূর থেকে আমাদের দেখতে পেয়ে এই দিকেই এল। ড্রইং মাস্টার বিনীতভাবে বললে—মাস্টার বাবু, চা করে আনি? আর রাত্তিরে আপনারা কি খাবেন?

আমি তাদের বসালুম বেঞ্চিতে। তারা বসতে চায় না—চা করে এনে না হয় বসচে এখন, দেরি হয়ে যাবে চায়ের—আসলে হেডমাস্টারের সঙ্গে এক বেঞ্চিতে বসতে বোধহয় সঙ্কোচ বোধ করে, আমার অন্তত তাই মনে হ'ল।

আমি বললুম—আচ্ছা, আপনাদের এই গাঁয়ের মাঠ কেমন লাগে আপনাদের কাছে?

ড্রইং মাস্টার বললে—বেশ লাগে, মেঘনার ধারে আরও ভালো। চলুন, যাবেন? জ্যোৎস্না-রাত, ভারি চমৎকার দেখতে হয়েচে। মাস্টারবাবু যদি যান—

আমার সেকথা মনেই ছিল না। সিকি মাই দূরে মেঘনা, জ্যোৎস্নারাত্রে মেঘনার তরঙ্গভঙ্গ দেখবার লোভ সামলাতে পারা গেল না।

বন্ধুকে নিয়ে আমরা গেলুম মেঘনার ধারে। ওপারে কি একটা গ্রাম, এপারে দিগন্তবিস্তীর্ণ প্রান্তর, মাঝে মাঝে বাঁশবন, বনঝোপ। নোয়াখালি জেলার মেঘনা যতখানি চওড়া দেখেচি, এখানে নদী তার চেয়ে ছোট। তবুও আমার মনে হ'ল জলরাশির এমন শোভা দেখেছিলুম শুধু কক্সবাজারের ও মংডুর সমুদ্রতীরে। সন্দীপের তালীবন-শ্যাম উপকূল-শোভা সেই এক সন্ধ্যায় স্টীমারের ডেক থেকে প্রত্যক্ষ করে মনে যে আনন্দ পেয়েছিলুম, আজও যেন সেই ধরনের আনন্দই আবার ফিরে এল মনে।

আমার বন্ধুটি মেঘনার ধারে বড় একটা আসেন না, তিনিই বললেন।

এই সিকি মাইল পথ তিনি হাঁটতে রাজি নন। বললেন—আমার ওসব ভালো লাগে না, জল দেখে তোমাদের যে কি কবিত্ব উথলে ওঠে তোমরাই বলতে পারো।

ড্রইং মাস্টার বেশ প্রকৃতি-রসিক—প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখবার মতো চোখ আছে ওঁর, একথা মনে মনে আমাকে স্বীকার করতেই হ'ল।

আমার বন্ধু বললেন—আসলে তোমরা এতে দেখ কি বলতে পারো ?

—কি করে বোঝাবো ? এই নদী, জল, জ্যোৎস্না-ভরা আকাশ—এ বেশ ভালো লাগে, তাই দেখি।

—কোন্ দিক থেকে ভালো লাগে—picture effect of the land-scape ?

—তাই বটে। কিন্তু তার চেয়েও বেশি।

—তুমি কি অস্বীকার করতে পারো যে তুমি যাকে একটা মস্ত spiritual আনন্দ বলে মনে করচো, তার সবখানিই sensuous ?

—প্রত্যেক ইস্‌থেটিক আনন্দ মাত্রেই sensuous, তবে এ আনন্দ সূক্ষ্মতর শ্রেণীর, spiritual আনন্দের সগোত্র না হ'লেও নিকটতম আত্মীয় বটে। তবে এর প্রকৃতি চিরে চিরে কেটে কেটে দেখাতে বোলো না। আমার মনে হয় কেউই তা করতে পারবে না। শাস্ত্রে চরম আনন্দকে বলেচে, ব্রহ্মাস্বাদের সমতুল্য—কে ব্রহ্মকে আস্বাদ করেচে যে বিচার করবে ? আনন্দের analysis ওভাবে হয় না।

—আমি একটা কবিতা পড়ে এর সমানই আনন্দ পাই যদি বলি ?

—এ তর্ক তোমার সঙ্গে করবো না, কারণ আমার ধাত অন্যরকম। আমার মনে হয় বন্ধ ঘরে বসে হাজার কবিতা পড়লেও সে আনন্দ তুমি কিছুতেই পাবে না।

এখানে আমার মনে পড়লো সন্দীপের তালীবন-শ্যাম উপকূল, আর আওরঙ্গজেবপুরের নিকটে চন্দ্রনাথ পাহাড়ের সেই বনভূমি।

আমার বন্ধু প্রতিবাদ করে বললেন—এ তোমার গা-জুরি কথা হ'ল।

—শোনো, একটা কথা আছে। দু ধরনের লোকের মধ্যে—যারা প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে ভালোবাসে আর যারা ভালোবাসে না—এক দলের চোখ আছে, অন্য দলের নেই। চক্ষুষ্মান্ ও অন্ধ দুদলে তুলনা হয় না, এখানে বিচার হবে চক্ষুষ্মান্ লোক বন্ধ ঘরে কবিতা পড়ে যে আনন্দ পায়, সেই ধরনের আনন্দ সে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য থেকে পায় কি না। সুতরাং ভেবে দেখ এ নিয়ে তর্ক হ'তে পারে কি ?

সম্মুখে মেঘনা নদীর বুকে জ্যোৎস্নারাশি এক মায়াপুরীর সৃষ্টি করেচে। আমার মনে হ'ল শুধু এই দৃশ্য প্রতিদিন দেখবার সুযোগ পাবো বলে স্কুল-মাস্টারি নিয়ে এখানে থেকে যেতে রাজি আছি।

এক বছর ধরে এই দৃশ্য রোজ দেখলে মনের আয়ু বেড়ে যায়।

আমার বন্ধু বললেন—আমার আরও ভালো লাগে না এতদূরে আছি বলে, দেশের মধ্যে হ'লে বোধহয় ভালো লাগতো।

—আমার মনে হয় এ তোমার ভুল। দূরে থাকা একটা advantage, প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করবার পক্ষে।

—কি রকম ?

—দেশ থেকে দূরে যত যাবে, তত landscape-এর প্রকৃতি তোমার কাছে রোমান্টিক্ হয়ে উঠবে। ভ্রমণকারী ও explorerরা এটা ভালো বুঝতে পারে। বরফ ইংলণ্ডেও জমে শীতকালে, তবে নর্থ পোলের বরফ মনে অন্য রকম ভাব জাগায়। একই বাঁশবন দেশে খালের ধারে দেখচো অথচ ইরাবতীর পাহাড়ী gorge-এর ধারে সেই একই বাঁশবন দেখো—বুঝতে পারবে কি ভীষণ তফাৎ। এবারকার ভ্রমণে আমি তা ভালো বুঝতে

পেয়েছি। কতবার দূরদেশের পাহাড়ের ওপর, সমুদ্রের ধারে, কিংবা বনের ছায়ায় বসে দেশের কথা ভেবে দেখচি—অপূর্ব চিন্তা জাগায় মনে। সঙ্গে সঙ্গে চারিপাশের প্রকৃতি কি অপূর্ব রূপই না ধরে চোখের সামনে। এ হ'ল মনের রসায়ন, বোঝাতে পারিনে মুখে। অভিজ্ঞতায় যারা বুঝতে হয়। শুনলে বোঝা যায় না।

আমার বন্ধু হো হো করে হেসে উঠে বললেন—এ যে তুমি esoteric তথ্যের দলে নিয়ে গিয়ে ফেললে দেখচি। তোমাদের মতো লোককে লক্ষ্য করেই রবীন্দ্রনাথ 'বাতায়নিকের পত্রে' লিখেছিলেন 'মাথার ওপর যে আকাশ নীল তাই দেখতে ছুটে যাই এটোয়া কাটোয়া'—ওই ধরনের কিছু। অস্বীকার করতে পারো?

—এ হ'ল অনুভূতির ব্যাপার, সুতরাং স্বীকারও করিনে, অস্বীকারও করিনে। যাই হোক, তোমার ভালো লাগচে কি না বলো।

—কেন ভালো লাগবে না? তুমি এখানে থেকে যাও, দিই না আমার স্কুলে একটা মাস্টারি জুটিয়ে।

এ কথায় স্কুলের শিক্ষক দুটি খুব উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। খুব ভালো হয় তা হ'লে, হেড্‌মাস্টারবাবু চেষ্টা করলে এখুনি হয়ে যায়। স্কুলের কমিটি কিছু নয়, সবই হেড্‌মাস্টারবাবুর হাত। আমাকে তারা দুজনে বিশেষ করে অনুরোধ করলে থেকে যাবার জন্যে।

রাত আটটার সময় আমরা সবাই ফিরলুম বোর্ডিংএ।

ড্রইং মাস্টার বললে—তাই তো, আমার সকাল সকাল উঠে আসা উচিত ছিল, এখন দেখচি খেতে আপনাদের অনেক রাত হয়ে যাবে।

ওরা রুটি করতে বসলো রান্নাঘরে। আমরা কাছে বসে আগে এক পেয়ালা করে চা খেলাম। ওরাই করে দিলে। আমার কতবার মনে হ'ল,

কি সুন্দর লোক এরা! পরের জন্যে অক্লান্ত সেবা করে যাচ্চে দিনের পর দিন—কোনো দিন এতটুকু বিরক্ত হয় না।

আমার বড় মনে ছিল এই নিরীহ শিক্ষক দুটির কথা। মাটি দিয়ে মানুষ গড়লেও বোধ হয় এত নিরীহ, ভালোমানুষ, এত বিনয়ী হয় না। যেদিন নরসিংদি ছেড়ে চলে আসি, ওদের দুজনকে ছেড়ে আসবার কষ্টই আমার বড় বেশি হয়েছিল।

আমাকে পরদিন স্কুলের অন্যান্য মাস্টার এবং ছাত্রেরা মিলে নিমন্ত্রণ করলে—আমাকে ও হেডমাস্টারকে নিয়ে তারা একসঙ্গে বসে খাবে।

আবার সেইদিনই ড্রইং মাস্টারটিও আমাকে চায়ের নিমন্ত্রণ করে তার বাড়ি নিয়ে গেল। আমার বন্ধুকেও বলেছিল, কিন্তু সেই সময়ে স্কুল কমিটির মিটিং ছিল বলে তাঁর যাওয়া হয়নি।

শাটিরপাড়া গ্রামে এই প্রথম ঢুকি। ঢাকা জেলার অজ পল্লীগ্রাম কেমন দেখবার সুযোগ এর আগে কখনো হয়নি। গ্রামেব মধ্যে ছোটবড় বেতঝোপ বড্ড বেশি, টিনের ঘরই বারোআনা—দু একটা কোঠাবাড়িও চোখে পড়লো।

আমি গ্রামের মধ্যে বেশি দূর যাইনি। গ্রামে ঢুকে ড্রইং মাস্টারের বাড়ি বেশি দূর নয়। একটা টিনেব ঘরেব দাওয়ায আমায় নিয়ে গিয়ে বসালে। বেশ ফাঁকা জায়গা বাড়ির চারিদিকে।

তক্তপোষের ওপর শতরঞ্চি পাতা। একটি ছোট মেয়ে এসে আমাদের সামনে সাজা পান রেখে গেল। ড্রইং মাস্টার বললে—আমার ভাইঝি—ওর নাম মঞ্জু—

—মঞ্জু? বেশ সুন্দর নামটি! এসো তো খুকি-মা এদিকে—

—এসো, বাবু বলচেন, কথা শুনতে হয়—এসো—হ্যাঁ, ভালো কথা—

আমার স্ত্রী আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চাইছিল। সে কলকাতার লোক কখনো দেখেনি—বলেন তো আনি—

—বেশ তো, আনুন না তাঁকে।

চা দেবার পূর্বে ড্রইং মাস্টার বাড়ির মধ্যে গিয়ে কি বলে এল। কিছুক্ষণ পরে আধঘোমটা দিয়ে একটি ছিপছিপে গৌরাঙ্গী সুন্দরী বধূ চা ও খাবার নিয়ে তক্তপোষে আমার সামনে রাখলো।

ড্রইং মাস্টার বললে—প্রণাম করো—ব্রাহ্মণ—

মেয়েটি গলায় আঁচল দিয়ে প্রণাম করলে আমি বাধা দেবার পূর্বেই! কিন্তু একে সে ছেলেমানুষ, বয়েস আঠারো-উনিশের বেশি হবে না—তাতে এত লাজুক যে বেচারী আমার দিকে মুখ তুলে ভালো করে চাইতেই পারলে না। আমি তাকে বসতে বললুম তক্তপোষের এক কোণে। তার স্বামীও বসলো। অনেক বলবার পর মেয়েটির মুখ ফুটলো। দু একটি কথা বলতে শুরু করলে আমার কথার উত্তরে। ঢাকা জেলার পল্লীগ্রামের টান এত বেশি যে ভালো করে বোঝাই যায় না। নিকটেই কি এক গ্রামে বাপের বাড়ি।

আমি বললুম—আপনি কখনো কলকাতায় যান নি—?

মেয়েটি কিছু বলবার আগে ড্রইং মাস্টার হেসে বললে—ও কখনো শাটিরপাড়া ছেড়ে কোথাও যায়নি, রেল স্টীমার চড়েনি। মেয়েটি মুখ নিচু করে হাসলে। বেশ সুন্দর মুখ, যে কেউ সুন্দরী বলবে মেয়েটিকে। চা খাবার সময়ে আমার দিকে কৌতূহলপূর্ণ ডাগর চোখে চেয়ে দেখতে লাগলো মেয়েটি, যেন কোন অদৃষ্টপূর্ব জীব দেখচে।

বললুম—সময় থাকলে আপনার হাতের রান্না একদিন খেতুম, কিন্তু কালই চলে যাচ্চি আর সময় নেই।

ড্রইং মাস্টারের বাড়িতে আর কেউ নেই, তার এই স্ত্রী ছাড়া। নিজেই সেকথা বললে।

—দেখুন স্কুলে সামান্য মাইনে পাই, বাড়িতে একটা ঝি রাখলে ভালো হয় কিন্তু তা পেরে উঠিনে, একা আমার স্ত্রীকে সব কাজকর্ম করতে হয়—ওর আবার শরীর তত ভালো নয়, কি করি আমার সঙ্গতি নেই বুঝতেই পারচেন।

আমি বললুম—ইনি চমৎকার খাবার-দাবার করতে পারেন তো! এই বয়েসে শিখেচেন অনেক কিছু দেখচি।

মেয়েটি নিজের প্রশংসা শুনে লজ্জায় মুখ নিচু করলে।

আমি বললুম—এ গ্রামে বেশ শিক্ষিত লোক আছেন?

ড্রইং মাস্টার বললে—আছেন বটে তবে দেশে থাকেন না। একজন বিখ্যাত লোক আছেন, ঢাকার উকিল; আরও একজন কলেজের প্রোফেসার আছেন। তবে তাঁরা দেশে আসেন খুব কম।

ইতিমধ্যে সেই ছোট মেয়েটি আবার এল—আমি জিগ্যেস্ করলুম, এই মেয়েটি আপনার বাড়ির না?

—না, এটি আমাদের পাশের বাড়ির। ও এসে আমাদেব বাডিতে মাঝে মাঝে সাহায্য করে আমার স্ত্রীর। বড ভালো মেয়েটি। ওরও কেউ নেই, দিদিমার কাছে মানুষ হচ্চে—দিদিমার অবস্থাও বিশেষ ভালো নয়, গ্রামের লোকদের দয়ায় এক রকম করে চলে।

বাঙালী পরিবারের দুঃখের কাহিনী সব জায়গাতেই অনেকটা এক রকম, কি আমার নিজের জেলায়, কি সুদূব ঢাকা জেলায়। শুনে দুঃখিত হওয়া ছাড়া অন্য কিছু করার নেই।

ওখান থেকে বিদায় নিয়ে স্কুলে চলে আসবার পথে সন্ধ্যা হয়ে এল। ড্রইং মাস্টার আমার সঙ্গেই ছিল—কি জানি কেন এই নিরীহ গ্রাম্য ইস্কুল মাস্টারের ওপর আমার একটা অদ্ভুত ধরনের মায়া জন্মেচে! যেন মনে হচ্চে ওকে ছেড়ে যেতে আমার খুব কষ্ট হবে। আমার কলেজের সমপাঠী

বন্ধুটির চেয়েও এই লোকটি আমার আপনার জন হয়ে উঠেচে এই ক'দিনে।

বললুম—আপনি কলকাতার দিকে আসুন না কেন?

—কি যে বলেন বাবু, খেতেই পাইনে তার কোথা থেকে ভাড়া জোগাড় করে কলকাতায় যাবো? আমার এক মাসের মাইনে। আর কলকাতায় গিয়েই বা আমার মতো নর্মাল পাশ পণ্ডিত কত টাকা মাইনে পাবে?

কথাটার মধ্যে যুক্তি ছিল। সুতরাং চুপ করে রইলুম।

আমরা স্কুলের কাছে পৌঁছুতেই কতকগুলি ছেলে আমাদের আলো হাতে এগিয়ে নিতে এল। ওরা আমাদের স্কুলের হলে গেল নিয়ে।

সেখানে গিয়ে দেখি মহাকাণ্ড।

খুব রান্নাবান্না চলেচে। বড ডেকে পোলাও চড়েচে, প্রকাণ্ড দুটো বড মাছ কোটা হচ্চে, আবও দুডেক পোলাও রাঁধবার মালমশলা ডালায়। ছেলেদের উৎসাহ ছাপিয়ে উঠেচে মাস্টারদের উৎসাহ—তাঁরা নিজেরাই ছুটোছুটি করে রান্নার তদারক করচেন, কোথায় খাওযার পাত পাতা হবে তাব ব্যবস্থা করচেন—ইত্যাদি।

আমায় ঘিরে কযেকজন মাস্টার এসে দাঁড়ালেন।

একজন বৃদ্ধ শিক্ষক বললেন—আপনাকেই খুঁজচি—কোথায় গিযেছিলেন? ক'দিন এসেচেন, আমাদের মাস্টারবাবুর পরম বন্ধু আপনি, আপনার সঙ্গে আলাপ করবার জন্যে—

আমি ড্রইং মাস্টারকে দেখিয়ে বললুম—এঁর বাড়ি চায়ের নিমন্ত্রণ ছিল—

—আমাদের হবনাথের বাড়ি? বেশ বেশ—

এই রকম একটি অপরিচিত স্থানে আমি সেদিন যে আন্তরিক আপ্যায়ন, হৃদ্যতা ও সমাদর লাভ করেছিলাম, তা জীবনে কখনো ভুলবার নয়। অথচ আমার সঙ্গে তাঁদের কোনো স্বার্থের সম্পর্ক নেই কোনো দিক দিয়েই—আমায় খাতির করে তাঁদের লাভ কি?

আমায় ও আমার বন্ধুটিকে মাঝখানে নিয়ে ওঁরা খেতে বসলেন। কত রকম গল্পগুজব, হাসিখুশি।

একজন শিক্ষক বললেন—আমাদের দেশ কেমন লাগলো আপনার ?

—বড় ভালো লেগেচে, পূর্ববঙ্গের লোকের প্রাণ আছে।

—সত্যই তাই মনে হয়েচে আপনাব নাকি ?

—মনে হয়েচে তো বটেই—আমি সে কথা শুধু মুখে বলচিনে, একদিন লিখবো।

—আপনার লেখাটেখা আসে ?

—ইচ্ছে করে লিখতে, তবে লিখিনি কখনো। আপনাদের এই আদর-আপ্যায়ন কোনোদিন ভুলবো না, একথা আমার মনে রইল—সুবিধে হ'লে সুযোগ পেলে লিখবোই।

তাঁরা সবাই মিলে আমার বন্ধুর নানারকম সুখ্যাতি করলেন আমার কাছে। হেডমাস্টার বাবুর ইংরিজি প্রায় সাহেবের মতো—অমন ইংরিজি বলবার বা লিখবার লোক তাঁরা কখনো দেখেননি—ইত্যাদি। পরদিন আমি সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ওখান থেকে চলে এলুম।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করি, আমার এই বন্ধুটি তারপর ওখানকার কাজ ছেড়ে দিয়ে বি, টি, পড়তে আসেন কলকাতায় এবং ভালো করে বি, টি, পাশ করে কি রকম কি যোগাযোগে বিশ্ববিদ্যালয়েব বৃত্তিলাভ করে বিলেত যান। বর্তমানে ইনি শিক্ষাবিভাগেব একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী।

বছর-দুই পরের কথা।

ভাগলপুরে 'বড বাসা' বলে খুব বড় একটা বাড়িতে থাকি কার্যোপলক্ষে, কেশোরামজীর চাকরি তখন অনেকদিন ছেড়ে দিয়েচি।

'বড বাসা'তে অন্য কেউ থাকে না—আমি চাকর-বাকর নিয়ে বাস করি, গঙ্গার একেবারে ঠিক ধারেই, ছাদের ওপর থেকে মুঙ্গেরের পাহাড় দেখা যায়। দিনরাত হু-হু খোলা হাওয়া বয়, ওপারে বিশাল মুক্ত চরভূমি—দিনে সূর্যালোকে মরুভূমির মতো দেখায়, কারণ এসব দেশের চর বালুময় ও বৃক্ষলতাহীন, আবার রাত্রের জ্যোৎস্নালোকে পরীর দেশের মতো স্বপ্নময় হয়ে ওঠে।

একদিন লোকজনকে জিগ্যেস করে জানলুম কাছে অনেক সব দেখবার জিনিস আছে। আমার বন্ধু সুগায়ক হেমেন্দ্রলাল রায়কে একদিন বললুম, চলো হে, কোথাও একদিন বেড়িয়ে আসা যাক—

হেমেন ৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ভ্রাতুষ্পুত্র, এখানেই ওদের বাড়ি। আমার সঙ্গে খুব আলাপ হয়ে গিয়েছিল, বড বাসার ছাদে বসে আমরা দুজনে প্রায়ই আড্ডা দিতাম রাত্রে।

হেমেন যেতে রাজি হয়ে গেল। কিন্তু কোথায় যাওয়া যায়? আমার শোনা ছিল কাজরা ভ্যালি খুব চমৎকার বেড়াবার ও দেখবার জায়গা, ওখানে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির আশ্রম বলে একটা গ্রানাইট পাহাড়ের গুহায় বৌদ্ধ-যুগেব চিহ্ন পাওয়া যায়।

হেমেন ও আমি দুজনে বেবিয়ে পডলুম একদিন সকালের ট্রেনে।

জামালপুরে গিয়ে পুরী ও জিলিপি কিনে নেওয়া গেল, সারাদিন খাবার জন্যে। বনজঙ্গলে চলেচি, খাদ্যসংস্থানের যোগাযোগ আগে দরকার।

কাজরা স্টেশনে নেমে কাজরা ভ্যালি ও ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির আশ্রমে যেতে হয়। জামালপুর ছাড়িয়ে আরও ত্রিশ মাইল পরে কাজরা। স্টেশনের চারিদিকেই ছোট ছোট পাহাড আর প্রস্তরের টিলা।

স্টেশন থেকে বার হয়ে সোজাপথে দূর পাহাডশ্রেণীর দিকে চলেচি কোথায় দুজনে।

একজন গ্রাম্যলোককে জিগ্যেস করলুম, ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির আশ্রম কোথায় জানো ?

সে বললে, নেহি জানতা বাবুজি।

সুতরাং মনে হ'ল জায়গাটি নিতান্ত কাছে নয়। কাছাকাছি হ'লে এরা নিশ্চয়ই জানতো। তবে সামনের ওই পাহাড়শ্রেণীর মধ্যে ছাড়া আর গুহা কোথায় থাকতে পারে ? নিকটে আর কোথাও তেমন বড় পাহাড় নেই।

স্টেশন থেকে একটা রাস্তা বেরিয়ে দূরের পাহাড়ের দিকে চলেচে, আমরা দুজনে সেই পথেই চললুম। মাঝে মাঝে বিহারী পল্লীগ্রাম, খোলার ঘর, ফনিমনসার ঝোপ, মহিষের দল মাঠে চরচে, দড়িব চারপাই পেতে গ্রাম্য লোকেরা জটলা করচে ঘরের উঠোনে, অত্যন্ত ময়লা ছাপা-শাড়ী পরনে গৃহস্থবধূরা ইঁদারা থেকে জল তুলচে।

আবার ফাঁকা মাঠ, জনহীন পথ, মাঝে মাঝে গমেব ক্ষেত। পাহাড়-শ্রেণীর কাছে আসবার নামও নেই, স্টেশন থেকে যতদূরে দেখাচ্ছিল এখনও ঠিক তত দূরেই মনে হচ্চে !

হেমেন বললে, পাহাড় বোধ হচ্চে অনেক দূরে

—চলো, যখন বেরিয়েচি, যেতেই হবে।

—সন্ধ্যার ট্রেনে ফিরতে হবে মনে আছে ?

—যদি ট্রেন না ধরতে পারি, কোথাও থাকা যাবে। এই সব গ্রামে জায়গা মিলবেই একটা রাতের জন্যে।

বেলা বেশ চড়েচে। একটা ইঁদারার পাড়ে আমরা দাঁড়ালুম জল খাবার জন্যে। একটি মেয়ে আমাদের হাতে জল ঢেলে দিলে। আমরা তাকে পয়সা দিতে গেলুম, সে নিলে না।

আরও একখানা গ্রাম ছাড়ালুম। বিহার অঞ্চলের গ্রামে বা মাঠে

কোথাও তেমন গাছপালা নেই। গ্রামের কাছে তাল গাছ, দু একটা আম-বাগান আছে বটে কিন্তু তার তলায় কোনো আগাছা নেই, শুকনো পাতা পর্যন্ত পড়ে নেই, এদেশে জ্বালানি কাঠের অভাব, মেয়েরা ঝুড়ি ভরে জ্বালানির জন্যে শুক্‌নো পাতা কুড়িয়ে নিয়ে যায়। বাংলাদেশের শ্যামল বন-শোভা এখানে একান্ত দুর্লভ। আছে কেবল বিহারের সেই একঘেয়ে সীসম্ গাছের সারি। পথের দুধারে কোথাও ছায়াতরু নেই, খররৌদ্রে পথ হাঁটতে কেবলই তৃষ্ণা পায়। দুজনে ঠিক করলুম বস্তির ইঁদারা থেকে জল পান করা স্বাস্থ্যসম্মত হবে না, এ সব সময়ে বিহারের পল্লীতে কলেরা প্লেগ ইত্যাদির প্রাদুর্ভাব ঘটে। সাবধান থাকাই ভালো।

এবার পথের পাশে ছোট ছোট গাছপালা দেখা গেল। একটা কথা বলি, বাংলা দেশে যাকে 'ঝোপ' বলা হয়, সে ধরনের বৃক্ষলতার নিবিড় সমাবেশ বিহারে ক্বচিৎ দেখা যায়, দক্ষিণ বিহারে তো একেবারেই নেই, বরং উত্তর বিহারের বড় নদীর ধারে বাংলাদেশের মতো ঝোপ অনেক দেখেচি

বাংলাদেশের ঝোপের একটা নিজস্ব সৌন্দর্য আছে, এমনটি আর কোথাও দেখিনি। আমাদের জেলায় আমি জানি এমন অদ্ভুত ধরনের সুন্দর ঝোপ আছে, যার মধ্যেকাব নিবিড ছায়ায় গ্রীষ্মের দিনে সারাবেলা বসে কাটানো যায় নানা অলস স্বপ্নে।

প্রধানত ঝোপ খুব ভালো হয় কেয়োঝাঁকা ও বাঁডা গাছের। কেয়ো-ঝাঁকা মোটা কাঠের গুঁড়ি যুক্ত গাছ হ'লেও লতার মতো এঁকেবেঁকে ওঠে ও বিস্তৃত হয়ে পড়ে, এর পাতাগুলো মখমলের মতো নরম, মসৃণ, শাঁসালো এবং অত্যন্ত সবুজ। কেয়োঝাঁকের স্বভাবই ঝোপ সৃষ্টি করা, যেখানে যে অবস্থাতেই থাক্ জঙ্গলে—কারণ কেয়োঝাঁকা বনের গাছ, যত্ন করে বাড়িতে কেউ কখনো পোতে না—এঁকেবেঁকে উঠে ঝোপ সৃষ্টি করবেই। আর কী সে ঝোপের নিবিড়, শান্ত আশ্রয়। বাঁড়া গাছও এ রকম ঝোপ

তৈরি করে, কিন্তু সে আরও উঁচু ছাদওয়ালা বড ঝোপের সৃষ্টি করে ; ষাঁড়া-গাছ উঁচু হয় অনেকখানি, ডালপালাও কেয়োঝাঁকের চেয়ে অনেক মজবুত। শুধু অবিশ্যি এই গাছগুলি ঝোপ তৈরি করে না, যদি গাছের মাথায় অন্য লতা না ওঠে।

কিন্তু বাংলাদেশের জঙ্গলে বন-কলমী, ঢোলকলমী, কেলে-কোঁড়া, বন-মরচে, বন-সিম, অপরাজিতা, ছোট গোয়ালে, বড গোয়ালে প্রভৃতি লতা সর্বদাই আশ্রয় খুঁজে বেড়াচ্চে অন্য গাছের, অবিবাহিতা মেয়েদের মতো। এদের মধ্যে সব লতারই চমৎকার ফুল ফোটে, কোনো কোনো ফুলের মধুর সুবাসও আছে, যেমন কেলে-কোঁড়া ও বন-মরচে লতার ফুল।

পুষ্পপ্রসবের সময়ে এই সব লতা যখন ছোটবড ঝোপের মাথা নীল, সাদা,ভায়োলেট রঙের ফুলে ছেয়ে রাখে তখন নদী-প্রান্তবর্তী বন বহুদূরের আভাস এনে দেয় মনে, মুগ্ধ নীল আকাশের তলায় এদের পাশে বসে বসে যেন সারাজীবন কাটিয়ে দেওয়া যায়, কত কি স্বপ্ন যে এরা মনে আনে!

বিলেতে আমেরিকায় ঝোপের মূল্য বোঝে, তাই বড আধুনিক ধরনের বাগানে ঝোপ রচনা করবার মতো গাছপালা পুঁতে দেয়। বাগান আর্টিস্টিক ভাবে তৈরি করবার জন্যে ওদের দেশে একজাতীয় শিল্পী আছেন, তাদের garden architect বলে। এরা মোটা মজুরি নিয়ে অতি চমৎকার ভাবে তোমার আমার বাগান তৈরি করে দেবে। ফলের বাগান নয়, সুদৃশ্য ফুল ও অন্যান্য গাছের বাগান।

এই বাগানে ঝোপের বড দাম। সাধারণত দু-ধরনের ঝোপ এই সব বাগানে করা হয়, arbour-জাতীয়, Pergola-জাতীয়। শেষোক্ত শ্রেণীকে ঠিক আমাদের পরিচিত ধরনের ঝোপ বলা যায় না, কারণ: ওটা হচ্চে লতাপাতা দিয়ে ছাওয়া ভ্রমণপথ, অনেকটা আমাদের লাউ-মাচা, পুঁই-

মাচার মতো, তলা দিয়ে পাথর বাঁধানো রাস্তা, খুঁটির বদলে অনেক বাগানে (যেমন কালিফোর্নিয়ায় বিখ্যাত মিসেস্ নাইটের বাগান, ইতালির অনেকগুলি মধ্যযুগের জমিদার বা ডিউকদের বাগান) মার্বেল পাথরের থাম দেওয়া।

সাধারণত ডন রোজ, হনি সিক্‌ল, প্রভৃতি লতানে গাছ Pergola-র মাচায় উঠিয়ে দেওয়া হয়। আজকাল পশ্চিম চীন থেকে আমদানী ক্লিম্যাটিস্ আরামাণ্ডি নামক সুগন্ধিপুষ্পযুক্ত লতার খুব আদর। তা ছাড়া যাকে বলে স্যাণ্ডউইচ, আইল্যাণ্ড ক্রীপার, সে-জাতীয় পুষ্পিত লতারও খুব চল হয়েচে এই উভয়জাতীয় ঝোপ রচনার কাজে। Beaumontia grandiflora নামক এক প্রকার লতানে গাছও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আমি বিখ্যাত উদ্যানশিল্পী সার এডউইন লুটেন্‌সের রচিত একটি ঝোপের ছবি দেখেছিলুম কয়েক বৎসর পূর্বে, তাতে যে শিল্পপ্রতিভা ও সুকুমার সৌন্দর্য-জ্ঞানের পরিচয় ছিল, মন থেকে সে ছবি কখনও মুছে যাবার নয়।

এই সব বাগানের ঝোপ যত পুরোনো হবে, ততই তার দাম হয়। লতা আরও নিবিড় হয়ে ওঠে, গ্রীষ্মমণ্ডলের বন থেকে আমদানী কাষ্ঠযুক্ত লায়ানাগুলি খুব মোটা হয়, সুন্দরী তরুণীর মুখের আশেপাশের কুঞ্চিত আগোছালো অলকদামের মতো তাদের নতুন গজানো আগ্‌ডালগুলি Pergola ও Arbour-এর মাচা ছাড়িয়ে দুপাশে ঝুলে পড়ে।

অথচ বাংলাদেশে কত নদীতীরের মাঠে, কত বাঁশবনের শ্যামল ছায়ায় অযত্নসম্ভূত অদ্ভুত ধরনের ঝোপঝাজি কত যে ছড়ানো, প্রকৃতিই স্বয়ং সেখানে garden architect—কত পুরোনো ঝোপও আছে তাদের মধ্যে—আমাদের গ্রামেই আমি এমন সব কেয়াঝাঁকার ঝোপ দেখেচি—যা আমার বাল্যদিন-গুলিতে যেমন ছিল, আজও তেমনি আছে, কিন্তু কে তাদের মূল্য দেয় এদেশে? আদর তো করেই না, বরং গালগালি দেয়—ওরাই নাকি ম্যালেরিয়ার সৃষ্টি করচে।

আমার গ্রামে ইছামতী-তীরের মাঠে এ রকম অনেক ঝোপ আছে, শনি রবিবারের অবকাশে কতদিন এ ধরনের ঝোপে বসে মাথার ওপরকার নিবিড় শাখাপত্রের অন্তরালবর্তী নানাজাতীয় বিহঙ্গের কল-কাকলির মধ্যে আপন মনে বই পড়ে বা লিখে সারাদুপুর কাটিয়েচি, দূরপ্রবাসে সে কথা মনে পড়ে দেশের জন্যে মন কেমন করে ওঠে।

হাঁটতে হাঁটতে, এইবার পাহাড় নিকটে এল ক্রমশ।

পাহাড়ের ওপরের বন সবুজের ঢেউয়ের মতো নিচে নেমে এসেচে।

কত রকমের গাছ, প্রধানত শাল ও পলাশী, আরও অজানা নানা গাছ। মহুয়া গাছ এ অঞ্চলে কোথাও দেখিনি। পাহাড়ের ওপরকার বন বেশ ঘন, বড় বড় পাথরের চাঁই পাহাড়ের পাদদেশে অনেকদূর পর্যন্ত ছড়ানো, মাঝে মাঝে নেমে এসেচে পাহাড়ী ঝরনা··

আমরা একটা পাহাড়ে উঠলুম—কাঠ কুড়ুতে যায় গ্রাম্য লোকে যে সরু পথে বেয়ে, সেই পথে দুজনে অতি কষ্টে লতা ধরে ধরে উঠি—আবার হয়ত একটা শিলাখণ্ডে বসে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করি—আবার উঠি। এ পাহাড়ের কোথাও জল নেই—দুজনেরই ভীষণ পিপাসা পেয়েচে, হেমেনের রীতিমত কষ্ট হচ্চে আমি বেশ বুঝতে পারলুম, কিন্তু কিছুই করবার নেই।

তা ছাড়া বস্তি থেকে অনেকদূরে নির্জন বন-প্রদেশে এসে পড়েচি, লোকজনের মুখ দেখা যায় না, গলার স্বরও শোনা যায় না।

হেমেন বললে—ঠিক পথে যাচ্চি তো?

—তা কি করে বলবো? তবে অন্য পথ যখন নেই—তখন মনে হচ্চে আমরা ঠিকই চলেচি।

—বন যে রকম ঘন, কোনো রকম জানোয়ার থাকা অসম্ভব নয় হে, একটু সাবধানে চলো।

আমরা পাহাড়ের মাথায় উঠে দেখি আমাদের সামনে দিয়ে পথটা আবার নিচের উপত্যকায় নেমে গিয়েচে। আমরাও নামতে লাগলুম সে পথ ধরে।

একেবারে উপত্যকার মধ্যে নেমে এলুম যখন, তখন চোখে পড়লো ওদিকে আর একটা পাহাড়শ্রেণী, এর সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে চলে গিয়েচে, মধ্যে এই বনাকীর্ণ উপত্যকা—বিস্তৃতিতে প্রায় দু-তিনশো গজ হবে।

শালবনের মধ্যে ক্ষুদ্র একটি পাহাড়ী নদী রাঙা বালির ওপর দিয়ে বয়ে চলেচে—পায়ের পাতা ডোবে না এত অগভীর। হেমেন জল খাবেই, আমি নিষেধ করলুম। বিশ্রাম না করে জলপান করা যুক্তিযুক্ত হবে না। বরং তার আগে স্নান করে নেওয়া যাক্।

কিন্তু স্নান করি কোথায়?

অত অগভীর নদীর জলে স্নান করা চলে না:

হেমেন বললে—তুমি বোসো, আমি বনের মধ্যে কিছুদুর বেড়িয়ে দেখে আসি, জল কোথাও বেশি আছে কিনা---

বেলা ঠিক একটা, ঝাঁ ঝাঁ করচে খর রোদ, কাঁচা শালপাতা বিছিয়ে বনের ছায়ায় শুয়ে পড়লুম—যেমন ক্ষুধা, তেমনি তৃষ্ণা, দুইই প্রবল হয়ে উঠেচে। অদ্ভুত ধরনের নির্জনতা এ উপত্যকার মধ্যে—এরই নাম কাজরা ভ্যালি বোধ হয়—কেই বা বলবে এর ওই ইংরেজী নাম কি না? হেমেনকে একা ছেড়ে দেওয়া ঠিক হয়নি, কারণ এমন নির্জন মনুষ্যবসতিশূন্য স্থানে বন্যজন্তুর আকস্মিক আবির্ভাব বিচিত্র কি?

কেউ কোথাও নেই, এই সময় একা বনচ্ছায়ায় শায়িত অবস্থায় এই উপত্যকার সৌন্দর্য ও নিবিড় শান্তি ভালো করে আমার মনে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে গেল। এইখানে 'বুদ্ধ নারিকেল' (Starculia Alata) নামে সুবৃহৎ বনস্পতি প্রথম দেখি—তারপর অবিশ্যি মধ্যভারতের অরণ্য-প্রদেশে এই

অতি-বৃহৎ বৃক্ষ দেখেচি। নাম যদিও 'বৃক্ষ নারিকেল'—এগাছের চেহারা দেখতে অনেকটা বিড়িপাতার গাছের মতো—প্রকাণ্ড মোটা গুঁড়ি, ভীষণ উঁচু, সোজা খাড়া ঠেলে উঠেচে আকাশের দিকে, চওড়া বড় বড় অনেকটা তিন্তিরাজ গাছের মতো পাতা—পত্রসমাবেশ অত্যন্ত ঘন। বনস্পতিই বটে, এর পাশে শাল গাছকে মনে হয় বেঁটে বঙ্কু।

অবিশ্যি ও জঙ্গলে কি ভাবে এ গাছের নাম জানলুম তা পরে বলবো।

কিছুক্ষণ পরে হেমেন ফিরে এসে আনন্দের সঙ্গে বললে—খুব ভালো স্নানের জায়গা আবিষ্কার করে এলুম, বেশ একটা গভীর ডোবার মতো—চলো—

আমি জিনিসপত্র নিয়ে যেতে চাইলুম। হেমেন বললে—এইখানে থাক্ না পড়ে, তুমিও যেমন, কে নেবে এই জঙ্গলে ?

আমি বললুম—থাক্। তবে খাবারের পুঁটুলিটা নিয়ে যাওয়া যাক, নেয়ে উঠে সেখানে বসেই খেয়ে নেবো। পরে দেখা গেল এ প্রস্তাব করে কি ভালোই করেছিলাম! ভাগ্যে খাবারের পুঁটুলি রেখে যাইনি!

গিয়ে দেখি বনের মধ্যে আসলে পাহাড়ী ঝরনাটাই একটা খাতের মতো সৃষ্টি করেচে। একটা মানুষের গলা পর্যন্ত জল ডোবাটাতে। স্নান সেরে শালবনের ছায়ায় বসেই আমরা জামালপুর থেকে কেনা পুরী ও জিলিপি খেলাম, তারপর ঝরনার জল খেয়ে নিয়ে আমরা আগের সেই শালবনের তলায় ফিরে এসে দেখি, হেমেন যে ছোট স্নুটকেসটি ফেলে গিয়েছিল, সেটি নেই।

এই জনহীন বনে স্যুটকেস্ চুরি করবে কে ? কিন্তু করেচে তো দেখা যাচ্চে। সুতরাং মানুষ নিশ্চয়ই এখানে কোথাও আছে। আমরা সে দলের লোক নই, যে দলের একজন চিড়িয়াখানায় জিরাফ দেখে বলেছিল—অসম্ভব। এমন ধরনের জানোয়ার হতেই পারে না। এ আমি বিশ্বাস করিনে!

হেমেন বললে—নতুন স্থটকেসটা ভাই, সেদিন কিনে এনেচি কলকাতা থেকে—

—কিন্তু নিলে কে তাই ভাবচি—

—আমার মনে হয় বনের মধ্যে রাখাল কি কাঠকুড়ুনি মাগী ঘুরতে ঘুরতে এদিকে এসেছিল—বেওয়ারিশ মাল পড়ে আছে দেখে নিয়ে গিয়েচে—

—জিনিসের আশা ছেড়ে দিয়ে চল এখন ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির আশ্রমের খোঁজ করি—

আবার সেই বৃদ্ধ নারিকেল পথে পডলো—এ গাছের দিকে চেয়ে শ্রদ্ধা হয় বটে। এই জাতীয় গাছই বনস্পতি নামের যোগ্য। কলের চিমনির মতো সোজা উঠে গিয়েচে, দেবদারুর মতো কালো মোটা গুঁড়ি—ওপরের দিকে তেমনি নিবিড় শাখা-প্রশাখা; তবে গাছটাতে শাখা-প্রশাখা দূরে ছড়ায় না—অনেকটা ইউক্যালিপ্‌টাস্‌ গাছের ধরনে ওপরের দিকে তাদের গতি। হেমেন হঠাৎ বললে—দেখ, দেখ—ওগুলো কি হে ?

সত্যি, ভারি অপূর্ব দৃশ্য বটে। একটা গাছের ডাল-পালায় কালো কালো কি ফল ঝুলচে, রাশি রাশি ফল, প্রত্যেক ডালে দশটা পনেরোটা—ভারি চমৎকার দেখাচ্চে এখান থেকে।

হেমেন বললে—একটা নয় হে, ও রকম গাছ আরও রয়েচে ওর পাশেই—

এইবার আমি বুঝলাম। দূর থেকে ভালো বোঝা যাচ্ছিল না। বন্ধুকে বললুম—ওগুলো আসলে বাদুড ঝুলচে গাছের ডালে—দূর থেকে ফলের মতো দেখাচ্চে—

হেমেন তো অবাক। সে এমন ধরনের বাদুড় ঝোলার দৃশ্য এর আগে কখনো দেখেনি বললে। কাজরা ভ্যালির সে গম্ভীর দৃশ্য জীবনে কখনো

সত্যিই ভোলবার কথা নয়। দুদিকে দুটো পাহাড়শ্রেণী, মাঝখানে এই বনময় উপত্যকা, বিশাল-বনস্পতি-সমাকুল, নির্জন, নিস্তব্ধ। আমার কানে ঝরনার শব্দ গেল। দুজনে ঝরনার শব্দ ধরে সামনের দিক দিয়ে দূরে পাহাড়শ্রেণীর তলায় বনের মধ্যে একটা মন্দিরের চূড়ো দেখতে পেলুম। ওই নিশ্চয়ই ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির আশ্রম।

হেমেন বললে—আমার সুটকেস্‌টা আশ্রমের বালক-বালিকারা নেয় নি তো হে?

বনের মধ্য দিয়ে আমরা মন্দিরের কাছে পৌঁছে গেলাম। জায়গাটার দৃশ্য বড় সুন্দর। একদিকে মন্দিরের কুড়ি হাত দূরে বাঁ পাশে একটা বড় ঝরনা পাহাড়ের ওপর থেকে পড়চে। আমাদের সামনে একটা গুহা—গুহায় ঢুকবার জায়গাটাতেই মন্দির, পাহাড়ের একেবারে তলায়।

বহুপ্রাচীন আমলের মন্দির, দেখলেই বোঝা যায়। নির্জন স্থান, দুদিকে পাহাড়শ্রেণী, মধ্যে এই সুন্দর উপত্যকা—প্রাচীন ভারতের পবিত্র আশ্রমপদের ছবি মনে জাগায় বটে! রোদ তখন পড়ে আসচে, পশ্চিম দিকের পাহাড়শ্রেণীর ছায়া পড়েচে উপত্যকায়—কত কি পাখী ডাকচে চারিদিকের গাছপালায়। হেমেনও বললে—বড় সুন্দর জায়গাটি তো!

আমাদের চোখের সামনে আশ্রমের ছবিকে পূর্ণতা দান করবার জন্যেই যেন এক সন্ন্যাসিনী মন্দির থেকে বেরিয়ে এলেন! আমরা তো অবাক। এই বনের মধ্যে সন্ন্যাসিনী!

সন্ন্যাসিনী আমাদের দেখতে পেয়ে কাছে এলেন।

তেমন সুন্দরীও নন, বিশেষ তরুণীও নন। বয়স ত্রিশের ওপর, তবে দেহের বর্ণ সুন্দর, অনেকটা গঙ্গাজলী গমের মতো। মাথায় একঢাল কালো চুলে কিছু কিছু জট বেঁধেচে। পরনে গৈরিক বসন। আমাদের হিন্দিতে বললেন—কোথা থেকে আসচ ছেলেরা?

—ভাগলপুর থেকে মাইজি।

—কি জাত ?

—আমরা দুজনেই ব্রাহ্মণ।

—হেঁটে এলে ?

—আজ্ঞে। কাজরা স্টেশনে বেলা ন'টার সময় নেমে হাঁটচি।

—আজ তোমরা ফিরতে পাববে না। এখানেই থাকো।

আমি হেমেনের মুখের দিকে চাইলুম। তারপর দুজনে মিলে চারিদিকে চাইলুম—থাকবো কোথায় ? ঘবদোর তো কোনোদিকে দেখি না। গাছতলায় নিশ্চয়ই রাত্রিযাপন করার প্রস্তাব করেননি মাতাজী।

সন্ন্যাসিনী বললেন—বাবা, তোমরা থাকো, থাকতেই হবে—সন্ধ্যা হবে সামনের পাহাড় পেরিয়ে যাবার আগেই হয় তো। তা ছাড়া, দরকারই বা কি কষ্ট করে যাবার ? থাকবার ভালো জায়গা আছে।

কিন্তু কোথায় ? চোখে তো পড়ে না কোনোদিকে। হেমেন ও আমি আর একবার চারিদিকে চেয়ে দেখলাম।

হেমেন চক্ষুলজ্জা বিসর্জন দিয়ে বললে—মাতাজী, আমরা থাকব কোথায় ?

সন্ন্যাসিনী হেসে বললেন—মন্দিবে। বাইরে থেকে বোঝা যায় না। গুহার ভেতরে মন্দিব বাদে দুই কামবা। কোনো কষ্ট হবে না।

আমরা একবাব দেখতে চাইলুম জায়গাটা। মাতাজী আমাদের সঙ্গে কবে নিযে গেলেন—মন্দিরেব গাযে ধ্যানী বুদ্ধের মূর্তি প্রত্যেক পাথরে খোদাই। বৌদ্ধযুগেব চিহ্ন মন্দিরের সর্বাঙ্গে—বৌদ্ধমন্দির কবে হিন্দু তীর্থস্থানে পরিণত হয়েচে তার সঠিক ইতিহাস সন্ন্যাসিনী কিছুই জানেন না বলেই মনে হ'ল। বৌদ্ধধর্ম বলে যে একটি ধর্ম ভারতবর্ষে আছে বা ছিল এসব ঐতিহাসিক তথ্য তাঁর জানা থাকবার কথা নয়।

কামরা দুটি ছোট বটে, কিন্তু বেশ ঠাণ্ডা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। একটা রাত কাটাবার পক্ষে নিতান্ত মন্দ হবে না।

সন্ন্যাসিনী বললেন—বাঙালীরা ডালভাত ভালোবাসে—এখানে কিন্তু তা দিতে পারবো না।

আমরা বললুম—তাতে কি। যা দেবেন, তাতেই চলবে।

হেমেন চুপিচুপি আমায় বললে—বিছানা কোথায়, শুকনো পাতালতা পেতে শুয়ে থাকতে হবে না কি?

কিন্তু শোবার সময়ের এখনও অনেক দেরি—সে ভাবনায় এখুনি দরকার নেই। সন্ধ্যা নেমে আসায় সেই অপূর্ব সুন্দর উপত্যকাটিতে রাঙা রোদ সু-উচ্চ বুদ্ধ নারিকেল বৃক্ষের শীর্ষদেশ স্বর্ণাভ করে তুলেচে—চারিদিকে স্বপ্নপুরীর মতো নিস্তব্ধ শান্তি।

সন্ন্যাসিনীকে জিগ্যেস করলুম—ওই উঁচু গাছটাকে কি বলে?

উনিই বললেন—বুদ্ধ নারিকেল।

আমরা তাঁর কাছ থেকে কিছুক্ষণের জন্যে বিদায় নিয়ে উপত্যকার পূর্ব-দিকে বেড়াতে গেলাম। সন্ন্যাসিনী বারণ করে দিলেন সন্ধ্যার অন্ধকার হওয়ার সময় আমরা যেন বাইরে না থাকি এবং বনের মধ্যে বেশিদূর না যাই। ভাল্লুকের ভয় তো আছেই, তা ছাড়া বাঘও মাঝে মাঝে যে বার না হয়, এমন নয়।

ঝরনা পার হয়ে খানিকদূর গিয়ে অরণ্য নিবিড়তর হয়েচে, বড় বড় পাথরের চাঁই এখানে-ওখানে গড়িয়ে পড়েচে পাহাড় থেকে। কত কি পাখীর কলরব গাছপালার ডালে ডালে; আমরা বেশিদূর না গিয়ে ক্ষুদ্র পাহাড়ী নদীর ধারে একখণ্ড পাথরের ওপরে বসে রইলাম।

সন্ধ্যার অন্ধকার নামবার পূর্বেই আশ্রমে ফিরে এলুম।

মাতাজী আগুন করে আটার লিট্টি সেঁকচেন, আমাদের কাছে বসতে

বললেন। আমাদের বাড়ি কোথায় জিগ্যেস্ করলেন, ভাগলপুরে কি করি, কে কে আছে, বিবাহ করেচি কিনা ইত্যাদি মেয়েলি প্রশ্ন করতে লাগলেন। আমি বললুম, এ মন্দির কতদিনের মাতাজী ?

—মন্দির অনেক দিনের, তবে লক্ষ্মীসরাই-এর একজন ধনী মাড়োয়ারী ব্যবসাদার মন্দির নতুন করে সারিয়ে দিয়ে ভেতরের কামরাও করে দিয়েচে।

—আপনি কতদিন আছেন এখানে ?

—দশ বারো বছর—

—ভয় করে না একলা থাকতে ?

—ভয় কিসের ? পরমাত্মার কৃপায় কোনো বিপদ হয়নি কোনোদিন।

দশ বছর আগে এই সন্ন্যাসিনী গৌরাঙ্গী তরুণী ছিলেন, সে কথা মনে হ'ল, আর মনে হ'ল এই নির্জন উপত্যকায় মন্দিরমধ্যে একা রাত্রি-যাপনের বিপদ সে অবস্থায়।

হেমেন বললে, মাতাজী, আপনার দেশ কোথায় ?

—গৃহস্থ-আশ্রমের নাম বলতে নেই। তবুও বলি আমার বাড়ি ছিল এই বেগুসরাইয়ের কাছেই। আমি এ দেশেরই মেয়ে। আমার চাচা আগে এ আশ্রমের সেবাইৎ ছিলেন, তারপর থেকে আমি আছি।

এতক্ষণে অনেকখানি ব্যাপার আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। এই দেশেরই মেয়ে এবং সম্ভবত বাল্যকাল থেকে ওঁর চাচাজীর সঙ্গে এখানে অনেকবার গিয়েচেন এসেচেন। অনেকেই চেনে এদেশে।

আমি বললুম, একটা কথা জিগ্যেস করবো মাতাজী, মাপ করবেন, আপনি কি বিবাহ করেননি ?

—আমি বিধবা, তেরো বছর বয়সে স্বামীর মৃত্যু হয়, সেই থেকেই গৈরিক ধারণ করেচি।

তারপর তিনি নিজের জীবনের অনেক কথা বলে গেলেন। ওঁর কথার মধ্যে একটি সতেজ, সজীব নারীমনের পরিচয় পেয়ে আমি ও আমার বন্ধু দুজনেই যেন এক নূতন জগৎ আবিষ্কারের আনন্দ অনুভব করলুম, ভেবে দেখলুম এই সন্ন্যাসিনীর যদি বয়স আরও কম হ'ত তবে এঁর জীবনের ইতিহাস শুনে আমরা অন্তত মনে মনেও এঁর প্রেমে না পড়ে পারতুম না—সেই বয়সই ছিল আমাদের।

হেমেন বললে, আপনাকে এ বনে খাবার-দাবার কে এনে দেয়?

—কিউল থেকে আমার শিষ্যরা আসে, ওরাই নিয়ে আসে, হপ্তায় দুদিন।

—আপনি সত্যিই অদ্ভুত মেয়ে। এ রকম মেয়ের সাক্ষাৎ বেশি পাওয়া যায় না।

—কিছু না, পরমাত্মা যখন ডাকেন, তাঁর সব কাজ তিনিই করিয়ে নেন। আমি বিধবা হয়ে একমনে তাঁকে ডেকেচি, ঘরের বাইরে আসবার চেষ্টা করেচি যে কত! সংসার আদৌ ভালো লাগতো না, বাইরে বেরুতে ইচ্ছে থাকতো কেবল। জপতপ করবার কত বাধা সংসারে! আমি, আমাদের বেগুসরাইয়ের বাড়ির পিছনে ছোট একটি তেঁতুল গাছ আছে, কাছেই কিউল নদী—

আমি বললুম, বেগুসরাই মহকুমা? সেখানে তো—

—এই লক্ষ্মীসরাইয়ের কাছে বেগুসরাই, ছোট্ট গাঁ—কিউল নদীর ধারে। তারপর শোনো ছেলেরা, কিউল নদীর ধারে সেই তেঁতুল গাছের কাছে বসে বসে কতদিন ভগবানকে ডেকেচি যে, আমার একটা উপায় করে দাও, সংসার আমার বড় খারাপ লাগচে। ভগবানকে ডাকলে তিনি শোনেন।

—কি করে জানলেন?

—আমি প্রত্যক্ষ ফল পেয়েচি—একমনে ডাকলে না শুনে তিনি থাকতে পারেন না!

আমার একটু আমোদ লাগলো, কারণ সে সময় আমি নিজে ছিলাম ঘোর agnostic, লেস্‌লি স্টিফেনের দার্শনিক মতে অনুপ্রাণিত, ভগবানকে মানি না যে তা নয়, কিন্তু তাঁর অস্তিত্বের সন্ধান কেউ জানে না, দিতেও পারে না—এই ছিল আমার মত।

আমি বললুম, ভগবানকে কখনো দেখেচেন মাতাজী ?

—না, সেভাবে দেখিনি। কিন্তু মনে মনে কতবার তাঁকে অনুভব করেচি। চোখের দেখার চেয়ে সে আরও বড়। চোখ ও মন দুই তো ইন্দ্রিয়, ভগবানকে বুঝবার ইন্দ্রিয় হ'ল মন, চোখ নয়। যদি কেউ বলে ফুলের গন্ধ দেখবো—সে দেখতে পাবে না, কারণ গন্ধ অনুভব করবার ইন্দ্রিয় স্বতন্ত্র—চোখ নয়। এও তেমনি—

—তারপর কি করলেন ?

—আমার চাচাজীকে বললুম, নির্জনে থাকবো, আমায় আশ্রমে নিয়ে যাও, সাধন ভজনের ব্যাঘাত হচ্চে সংসারের গোলমালে। তিনি নিয়ে আসতে চাননি প্রথমে। আমি অনাহারে রইলাম তিনদিন, মুখে কেউ এক ফোঁটা জল দিতে পারেনি এই তিনদিনে। তখন তিনি বাধ্য হয়ে নিয়ে এলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলাম পাঁচ বছর—তাঁর মৃত্যুর পরে একাই আছি।

—ভালো লাগে এখানে একা একা ?

—খুব ভালো লাগে। সংসারের গোলমাল সহ্য করতে পারিনে। এখানটা বড় নির্জন, মন স্থির করে থাকতে পারলে গৃহত্যাগীর পক্ষে এমন স্থান আর নেই।

—কিন্তু আপনি মেয়েমানুষ, আপনার পক্ষে ভয়ও তো আছে—

—সে সব ভয় কখনো করিনি। ভগবানের দয়ায় কোনো বিপদও কখনো হয়নি। সবাই মানে, আশপাশের গ্রামে আমার অনেক শিষ্য আছে তারা প্রায়ই খোঁজ-খবর নেয়। সকালে দেখো এখন---তারা দুধ

দিয়ে যায়, আটা দিয়ে যায়, লক্ষ্মীসরাইয়ের একজন শেঠজী চাল, আটা পাঠিয়ে দেয় মাসে মাসে।

আমাদের রাত্রের খাবার তৈরী হ'ল। চাপাটি আর ডাল মাতাজী কাছে বসে যত্ন করে খাওয়ালেন। রাত্রে শোবার বন্দোবস্তও, খুব ভালো না হ'লেও নিতান্ত খারাপ নয় দেখলুম, একপ্রস্থ বিছানা এখানে অতিথিদের জন্যে মজুত থাকে, লক্ষ্মীসরাইয়ের শেঠজী তার ব্যবস্থা করেচেন। আমাদের কোনই অসুবিধে হ'ল না।

হেমেন বললে, ভাই, রাত্রে মন্দির থেকে বেরুনো হবে না, বাঘের ভয় আছে; মাতাজীকে না হয় ভগবান রক্ষা করে থাকেন অসহায় মেয়েমানুষ বলে, আমাদের বেলা তিনি অত খাতির নাও করতে পারেন তো?

অনেক রাত পর্যন্ত আমরা গল্প-গুজব করলুম। বনানীবেষ্টিত উপত্যকার নৈশ সৌন্দর্য দেখবার লোভ ছিল, কিন্তু হেমেন এ বিষয়ে উৎসাহ দিলে না। মাতাজীও দেননি। তবে ঘুমের মধ্যেও আমরা আশ্রমের পার্শ্বস্থিত ঝরনার বারিপতনের শব্দ শুনেচি সারা রাত।

সকালে আমরা বিদায় নিলুম।

ফিরবার পথে আবার সেই বৃদ্ধ নারিকেলের ছায়াস্নিগ্ধ উপত্যকার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আমরা চারিদিকে চেয়ে দেখলুম। অপূর্ব দৃশ্য বটে। শুনেছিলুম কাজরা ভ্যালিতে স্লেট্ পাথরের কারখানা আছে কিন্তু এখানে কোনোদিকে তার চিহ্ন পাওয়া গেল না।

সামনের পাহাড়টা টপকে এপারে আসতে প্রায় বেলা ন'টা বাজলো।

স্টেশন যখন আরও পাঁচ-ছ'মাইল দূরে, তখন ভাগলপুরের ট্রেন বেরিয়ে গেল।

হেমেন বললে, আর তাড়াতাড়ি করে হেঁটে কি লাভ, এসো কোথাও খাওয়ার ব্যবস্থা করা যাক। ট্রেন আবার সেই সন্ধ্যা-বেলা।

সামনে একটা ক্ষুদ্র বস্তি পাওয়া গেল, তার নাম গোকর্ণটোলা, সে যুগের নামের মতো শোনায় যেন।

একজন বৃদ্ধ লোক ইঁদারার পাড়ে স্নান করচে, তাকে আমরা বললুম, এখানে কিছু খাবার কিনতে পাওয়া যায়?

বৃদ্ধ ঘাড় নেড়ে বললে—না।

আমরা চলে যাচ্চি দেখে সে আবার আমাদের পিছু ডাকলে। যদি আমরা কিছু মনে না করি, কোথা থেকে আমরা আসচি, সে কি জিগ্যেস করতে পারে?

—কাজরা ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির আশ্রম থেকে।

—পুণ্য করে আসচেন বলুন—

—হয়তো।

—বেশ ভালো লাগলো আপনাদের?

—চমৎকার।

—ভাগলপুর থেকে বাংগালি বাবুরা আমার ছেলেবেলায় অনেক আসতেন আশ্রম দেখতে। এখন আর আসেন না। আপনারা আসুন আমার বাড়িতে এবেলা থাকবেন। বড় খুশি হবো।

কারো বাড়ি গিয়ে ওঠা আমাদের ইচ্ছে ছিল না—কিন্তু যখন এসব স্থানে দোকান-পসার নেই, অগত্যা রাজি না হয়ে উপায় কি।

বস্তির মধ্যে যাবার আগ্রহ আমাদের কারো ছিল না। বিহারের এই সব গ্রাম্য বস্তি অত্যন্ত নোংরা, গায়ে গায়ে চালে চালে বসত, গ্রামের প্ল্যান নেই—দিগন্তবিস্তীর্ণ প্রান্তরের মধ্যে একটুখানি জায়গা নিয়ে কতকগুলো প্রাণী পরস্পরকে জড়াজড়ি করে তাল পাকিয়ে আছে যেন। ফাঁক ফাঁক হয়ে ছড়িয়ে বাস করার বাধা কিছুই ছিল না, এ রকম অবাধ মুক্ত মাঠের

মধ্যে জমির দামও বিশেষ আক্রা নয়—কিন্তু ওদের কুশিক্ষা ও সংস্কার তার বিপক্ষে দাঁড়িয়েচে।

কারো বাড়ির সামনে একটা ছোট বাগান পর্যন্ত নেই—একটা গাছ পর্যন্ত নেই। বিহারের এই গ্রাম্য বস্তিগুলি দেখলে বোঝা যায়—সত্যিই দেখলে বোঝা যায় যে, মানুষের সৌন্দর্যজ্ঞানহীনতা কত নিম্নস্তরে নামতে পারে। এক বাড়ির দেওয়ালে পাশের বাড়ি চালা তুলেচে—অর্থাৎ তিনখানা দেওয়ালে তুইটি পৃথক পৃথক গৃহস্থের বাড়ি। কেন যে ওরা এ রকম করে তা কে বলবে? জায়গার কিছু অভাব আছে এই শহর থেকে বহুদূরে, অজ পাড়াগাঁয়ের মধ্যে, বুনো জায়গায়?

তা নয়। ওরা লেখাপড়া জানে না, স্বাস্থ্য কি করে বজায় রাখতে হয় জানে না—কেউ ওদের বলেও দেয় না। চিরকাল যা কবে আসচে ওদের গ্রাম্য অঞ্চলে, ওবাও তাই করে। কল্পনাহীন মনে নতুন ছবিও জাগে না। সেই ঠেসাঠেসি খোলার চালা, ফনিমনসার ঝোপ, রাঙা মাটির দেওয়াল, গোরু ও মহিষের অতি অপবিষ্কার ও নোংরা গোয়াল বাড়িব সামনেই—তাল বা শালগাছেব কড়িতে খোলার চালেব নিচে শুকনো ভুট্টার বীজ ঝুলচে—মেয়েদের পরনে রঙীন ছাপাশাড়ি, যা বোধ হয় তিনমাস জলেব মুখ দেখেনি—হাতে রুপোর ভারী ভারী পৈঁছে ও কঙ্কণ, বাহুতে বাজু—পায়ে ততোধিক ভারী কাঁসার মল।

এইসব বস্তি প্লেগ ও কলেরার বিশেষ লীলাভূমি—একবার মহামারী দেখা দিলে সাত-আট-দিনের মধ্যে বস্তি সাফ করে দেয়।

আমরা গিয়ে এমনি একটা খোলার ঘবের দাওয়ায় বসলুম একটা দড়ির চারপাইয়ের ওপর। বস্তির ছোট ছোট ছেলেমেয়ে একরাশ এসে জুটলো সামনে। তাদের চেহারা দেখে মনে হয় আজন্ম ওরা স্নান করেনি, কাপড়ও কাচেনি।

আমরা জিগ্যেস করলুম—গ্রামে পাঠশালা আছে ?

বৃদ্ধ বললে—এ টোলায় নেই—সহদেবটোলায় আছে। প্রাইমারী স্কুল।

—ছেলেরা সব যায় সেখানে ?

—সবাই যায় না বাবুজি, বড় হয়ে গেলে ছেলেরা গোরু মহিষ চরায়, ক্ষেতখামারে কাজ করে—লেখাপড়া করলে কি সকলের চলে বাবুজি ?

বৃদ্ধ আমাদের হাতমুখ ধোবার জল নিয়ে এল। জিগ্যেস করে জানা গেল ইঁদারার জল। তবুও অনেকটা ভালো। বস্তির মাঝখানে যে ছোট্ট পুকুর দেখে এসেচি তার জল হ'লে আমাদের জল ব্যবহার স্থগিত রাখতে হ'ত।

—আপনারা আটা খাবেন, না ছাতু ?

—যা আপনাদের সুবিধে হয়। তবে আটাই বোধহয়—

—আচ্ছা, আচ্ছা বাবুজি। আপনারা চুপ করে বসে বিশ্রাম করুন—আমি সব বন্দোবস্ত করে দিচ্চি। ওরা আমাদের জন্যে রাঁধবার বন্দোবস্ত করে দিলে। সে এক-হিসেবে ভালো বলেই মনে হ'ল আমাদের কাছে। নিজের চোখে জিনিসগুলো দেখে ধুয়ে বেছে তবুও নিতে পারা যাবে।

এদের আতিথ্য অত্যন্ত আন্তরিক ও উদার—এদের সারল্য অন্তরকে স্পর্শ না করে পারে না—কেবল মনে হয়, যদি কেউ এদের স্বাস্থ্যের বিধি-নিষেধগুলো বলে দেওয়ার থাকতো !

আমরা পাশের একটা ছোট চালায় রান্না চড়ালুম। গ্রামের লোকে অনেকে এসে উঁকিঝুঁকি দিয়ে দেখতে লাগলো আমাদের রান্না। আলু ও লাউয়ের তরকারি আর আটার রুটি। চাটনির জন্যে ছিল চুকো পালং কিন্তু আমরা চাটনি কি করে রাঁধতে হয় জানিনে। হেমেন বললে তার অনেক হাঙ্গাম, সুতরাং চাটনি রান্না বন্ধ রইল। দুজনে পরামর্শ করে

অতিকষ্টে লাউয়ের তরকারি নামালুম। এদের কাছে ধরা না পড়ি যে, আমরা রান্না জানি না।

কথাবার্তা চললো খাওয়া-দাওয়ার পরে। এই অঞ্চলের পল্লীজীবনের অনেক তথ্য সংগ্রহ করা গেল ওদের কাছ থেকে। গ্রামের সব লোকই চাষী—গম ও ভুট্টা এই দুটি প্রধান ফসল। অধিবাসীরা সবাই হিন্দু, তার মধ্যে অধিকাংশ দোশাদ অর্থাৎ মেথর, বাকি সকলে কুর্মি—একঘর রাজপুত। লেখাপড়া বিশেষ কেউ কিছু জানে না, ব্যবসা-বাণিজ্য কেউ করে না, বেশিদূর কেউ যায়নি কখনো গ্রাম ছেড়ে। আমাদের গৃহস্বামী ওদের মধ্যে কিছু এলেমদার—জমিজমা-সংক্রান্ত মামলাতে সে গ্রামসুদ্ধ লোকের পরামর্শদাতা ও দলিললেখক। মামলা-সংক্রান্ত ব্যাপারে সে বারকয়েক মুঙ্গের ও পাটনা গিয়েচে।

এদের প্রধান খাদ্য আটার রুটি ও মকাইয়ের ছাতু। তরকারির মধ্যে জন্মায় রামতরুই, পটল, বেগুন, কয়েকপ্রকারের শাক, সকরকন্দ আলু। গোল আলু ও কপি এ অঞ্চলে জন্মায় না—ওসব দুর্মূল্য সৌখীন তরকারি এরা নাকি তত পছন্দও করে না।

প্লেগ গত দুতিন বৎসর দেখা দেয়নি—তার বদলে দেখা দিয়েছিল কলেরা। অনেক লোক মরেছিল।

আমরা বললুম—ডাক্তার নেই এখানে?

—না বাবু, কিউল থেকে আনতে হয়—তা অত পয়সা খরচ করে সবাই তো পারে না।

—কলেরার সময় কি করো?

—গতবার গভর্নমেণ্ট থেকে একজন ডাক্তার পাঠিয়েছিল।

এই ধরনের বহু অশিক্ষিত পল্লী নিয়ে বিহার ও বাংলা। শহরে বাস করে জাতির দুঃখদুর্দশা জানা সম্ভব নয়। বাংলা ও বিহারের বহুস্থান এখনও

মধ্যযুগের আবহাওয়ায় নিশ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করে—কি শিক্ষায়, কি মতামতে, কি জীবিকার্জনের প্রণালীতে। উড়িষ্যার একটি নিভৃত পল্লী-অঞ্চল একবার দেখবার সুযোগ ঘটেছিল সেখানেও এইরকমই দেখেচি। তবে আমার মনে হয়েচে বিহারী পল্লীবাসীরা বেশি অপরিচ্ছন্ন, উড়িষ্যা-বাসীদের অপেক্ষা। উড়িয়া গৃহস্থের বাড়িঘর গোবর-মাটি দিয়ে বেশ লেপামোছা, লোকগুলিও এত অপরিষ্কার নয়। উড়িষ্যার পল্লীগ্রামের কথা পরে বলচি।

আমরা বেলা তিনটের সময় গোকর্ণটোলা থেকে কাজরা স্টেশনের দিকে রওনা হই, বৃদ্ধ গৃহস্বামী গল্প করতে করতে প্রায় এক মাইল রাস্তা আমাদের সঙ্গে এল। আমরা তাকে বার বার বলে এলুম বিদায় নেবার সময়, ভাগলপুরে মামলা করতে আসে যদি কখনো, তবে যেন আমাদের বাসায় এসে ওঠে।

সন্ধ্যার সময় কাজরা থেকে ট্রেন ছাড়লো।

একদিন দুপুরের ট্রেনে আমি ভাগলপুর থেকে গৈবীনাথ দেখতে গেলাম।

সুলতানগঞ্জ স্টেশন থেকে প্রায় আধমাইল কি তার কিছু কম হেঁটে গঙ্গাব ধার। সেখানে এক নৌকো করে গৈবীনাথ যেতে হয়—কারণ গৈবীনাথ একটা ছোট পাহাড, সোজা গঙ্গাগর্ভ থেকে উঠেচে। পাহাড়ের ওপর গৈবীনাথ শিবেব মন্দির।

আমি যেদিন গিয়েছিলুম, সেদিন ওখানে লোকের যাতায়াত ছিল কম। রেলের ধারে বলে, গৈবীনাথে প্রায়ই শনি বা রবিবার লোকজনের ভিড় একটু বেশিই হয়ে থাকে। ঋষ্যশৃঙ্গের আশ্রম যত ভালো জায়গায় হোক, অতদূর রাস্তা আর বনজঙ্গলের মধ্যে বলে সেখানে বড একটা কেউ যেতে চায় না, যদিও কিউল থেকে জামুই আসবার সময় বাঁ-দিকে যে পাহাড়শ্রেণী

ও জঙ্গল দূরে দেখা যায়—ওই হ'ল ঋষ্যশৃঙ্গ আশ্রমের সেই পাহাড়—কিন্তু ই আই রেলওয়ের মেন লাইনের কোনো স্টেশনে নেমে সেখানে যাবার রাস্তা নেই—লুপ লাইনের কাজরা স্টেশন ছাড়া।

মস্ত বড় একটা তীর্থস্থান না হ'লে, যে কষ্টটা হবে তার অনুপাতে পুণ্য কতখানি অর্জন করে আনতে পারা যাবে, সেটা খতিয়ে না বুঝে—শুধুমাত্র প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখবার লোভে লোকে অত কষ্ট স্বীকার করে না।

ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির আশ্রম অত প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান নয়। কে শুনেচে ওর নাম?

কিন্তু গৈবীনাথে যাতায়াতের সুবিধে খুব—স্টেশন থেকে দুপা হাঁটলেই হ'ল। গঙ্গাগর্ভে পাহাড়, তার ওপরে শিবমন্দির—এর কাছে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির আশ্রম-টাশ্রমের তুলনা হয়? বিশেষ করে, যেখানে যেতে হয় জঙ্গলের মধ্যে তেরো মাইল রাস্তা ভেঙে? গৈবীনাথ মন্দিরে আমি আরও দুবার গিয়েচি, একবার আমার ভগ্নী জাহ্নবী ও আমার ভাই নুটু সঙ্গে ছিল—ভাগলপুরের প্রসিদ্ধ উকিল দেবতাবাবুও সেবার ছিলেন আমাদের সঙ্গে।

প্রথমদিন একা গিয়ে যে অনুভূতি ও আনন্দ পেয়েছিলুম—ঠিক সে ধরনের মানসিক অভিজ্ঞতা অন্য অন্য বার হয়নি।

আমি গিয়ে প্রণাম করে বললুম—বাবাজী, আশীর্বাদ করুন।

সাধু হিন্দীতে বললেন—বেঁচে থাকো বাবা।

—আপনি এখানেই থাকেন?

—না, মাস-দুই এসেচি—

—তবে কোথায় থাকেন?

—কন্যা-কুমারিকা থেকে উত্তরে বদরী-বিশাল পর্যন্ত সব তীর্থস্থানেই আমার যাতায়াত। তেরো বার বদরী-বিশাল গিয়েচি। আমাদের আসবার কি ঠিক আছে কিছু। এখন এখানেই আছি।

পুরুষমানুষ না হ'লে সন্ন্যাসী সেজে লাভ? এঁকেই বলি প্রকৃত সাধু। এঁর কাছে ঋষ্যশৃঙ্গ আশ্রমের সে সন্ন্যাসিনী কিছুই নয়। ঢাকের কাছে টেমটেমি!

ভক্তিতে আমি আপ্লুত হয়ে পড়লাম।

সাধুজী আমায় বললেন—ঘর কোথায়?

—কলকাতায়।

—ব্রাহ্মণ?

—জী হাঁ।

সত্য কথা বলবো, সাধুবাবা আমার কাছে এক পয়সাও চান নি। আমি একটি সিকি তাঁর পায়ের কাছে রাখলাম। তিনি সেটা হাতে তুলে নিয়ে কোথায় যেন রেখে দিলেন। মুখের ভাব দেখে মনে হ'ল আমার প্রতি যথেষ্ট প্রসন্ন হয়েচেন।

সাধুজী বেদান্তের ব্যাখ্যা আরম্ভ করে দিলেন—মায়া কি, অধ্যাত্ম কি, ইত্যাদি। আমার সে সব শুনবার আগ্রহের চেয়েও তাঁর মুখে তাঁর ভ্রমণকাহিনী শুনবার আগ্রহই ছিল প্রবলতর। কিন্তু সাধুজীর মনে কষ্ট দিতে পারলুম না—আধঘণ্টা ধরে চুপ করে বসে বেদান্তব্যাখ্যা শুনবার পরে আমি তাঁর কাছে বিদায় নিয়ে আবার মন্দিরের পিছনে একখানা পাথরের ওপরে এসে বসলুম। তখন সূর্য অস্ত যাচ্চে। রক্ত সূর্যাস্তের আভা পড়েচে গঙ্গার বুকের বীচিমালায়, গৈবীনাথের মন্দিরচূড়ার ত্রিশূলের গায়ে, এপারের গাছপালায়। জামালপুরের মারফ পাহাড় পশ্চিম আকাশের কোলে নীল মেঘের মতো দেখাচ্চে।

গৈবীনাথের মন্দিরের ঠিক নিচে পাহাড়ের গায়ে একটা ছোট গুহা আছে, সেটাও দেখে এসেচি। তার মধ্যে এমন কিছু দেখবার নেই। তবে এই রকম রক্তাভ অপরাহ্নের আকাশতলে পাহাড়ের ওপরে পা ঝুলিয়ে

গঙ্গায় এবং গঙ্গার অপর-তীরবর্তী সুবিস্তীর্ণ চরভূমির দিকে চোখ রেখে নিরিবিলি বসে থাকায় বিরল সৌভাগ্য ঘটেছিল বলেই গৈবীনাথ -তীর্থদর্শন আমার সফল হয়েছিল।

কতক্ষণ বসে থাকবার পরে হঠাৎ কখন জলে চাঁদের প্রতিবিম্ব উজ্জ্বলতর হয়েচে দেখে চমক ভাঙলো। সন্ধ্যার কিছুক্ষণ পরে ট্রেন—সেবার যে ট্রেনে কাজরা থেকে এসেছিলাম ভাগলপুরে।

এদিকে মনে প্রবল বাসনা রাত্রিটা এখানে থাকলে ভালো হয়।

অগত্যা সাধুবাবাজীর কাছেই আবার গেলাম। তিনি শুনে বললেন—মন্দিরের মোহান্তজীকে একবার বলে দেখ। আমি তোমাকে বড়জোর একখানা কম্বল দিতে পারি, অন্য কিছুই নেই আমার।

মোহান্তজীকে গিয়ে ধরলাম। আমার আবেদন শুনে তিনি বোধ হয় একটু বিস্মিত হয়েছিলেন—বললেন—থাকবার অন্য জায়গা নেই—রাতে মন্দির বন্ধ থাকে, পাশের বারান্দায় থাকতে পারো। কিন্তু তোমার সঙ্গে বিছানা আছে ?

—কিছু নেই, তবে সাধুজী একখানা কম্বল দেবেন বলেচেন।

—এখানে গঙ্গার বুকে রাত্রে বেশ শীত পড়বে, খোলা বারান্দায় শুয়ে থাকতে পারবে ?

—খুব। ও আমার অভ্যেস আছে। আপনি থাকবার অনুমতি দিলেই হয়।

—থাকো—কিন্তু খাবে কি ?

—কিছু দরকার নেই।

—তোমার খুশি।

কিন্তু সেখান থেকে জ্যোস্নারাত্রে গঙ্গার তরঙ্গভঙ্গ দেখা আমার অদৃষ্টে ছিল না—সাধুজীর কাছে আবার ফিরে গিয়ে দেখি মুঙ্গেরের এক শেঠজি

সেখানে বসে। আমার প্রস্তাব শুনে শেঠজি আমায় প্রতিনিবৃত্ত করবার চেষ্টা করতে লাগলেন। তিনিও স্টেশনে যাবেন, তাঁর এক্কা এসে আছে গঙ্গার ধারে —এখানে রাত্রে থাকবার জায়গা নয়, ভীষণ শীত করবে, বিশেষ করে সন্ন্যাসীর কম্বল নিলে ওঁর বড় অসুবিধে হবে রাত্রে।

আসল কথা পরে বুঝেছিলাম—সন্ধ্যার পরে গঙ্গার ধার থেকে সুলতানগঞ্জ স্টেশন পর্যন্ত পথটি খুব নিরাপদ নয়। বেশি দূর নয় যদিচ, তবু দু একটা রাহাজানি হয়ে গেছে ইতিপূর্বে। শেঠজীর কাছে কিছু টাকা ছিল, তিনি একজন সঙ্গী খুঁজচেন।

সাধুজির সামনে শেঠজি কম্বলের কথা প্রথমে বলেননি—আমায় আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন—আপনি কম্বল নিলে সাধুজি শীতে জমে যাবেন রাত্রে। উনি বুড়ো মানুষ—নেবেন না ওঁর কম্বল। আপনি চলুন আমার সঙ্গে।

একথা আমার আগে কেন মনে হয়নি ভেবে বেশ একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়লাম।

তারপর দুজনে এসে নৌকোয় চড়ে তীরে নামলাম। এক্কা দাঁড়িয়ে ছিল। ট্রেন আসবার অল্প সময় যখন বাকি, তখন এক্কাওয়ালা আমাদের স্টেশনে পৌঁছে দিল।

গৈবীনাথ আরও যে-দুবার গিয়েছি, তখন এমন নির্জন ছিল না স্থানটি—এবারকারের মতো আনন্দ পাইনি আর সেখানে।

এই সঙ্গে আরও একটি দেবমন্দিরের কথা বলি। আমার খুব ভালো লাগতো জায়গাটি—যদিও স্থানীয় গ্রাম্য লোক ছাড়া সেখানে অন্য লোক কখনও যায়নি।

থানা বিহিপুর স্টেশন থেকে ছ'-সাত মাইল দূরে পর্বতা বলে একটি গ্রাম আছে। আমাকে একবার কি কাজে সেখানে যেতে হয়েছিল

—স্থানটি উত্তর-বিহারের অন্তর্গত, সুতরাং বাংলাদেশের মতো অনেকটা শ্যামল প্রকৃতির। এক জায়গায় পথের ধারে এমন নিবিড় বৃক্ষরাজির সমাবেশ যে, সত্যিই বাংলাদেশে আছি বলে ভ্রম হয়। সময় ছিল তুপুরের কিছু পরে। আমি গাছতলায় একটুখানি বিশ্রাম করচি, এমন সময়ে রামশিঙা বেজে উঠলো কোনো দিকে।

আমার সামনে দিয়ে তু-তিনটি গ্রাম্য লোক পেতল ও কাঁসার কানা-উঁচু থালা হাতে বনের ওপারে কোথায় যাচ্চে দেখে তাদের একজনকে বললুম—কোথায় শিঙে বাজচে হে?

একজন আঙুল তুলে দেখিয়ে বললে—রামজীর মন্দিরে। নদীর ধারে—আমরা সেখানে প্রসাদ আনতে যাচ্চি—ভোগের সময় শিঙে বাজে রোজ।

আমিও ওদের সঙ্গে গেলাম। নদীর স্থানীয় নাম বুটল নদী—আমাদের কাটিগঙ্গার খালের চেয়ে যদি কিছু বড় হয়। তার ধারে অতি সুন্দর স্থানে আশ্রম ও দেবমন্দির। মন্দিরের কারুকার্য সাধারণ গ্রাম্য স্থপতির পরিকল্পিত, এই একই গড়নের মন্দির উত্তর-পূর্ব বিহারের প্রায় অনেক গ্রামেই দেখতে পাওয়া যায়।

ক্ষুদ্র মন্দির, কিন্তু মন্দিরসংলগ্ন জমি আছে অনেকটা—নদীর ধারে সুন্দর ফুলবাগান, সমস্ত স্থানটি ভারি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন।

একজন বৃদ্ধ মোহান্ত মন্দিরে থাকেন, তিনি আমায় প্রসাদ খেতে আহ্বান করলেন। আমি দ্বিরুক্তি না করে সম্মতি জানালাম। তিনি আমাকে আদর করে ডেকে নিয়ে গিয়ে বসালেন।

আমি বললাম—এ মন্দির কতদিনের?

—অনেক দিনের বাবা, আমিই তো এখানে আছি পঁচিশ বছর।

—কে স্থাপন করেছিল মন্দিরটি?

—দ্বারভাঙার মহারাজ তাঁর জমিদারী বেড়াতে এসে এই জায়গাটি বড়

পছন্দ করেন, শুনেচি তিনিই মন্দির করে দিয়েছিলেন। বিগ্রহের দেবোত্তর সম্পত্তি আছে, ওঁদেরই দান।

—আয় কতো হবে ?

—বছরে তিন-চারশো টাকা, তবে ঠিকমতো আদায় হয় না সব বছর, লোকজনের প্রণামী ও মানত ইত্যাদির আয়েও কিছুটা ব্যয়নির্বাহ হয়।

আমার জন্যে খাবার এল সরু আতপ চালের ভাত, অড়রের ডাল ও কি একটা তরকারি, এসব দিকে বাংলাদেশের মতো দু'তিন রকম আনাজ মিশিয়ে ব্যঞ্জন রন্ধনের পদ্ধতি প্রচলিত নেই—আলু তো শুধু আলুরই তরকারি, বেগুন তো শুধু বেগুনেরই তরকারি। সে তরকারি বাঙালীর মুখে ভালো লাগে না—কিন্তু ডাল এত চমৎকার রান্না হয় যে বাংলাদেশে ক্বচিৎ তেমনটি মেলে।

মোহান্তজীর মুখে শুনলাম দুবেলা প্রায় পঞ্চাশজন অতিথি-অভ্যাগত ও দরিদ্র গ্রাম্যলোক ঠাকুরের প্রসাদ পায়। দুটি বৃদ্ধ শিষ্য আছে মোহান্তজীর, তারাই রান্না করে দুবেলা। কোনো মেয়ে, তা সে যে-বয়সেরই হোক, আশ্রমে রাখবার নিয়ম নেই। বিহারের নির্জন পল্লীপ্রান্তে পর্বতের এই মন্দির মনে একটি উজ্জ্বল নবীনতা ও পরম শান্তির সৃষ্টি করে; এর স্বল্পায়োজনমাধুর্য মনকে এমন অভিভূত করে যে অনেক বৃহৎ আয়াস তার ত্রিসীমানায় পৌঁছুতে পারে না।

সন্ধ্যার সময়ে যখন আশ্রম থেকে চলে আসি, তখন মোহান্তজী আমার সঙ্গে কথা বলতে বলতে অনেক দূর এলেন।

তাঁর বিশেষ আগ্রহ দেখলাম মন্দিরের আয় বাড়ানোর দিকে—অবিশ্যি নিজের স্বার্থের জন্যে নয়—গ্রামের অনেক গরিব লোক দুবেলা এখানে প্রসাদ পেয়ে থাকে, আরও কিছু আয় বাড়লে আরও বেশি লোককে খাওয়াতে পারতেন।

মোহান্তজী প্রকৃতই অতি সদাশয় ব্যক্তি এবং বালকের মতো সরল। তাঁর ধারণা এ ধরনের একটা সৎকাজের কথায় যে-কেউ টাকা দিতে রাজি হবে। শুধু মুখের কথা খসাবার অপেক্ষা মাত্র।

তাঁর সরলতা দেখে আমার হাসি পেল। বললুম—মোহান্তজী, আপনি একবার ভাগলপুরে আসুন না, আপনাকে দু-এক জায়গায় পাঠিয়ে দেবো, আপনি নিজেই বুঝবেন কে কেমন দিচ্চে।

চাঁদ উঠেছিল।

চারধারে ফাঁকা মাঠ, মাঝে মাঝে ছোট ছোট ঢিবির ওপর ক্ষুদ্র বন, দূরে দূরে সিসম্ গাছ—বিহারের সিসম্ গাছ একদিকে একটু হেলে থাকে—অনেকগুলো থাকে এক সারিতে। যাকে শিশু গাছ বলে, সে সম্পূর্ণ আলাদা গাছ, যদি-চ সিসম্ গাছের কাঠেও বেশ মজবুত তক্তা হয় শুনেচি।

মোহান্তজী বললেন—বাবু, মনে থাকবে আমার কথা?

—খুব থাকবে, তবে আপনি নিজে না এলে কিছু করতে পারবো না।

হঠাৎ আমায় মোহান্তজী বললেন—আসুন, আপনার সঙ্গে পাঁড়েজীর আলাপ করিয়ে দিই।

মাঠের মধ্যে এক জায়গায় অনেকগুলো চালাঘর দেখা গেল। কাছাকাছি অন্য কোনো বাড়ি নেই। দূরে নিকটে অনেকগুলি সিসম্ গাছের সা'র।

আমি একটু ইতস্তত করলাম যেতে, কারণ স্টেশনে গিয়ে আমায় ট্রেন ধরতে হবে। মোহান্তজী আমার কোনো আপত্তি শুনলেন না—পরে অবিশ্যি বুঝলাম তিনি আমায় পাঁড়েজীর আশ্রমে রাত্রে রাখবার জন্যে সেখানে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন এবং সেই উদ্দেশ্যেই আমার সঙ্গে সঙ্গেও আসছিলেন। মোহান্তজী বাড়ির কাছে গিয়ে ডাক দিতেই একজন লোক বার হয়ে তাঁকে হাসিমুখে প্রণাম করে বললে—আসুন বাবাজী, ইনি কে?

—ইনি ভাগলপুরের বাংগালি বাবু—আশ্রমের অতিথি—

—আস্থন বাবুজি, আমার বড সৌভাগ্য—উঠে এসে বস্থন।

বেশ জ্যোৎস্না উঠেছিল। চারিদিকে চেয়ে দেখি বাড়ির উঠানে এবং ঘরের দাওয়ায় বড় বড জালায় ও হাঁড়িতে কি সব রক্ষিত আছে—কিসের একটা তুর্গন্ধ বেরুচ্ছে চারিদিকে। বাড়িতে আমরা একেবারে ভেতরের উঠোনেই গিয়ে হাজির হয়েচি—পাঁড়েজী একাই থাকেন বলে মনে হ'ল, বাড়িতে কোনো মেয়েমানুষ নেই। বাড়িটা কিসের একটা কারখানা। কিসের কারখানা ভালো বুঝতে পারছিলুম না সন্ধ্যার অস্পষ্ট জ্যোৎস্নালোকে।

বাড়ির মধ্যেকার উঠানে আরও অনেক বড় বড হাঁড়ি-কলসী, সে-গুলিতেও কি যেন বোঝাই রয়েচে। সেই এক ধরনের উৎকট গন্ধ। কিসের কারখানা এটা ?

হঠাৎ আমার মনে হ'ল বে-আইনি মদের চোলাইখানা নয় তো ? কিন্তু মোহান্তজীর মতো সাধুপুরুষ কি এমন একটা ব্যাপারের সঙ্গে যোগ রাখবেন ?

আমাকে চারিদিকে সন্দেহ ও বিস্ময়ের চোখে চাইতে দেখেই বোধহয় পাঁড়েজী (ওর নাম শ্রীরাম পাঁড়ে) বললে—কি দেখচেন বাবুজি ?

আমি সঙ্কোচের সঙ্গে বললাম—না, ওই কলসীগুলোতে কি তাই দেখচি।

পাঁড়েজী হেসে বললে—কি বলুন তো ?

—আমি ঠিক বুঝতে পারচিনে—কিসের একটা গন্ধ বার হচ্চে—

—আচ্ছা, কাছে গিয়ে দেখুন না বাবুজি—

প্রত্যেক কলসীতে সাদা সাদা কি জিনিস, তুধের মতো। কিন্তু এত তুধ কি হবে এখানে, আর সন্ধ্যাবেলায় এত তুধ কলসীতেই বা কেন ? তুধ কি রাত্রিবেলা খোলা উঠানের মধ্যে ফেলে রাখে ?

মোহান্তজীও কৌতুকপূর্ণ হয়ে বললেন--কি বাবুজি, কি দেখলেন ?

পাঁড়েজী বললে—বাবু, ও সব কলসীতে ঘোল বুঝতে পারলেন না ?

এত ঘোলের কলসী একত্র কখনো জীবনে দেখিনি। কি করে বুঝতে পারবো ? কিন্তু এত ঘোল এল কোথা থেকে ?

ওদের ঘরের দাওয়ায় আমাদের জন্যে জলচৌকি পেতে দিলে শ্রীরাম পাঁড়ে। আমরা বসলুম—তারপরে মোহান্তজীর মুখে ব্যাপারটা শোনা গেল, এটা মাখনের ও ঘিয়ের কারখানা।

দুধ অত্যন্ত সস্তা এসব অঞ্চলে, টাকায় ষোলসের পর্যন্ত বিক্রী হতে দেখেচি, মহিষের দুধ বরং একটু চড়া দরে বিক্রী হয়, কারণ ঘি করবার জন্যে মহিষের দুধ গোয়ালারা কেনে, কিন্তু গোরুর দুধের দাম নেই এখানে—গোরুর দুধের মাখন ও ঘি করবার রেওয়াজ নেই এখানে।

শ্রীরাম পাঁড়ের বাড়ি ছাপরা জেলায়। সে এক মাখন-তোলা কল নিয়ে এসে এই মাঠের মধ্যে প্রথম একখানা চালাঘর তুলে বসে—সে আজ এগারো বছর পূর্বের কথা।

এই এগারো বছরের মধ্যে শ্রীরামের ব্যবসা এত বড হয়ে উঠেচে যে ওকে মাঠের মধ্যে অনেকখানি জমি নিয়ে ঘিরে বড় বড দুখানা আটচালা ঘর, আর ছোট ছোট চালাঘর অনেকগুলি করতে হ'ল, মাখন-তোলা কল আরও দু'টো এনেচে। তার ব্যবসা খুব জোর চলেচে।

আমার বড় ভালো লাগলো মোহান্তজীর এই গল্প। শ্রীরাম পাঁড়েকে আমি যেন নতুন চোখে দেখলুম। লোকটা খুব নিরীহ ধরনের, মুখে বেশি কথা বলে না—বোধহয় কথা বলে না বলেই কাজ বেশি করে।

—আপনার এখানে কত দুধ লাগে রোজ ?

—তার কিছু ঠিক নেই বাবুজি—পনেরো মণ দুধের মাখন সাধারণত

হয়, তবে এক-একদিন হয়তো বিশ বাইশ মণ দুধ এল। তিনটে কল হিমসিম খেয়ে যায়।

—কলসীতে অত ঘোল কিসের? ওতে কি হবে?

—রোজ পনেরো বিশ মণ দুধের ঘোল তো সোজা নয় বাবু। এত ঘোল সব আমি রেলে চালান দিই। পূর্ণিয়া অঞ্চলে ওর খুব বিক্রী। পড়তে পায় না বাবু।

—মাসে কত ঘি হয় তোমার কারখানায়?

—আমি ঘি তত করিনি বাবু, মাখন চালানিতে লাভ বেশি। বেশি দুধ হ'লে খোয়া ক্ষীর করি। তবে চারমণ ঘি মাসে চালান দিই।

—কত লোক খাটে?

দুধ সংগ্রহ করে আনবার জন্যে আট-দশ জন লোক রাখতে হয়েচে। ওরা রোজ ভোরে উঠে গ্রাম থেকে দুধ নিয়ে আসে। গোয়ালারা নিজেরাও দুধ দিয়ে যায়—সব দাদন দেওয়া আছে। তা ছাড়া কারখানায় আরও দশ বারো জন লোক খাটে। ছাপরা জেলা থেকে এসে এই অজ পাড়াগাঁয়ে বসে লোকটা অত্যন্ত সামান্য মূলধন নিয়ে এই ব্যবসা আরম্ভ ক'রে এখন বেশ উন্নতি করে তুলেচে—ওর কথা থেকে ক্রমে ক্রমে বুঝতে পারা গেল। আমি ভাবলাম আমার দেশের বেকার যুবকদের কথা, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি নিয়ে বার হয়ে সামান্য ত্রিশ চল্লিশ টাকা মাইনের কেরানিগিরি জোগাড় করতে পারলে আমরা জীবন ধন্য মনে করি—দুঃখের বিষয় তাও জোটে না। আমাদের মধ্যে দেশবিদেশে গিয়ে নিজেকে অন্যভাবে প্রতিষ্ঠা করার কল্পনাই জানে না—তাই আমাদের দুঃখ।

শ্রীরাম পাঁড়ে রাত্রে আমায় থাকতে বললে। মোহান্তজীও বললেন—বাবুজি, আমার ওখানে থাকবার জায়গা নেই ভালো—সেইজন্যে এখানে আনলাম। মন্দিরে আপনাদের দরের অতিথি এলেই পাঁড়েজীর বাড়িতে

রাখি। পাঁড়েজী বড ভালো লোক। রাত্রে কোথায় যাবেন—এখানেই থাকুন।

আমারও এত ভালো লেগেছিল পাঁড়েজীকে, তখুনি রাজি হয়ে গেলাম। এর এই ব্যবসার কথা ভালো করে জেনে গিয়ে বাংলা দেশের বেকার যুবকদের যদি একটা পথ দেখিয়ে দিতে পারি, মন্দ কি ?

রাত্রে আমার জন্যে উৎকৃষ্ট ঘিয়ে তৈরী পুরী আর হালুয়া, কি একটা তরকারি আর গরম দুধ এনে হাজির করলে পাঁড়েজির রাঁধুনি ব্রাহ্মণ। সে ধরনের ঘিয়ে তৈরী খাবার বাংলাদেশে আমি কখনো চোখেও দেখিনি, পশ্চিমেও নয়—কেবল আর দু-একটা জায়গা ছাড়া।

পাঁড়েজীকে বললাম—ভাগলপুরের বাজারেও তো এমন ঘি মেলে না ? কি চমৎকার গন্ধ! ভঁয়সা ঘি কি এমন হয় ? পাঁড়েজি হেসে বললে—কোথায় পাবেন বাবুজি, ঘি যা বাজারে আপনারা পান, তা হ'ল পাইল করা, অর্থাৎ অন্য বাজে ঘি বা চর্বি মেশানো। ভেজাল ভিন্ন ঘি বাজারে নেই জানবেন, যে যত বিজ্ঞাপনই দিক। তবে কোনো ঘিয়ে কম কোনো ঘিয়ে বেশি ভেজাল—এই যা তফাৎ। আর এ হ'ল আমার কারখানায় সদ্য তৈরী খাঁটি ভঁয়সা। এ কোথায় পাবেন বাজারে ?

মোহান্তজীও আমার সঙ্গে ভোজনে বসেছিলেন। দেখলুম যদিও তাঁর বয়স হয়েচে—কিন্তু আমার মতো তিনটি লোকের উপযুক্ত পুরী, তরকারি ও হালুয়া অবাধে উদরসাৎ করলেন। মোহান্তজীকে আমার বড ভালো লাগলো, এমন নিরীহ সজ্জন মানুষ খুব কম দেখা যায়।

এক এক জায়গায় এক এক ধরনের মানুষের ছাঁচ থাকে—অন্যত্র তা পাওয়া যায় না। আমার মনে হয়, বাংলার বাইরে আমি নিছক নিরীহ, সরল ও ভালোমানুষ লোকের যে ছাঁচ দেখেচি, বাংলাদেশে তা দেখিনি।

হয়তো ঠিক ব্যাপারটা বোঝাতে পারচিনে—কিন্তু একথা খুব সত্যি,

বাংলার অতি অজ্ঞ পাড়াগাঁয়েও লোকের খানিকটা কুটিল বুদ্ধি, খানিকটা আত্মসম্মান-জ্ঞান, খানিক চালাক-চতুরতা আছে। এসব থাকলেই আর লোক নিছক সরল টাইপের হ'ল না। তা মেয়েদের কথাই বা কি, আর পুরুষদের কথাই বা কি। এর কারণ বাঙালীর মধ্যে অতিনির্বোধ লোক নেই বললেই হয়—ওদের অনেকখানি জন্মগত শিক্ষা-দীক্ষা আছে—তাতে সংসারের অনেক ব্যাপারে ওদের অভিজ্ঞতা আপনা-আপনি হয়—রেলে বা স্টীমারে এক স্থান থেকে আর এক স্থানে যাতায়াতের বেশি সুবিধে বাংলাদেশে। তা থেকেও লোকে অনেক বাইরের জ্ঞান সঞ্চয় করতে পারে।

বাংলাদেশে আমি খুব নিরীহ লোক ভেবে যার কাছে হয়তো গিয়েছি, দেখেছি সে আসলে অনেক কিছু জানে বা বোঝে—ফলে তার মনের নিছক সারল্য নষ্ট হয়ে গিয়েচে। কিন্তু বাংলার বাইরে আমি আশ্চর্য ধরনের সরল ও নিরীহ লোক দেখেচি—তাদের শিশুসুলভ সারল্য কতবার আমাকে মুগ্ধ করেচে। আমি আমার জীবনে এ-ধরনের সরল লোক খুঁজে বেড়িয়েছি—আমার আবাল্য ঝোঁক ছিল এদিকে, মানুষের টাইপ খুঁজে বার করবো। আমার অভিজ্ঞতা দ্বারা দেখেছি বিহার ও সি-পিতে, ছোট-নাগপুরে, এই সরল টাইপটা বেশ পাওয়া যায়। এখনও পাওয়া যায়। তবে আজকাল নষ্ট হয়ে যেতে বসেচে।

মানুষের মনকে বর্তমান সভ্যতা ও শিক্ষা একটা কলের ছাঁচে গড়চে। সব এক ছাঁচ, রামও যা ভাবে শ্যামও তাই ভাবে, যদু, মধুও তাই ভাবে। যে আর একজনের মতো না ভাবে—তাকে লোকে মূর্খ বলে, অশিক্ষিতও বলে—সুতরাং সমাজের ভয়ে, লোকনিন্দার ভয়ে, শ্বশুরবাড়িতে শালী-শালাদের শ্রদ্ধা হারাবার ভয়ে—লোকে অন্য রকম ভাবতে ভয় পায়। ফলে শিল্পে, সাহিত্যে, সামাজিক রীতিনীতিতে একই ছাঁচের মনের পরিচয়

পাওয়া যায় সর্বত্র, অনেক খুঁজেও খাঁটি ওরিজিন্যাল টাইপ বার করা যায় না। শহরে তো যায়ই না, শহর থেকে সুদূরে, নিভৃত পল্লীঅঞ্চলেও বড় একটা দেখা যায় না। তবে বাংলার বাইরে, যেখানে ইউনিভারসিটি, খবরের কাগজ, রেডিও প্রভৃতির উৎপাত নেই, কিংবা শিক্ষিত লোকের যাতায়াত কম, এমন আরণ্য অঞ্চলে—নিকটে যেখানে রেলস্টেশন বা মোটর বাসের চলাচলের পথ নেই—সেখানে দু-একটি অতি চমৎকার ছাঁচের মানুষ দেখেচি।

এদের আবিষ্কারের আনন্দ আমার কাছে একটা নতুন দেশ আবিষ্কারের আনন্দের সঙ্গে সমান। মোহান্তজী অনেকটা সেই ধরনের মানুষ।

তিনি রাত্রে মন্দিরে ফিরে যাবার আগে আমায় বিশেষ অনুরোধ করলেন আমি যেন আমার ভাগলপুরস্থ বন্ধুবান্ধবকে বলে তাঁর মন্দির মেরামতের ও মন্দিরের আয় বাড়াবার একটা ব্যবস্থা করে দিই। অনেকখানি সরল আশা-ভরসা তাঁর চোখে-মুখে—বহু দূরকালের ছায়া তাঁর জীবনে একটি এমন স্নিগ্ধ পরিবেশ রচনা করেচে—তা থেকে হুঁশিয়ার ও হিসাব-দুরন্ত বর্তমানে তিনি কোনোদিনই যেন পৌঁচতে পারবেন না, কোনোদিনই বুঝবেন না এর কুটিলতা, আর আত্মস্বার্থবোধ।

আমি বললুম—মোহান্তজী, আপনি চলে আসুন না ভাগলপুরে?

—আপনি যেতে বললেই যাবো, টাকা একসঙ্গে জড় হ'লে নিয়ে আসব গিয়ে।

তারপর আমায় একান্ত চুপিচুপি বললেন—এই পাঁড়েজী আমায় বড় সাহায্য করে—

—কি রকম?

—ভদ্রলোক এলে ওর এখানে রাখি, ও আমাকেও মাঝে মাঝে রাত্রে

এখানে খাওয়ায়, বেশ খাওয়ায়—দেখলেন তো? ওর নিজের কারখানার ঘি মাখন—বাইরে কোথায় এমন পাবেন বলুন। রামচন্দ্রজী ওকে আরও দেবেন, বড় সাত্ত্বিক লোক।

যে নিজে সাত্ত্বিক সে সবাইকে এমনি সাত্ত্বিক ভাবে। আমরা নিজেরাও তত সাত্ত্বিক নই বলেই বোধ হয়, মানুষের খারাপ দিকটা আগে দেখে বসে থাকি।

শ্রীরাম পাঁড়ে সাত্ত্বিক কি না জানি না—কিন্তু সে বেশ ব্যবসা-বুদ্ধি-ওয়ালা লোক বটে। দুধ এখানে সস্তা, অথচ দুধ চালান দেবার সুবিধে নেই। একটা মাখন তোলা কল নিয়ে এই গ্রামকে কেন্দ্র করে বেশ একটা ঘি মাখনের ব্যবসা গড়ে তুলেচে। এর কারণ আমাদের মতো ওদের চাকুরি-প্রবৃত্তি নেই—চোখ ওদের অন্যদিকে বেশ খোলে—আমরা এসব দেখতে পাইনে। আমরা হ'লে খুঁজতাম দ্বারভাঙ্গার মহারাজের স্টেটে কোনো চাকুরি জোগাড় করা যায় কাকে ধরাধরি করলে।

পরদিন সকালে আমি ওদের দুজনের কাছে বিদায় নিয়ে চলে এলুম। এর পরে আর একবার আমাকে বিশেষ কাজে ওদিকে গিয়ে শ্রীরাম পাঁড়ের আতিথ্য গ্রহণ করতে হয়েছিল, তখন সে আরও উন্নতি করেচে—লেখা-পড়ার হিসেব ও চিঠিপত্র লেখবার জন্যে একজন গোমস্তা রেখেচে। মোহান্তজীর সঙ্গেও সাক্ষাৎ হয়েছিল—মাত্র একটি দিনের জন্যে। তখন সামনে কুম্ভমেলার সময়, তিনি প্রয়াগে কুম্ভমেলায় যাবার তোড়জোড় করছিলেন, পাঁড়েজীকে নিয়ে যাবেন সঙ্গে বললেন। আমাকেও তিনি অনুরোধ করেছিলেন মেলায় যাবার জন্যে—অবিশ্যি আমার যাওয়া ঘটেনি। তাঁরা গিয়েছিলেন কিনা আমি জানি না—আর তাঁদের সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। এ হ'ল ১৩৩৬ সালের মাঘ মাসের কুম্ভমেলা, তারপর আর কুম্ভমেলা হয়নি এখনো পর্যন্ত।

১৩৩৭ সালের কথা। পূজার ছুটি সেইদিনই হ'ল।

ভাগলপুরে বার লাইব্রেরিতে বসে কথাবার্তা চলচে বন্ধুদের সঙ্গে, ছুটিতে কোথায় যাওয়া যায়। আমি বললুম—পায়ে হেঁটে কোনোদিকে যদি যাওয়া যায়, আমি রাজি আছি।

প্রবীণ উকিল অবিনাশবাবু বললেন—হেঁটে যাওয়ার বেশ চমৎকার রাস্তা আছে, চলে যান না দেওঘর। সিনারি খুব ভালো।

আমি তখনি যে'তে রাজি। একজন মাত্র উকিল-বন্ধু অম্বিকা আমার সঙ্গে যেতে চাইলে। পরদিন সকালে আমরা আমার থাকবার জায়গা থেকে রওনা হলুম খুব ভোরে। তিন-চারজন উৎসাহী বন্ধু ভাগলপুর শহর ছাড়িয়ে দেওঘরের পথে প্রথম মাইল-পোস্ট পর্যন্ত আমাদেব এগিয়ে দিয়ে গেলেন।

অম্বিকা খুব সুস্থ সবল, দীর্ঘাকৃতি যুবক। সে ও আমি তুজনেই খুব জোবে হাঁটচি। সাত আটটা মাইল-পোস্ট পযন্ত বেশ জোরে চলে এলুম তুজনে। বেলা প্রায় দশটা বাজে।

ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের চওড়া সোজা রাস্তা। পথের তুধারে সবুজ ধান ক্ষেত, মাঝে মাঝে বৃষ্টির জল বেধে আছে—তাতে কুমুদ ফুল ফু'টে আছে—গাছের ছায়া সমস্ত পথেই।

আরও তু তিন মাইল ছাড়ালুম। তুজানেবই ক্ষুধা ও তৃষ্ণা তুই-ই পেয়েচে —সঙ্গে কোনো ব্যবস্থা নেই—হাঁটবার সুবিধে হবে বলে খালি হাতে পথ চলচি।

পথের ধারে মাঝে মাঝে দেহাতী গ্রাম—সেখানে বিশেষ কিছু খাবার পাওয়া যায় না আমরা জানি—সন্ধান করলে হয়তো চিঁড়ে পাওয়া যেতে পারে বড়জোর।

অম্বিকা বললে—চলো, আগে গিয়ে কোথাও রান্না করে খাওয়া যাবে—

—রান্না করবার জিনিসপত্র তো চাই—তাই বা কোথায় পাবো ?

—চলো যা হয় ব্যবস্থা হবেই।

ব্যবস্থার কোনো চিহ্ন নেই কোনো দিকে। সুদীর্ঘ সোজা পথ, গ্রাম দু-তিন মাইল অন্তর। পুরেনি বলে একটা গ্রাম রাস্তার ধারেই পড়লো—এখানে একটা ডাকঘর আছে, দু-চারখানা দোকান—কিন্তু দোকানের খাবার দেখে কিনতে প্রবৃত্তি হ'ল না আমাদের।

পুরেনি ছাড়িয়ে মাইল-খানেক গিয়েচি, এক জায়গায় পথের ওপর অনেকগুলো কুলি খাটচে—খোয়া ভাঙচে। তাদের কাছে একখানা এক্কা দাঁড়িয়ে। একজন বিহারী ভদ্রলোক কুলিদের তদারক করচেন পায়চারি করতে করতে। আমাদের অদ্ভুত বেশ দেখেই বোধহয় তাঁর দৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট হ'ল। দুজনেরই পরনে খাকীর হাফ-প্যাণ্ট, গায়ে সাদা টুইলের হাতকাটা শার্ট, মাথায় সোলার টুপি, পায়ে হাঁটু পর্যন্ত উলের মোজা ও বুট জুতো। তার ওপর আবার দুজনেরই চোখে চশমা, হাতে হাতঘড়ি।

এ ধবনে সেজেগুজে বিহারের অজ পল্লীপথে চললে লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট না কবে পারে না। পথে দেখে এসেচি প্রত্যেক বস্তির লোক আমাদের দিকে হাঁ করে চেয়ে চেয়ে দেখচে—পুরেনি বাজারে তো লোকে আমাদেব দিকে আঙুল দেখিয়ে কি বলাবলি করেচে।

আর কিছু না হই, আমরা যে পুলিশের দারোগা এ ধারণা অনেকেরই হয়েচে সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ।

ভদ্রলোক বাংলায় জিজ্ঞেস করলেন—আপনারা কোথায় যাবেন ?

ওঁর মুখে বাংলা শুনে আমরা একটু আশ্চর্য না হয়ে পারলুম না। ওঁর চেহারা অবিকল দেহাতী বিহারী ভদ্রলোকের মতই। ভাগলপুর শহর

থেকে বারো মাইল দূরে বাঙালীর সঙ্গে এই ধরনের সাক্ষাৎ বড় একটা আশাও করা যায় না।

—মশায় কি বাঙালী ?

—আজ্ঞে, আমার নাম রামচন্দ্র বসু—এই নিকটেই চেরো বলে গ্রাম আছে, ওখানেই আমার বাড়ি।

—এখানে বাড়ি করেচেন ? কতদিন হবে ?

—আমার বাস এখানে প্রায় পনেরো বছর হ'ল—তার আগে আমরা কহলগাঁও থাকতাম। আপনারা কোথায় যাবেন ?

আমাদের গন্তব্যস্থানের কথা শুনে ভদ্রলোক ভাবলেন আমরা পদব্রজে বৈদ্যনাথ ধামে তীর্থ করতে যাচ্ছি। বললেন, তা বেশ। আপনাদের বয়সে তো ওসব মানেই না। এসব দেখলেও আনন্দ হয়। তা এবেলা আমার এখানে আহার করে তবে যাবেন।

আমাদের কোনো আপত্তি ছিল না এ প্রস্তাবে। বোধহয় একটু বেশি সহজেই রাজি হয়েছিলাম।

রামবাবুর বাড়ি গিয়ে, তাঁরা যে প্রবাসী বাঙালী, সেটা ভালো করেই বুঝলাম; ছেলেমেয়েরা ভালো বাংলা বলতে পারে না, কিন্তু দেহাতী হিন্দী বলে বিহারীদের মতই! তাঁদেব বাড়িতে যত্ন আদর আমরা পেলাম কতকালের আত্মীয়ের মতো, রাত্রে থাকবার জন্যে কত অনুরোধ করলেন। আমাদের থাকলে চলে না, যেতে হবে অনেক দূর—পায়ে হেঁটে যাবো বলে বেরিয়ে এত আরাম করবার ইচ্ছে ছিল না মোটেই।

একটা জিনিস তাঁদের বাড়ি খেয়েছিলাম—কখনো ভুলতে পারা যাবে না, করমচার অম্বল। রান্নার গুণে নয়, করমচার অম্বল জীবনে তার আগেও কখনো খাইনি, তারপরেও না, সেই জন্যে।

আমরা আবার যখন পথে উঠলাম, তখন বেলা আড়াইটের কম নয়। শীতের বেলা, ঘণ্টা-দুই হাঁটবার পরে রোদ একেবারে পড়ে গেল।

ডিস্ট্রিক্টবোর্ডের রাস্তা সোজা তীরের মতো নাকের সামনে বহুদূর পর্যন্ত চলে গিয়েচে। দু-ধারে ধূ-ধূ করচে জনহীন প্রান্তর, ডাইনে অনেক দূরে মারফ পাহাড নীল মেঘের মতো দেখা যায়—সূর্য ক্রমে পাহাডের পেছনে অস্ত গেল। সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসচে, তখনও রাস্তার দুধারে মাঠ আর মাঠ। অম্বিকা এদেশের লোক। তাকে বললুম—কোথায় থাকবো রাত্রে হে? গ্রামের চিহ্ন তো দেখচিনে—

অম্বিকাও কিছু জানে না। সে এদিকে কখনো আসেনি।

আবও কিছুদূর গিয়ে আমবাগানের আড়ালে একটা বস্তি দেখা গেল—কতকগুলো খোলার ঘর এক জায়গায় তাল পাকানো, এদেশের ধরনে। ঘোর অপরিষ্কার। জিগ্যেস্ করে জানা গেল, বস্তির নাম রজাউন। একজন লোককে বলা গেল এখানে রাত্রে থাকবার কোথাও একটু স্থান হবে কি না; তারা বললে কাছারি-বাড়িতে দুখানা চারপাই আছে, বিদেশী লোক এলে কাছারি-বাড়িতে থাকে।

কাছারিবাড়ির অবস্থা দেখে আমরা পরস্পরের মুখের দিকে চাইলাম। ঘোডার আস্তাবলও এব তুলনায় স্বর্গ। একটা ভাঙা খোলার ঘর, তার চাল পড়েচে ঝুলে, বাইরের দাওয়ায় দুখানা চারপায়া আছে বটে, কিন্তু তাতে শোওয়া চলে না। কাছারিঘরের মধ্যে এত জঞ্জাল যে সেখানে রাত্রিযাপনের চেষ্টা করলে সর্পাঘাত অবশ্যম্ভাবী। আমরা বললাম—আর কোথাও জায়গা নেই?

—না বাবু, নিজেদের তাই থাকবার জায়গা হয় না—গরিব লোকের বস্তি, আপনাদের জায়গা দেবে কোথায়?

পড়ে গেলাম বেজায় মুশকিলে। সন্ধ্যা হয়েচে, সপ্তমীর জ্যোৎস্না

মাঠ-ঘাট আলো করেচে, নিকটে আর কোনো বস্তিও দেখা যায় না—এখন কি করি ?

একজন আমাদের অবস্থা দেখে বললে—বাবু, আপনারা থানায় যান। বস্তির পশ্চিম দিকে আধ মাইলের মধ্যে একটা বাগান দেখবেন, তার ওপারে থানা। সেখানে থাকবার জায়গা মিলতে পারে।

থানা খুঁজে বার করলুম। থানার দারোগা আরা জেলার লোক, মুসলমান। তাঁর আতিথ্য আমরা কখনো ভুলবো না। আমরা তাঁকে বললাম, আমরা কিছু খাবো না, শুধু একটু আশ্রয় চাই।

তিনি বললেন, তা কখনো হয় না। আমার হেড-কনস্টেবল ব্রাহ্মণ, তাকে দিয়ে রান্না করাবো, আপনাদের কোনো আপত্তির কারণ নেই।

আমরা বললাম—সেজন্যে নয়, আপনার বাসা থেকে রেঁধে পাঠালেও আমাদের কোনো আপত্তি হবে না জানবেন। ভদ্রলোক শুনলেন না। হেড কনস্টেবলকে দিয়ে পুরী-তরকারি আর হালুয়া তৈরি করিয়ে দিলেন—নিজের বাসা থেকে সের-খানেক জ্বাল দেওয়া দুধ পাঠিয়ে দিলেন।

আহারাদির পরে আমাদের জন্যে বিছানা আনিয়ে দিলেন বাসা থেকে। আমাদের সঙ্গে খানিকক্ষণ বসে গল্প করলেন—তারপর আমাদের বিশ্রাম করতে বলে বাসায় গেলেন।

আমরা খুব ভোরে উঠে রওনা হবো বলে রাত্রেই তাঁর নিকটে বিদায় নিয়ে রেখেছিলাম। সূর্য ওঠবার আগেই পথে বেরিয়ে পড়লুম।

মাইল আট নয় দূরে বাঁকা—ভাগলপুরের একটা মহকুমা। এক জায়গায় দুটো রাস্তার মোড, কেউ বলে দেওয়ার লোক নেই কোন্ রাস্তা বাঁকায় গিয়েচে। আমরা আন্দাজ করে নিয়ে অনেকখানি পথ চলে এসেচি, তখন একজন পথিকের সঙ্গে দেখা হওয়ায় জিগ্যেস্ করলুম ঠিক

পথে চলেচি কি না। সে বললে বড্ড ঘুর-পথে যাচ্চেন বাবুজি, এই মাঠের মধ্যে দিয়ে যান, শীগগির পৌঁছোবেন।

তার কথা শুনে মাঠের রাস্তায় নেমে আমরা আরও ভুল করলাম। পথ ভীষণ খারাপ, চষা-মাটির ওপর দিয়ে আল ডিঙিয়ে, খানা-ডোবা পার হয়ে মাইল-তিন এসে আমার দুই পায়ে ফোস্কা পড়লো, আমি আর হাঁটতে পারিনে—অথচ এদিকে দিগন্তবিস্তীর্ণ প্রান্তর সামনে, একটা গোটা টাউন তো দূরের কথা, একখানা খোলার ঘরও নেই মাঠের কোনো দিকে।

আমি বললাম—আর হাঁটতে পারচিনে অম্বিকা—

অম্বিকা ভরসা দিলে, আর একটু পরেই আমরা বাঁকা পৌঁছে যাবো এবং সেখানে ওর এক উকিল-বন্ধুর বাড়ি আশ্রয় নিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

আরও দু-ঘণ্টা হাঁটবার পরে আমি একটা গাছতলায় বসে পড়লাম। আমার চলবার শক্তি লুপ্ত হয়েচে। আমিই হেঁটে দেশ-বিদেশ বেড়াবার বড় উৎসাহ দেখিয়েছিলাম, আমার প্ররোচনাতেই অম্বিকা আমার সঙ্গে হেঁটে বেড়াবার জন্যে বার হয়েচে, এখন দেখা গেল আমি একেবারে হাঁটতে পারিনে, মুখে যত বলি কাজে তার কিছুই করবার সাধ্য নেই আমার।

অম্বিকা পড়ে গেল বিপদে।

সে এখন আমায় নিয়ে কি করে? বেলা প্রায় একটা বাজে। আমায় সে ঘাড়ে করে নিয়ে যেতে পারে না বাঁকা পর্যন্ত, অথচ সত্যিই পা ওঠাবার শক্তিটুকুও নেই আমার।

আমি বললাম—অম্বিকা, বাঁকা থেকে একখানা গাড়ি নিয়ে এস গিয়ে, আমি এখানেই থাকি।

অম্বিকা যেতে রাজি নয়। আমায় এ অবস্থায় ফেলে সে কোথাও

যাবে না। তার চেয়ে আমি বসে বিশ্রাম করি, যদি এর পরে আমি হাঁটতে পারি—সে আমার সঙ্গে এখানেই থাকবে।

বেলা আড়াইটের সময় আমি কিছু সুস্থ হয়ে পুনরায় হাঁটতে আরম্ভ করলাম। অম্বিকা ঘড়ি দেখে বললে, বেলা ঠিক আড়াইটে—এক ঘণ্টার মধ্যে বাঁকা পৌঁছে যাবো।

আরও দেড় ঘণ্টা চলে গেল, বাঁকার চিহ্ন নেই কোনো দিকে।

আমি বললাম—শর্ট কাট্ করতে গিয়ে এই বিপদটি বাধলো। সোজা ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা দিয়ে গেলে কোন্ কালে বাঁকা পৌঁছে যেতাম।

বেলা যখন বেশ পড়ে এসেচে, তখন আমরা বাঁকা পৌঁছে গেলাম। সেখানে জিগ্যেস্ করে জানা গেল মাঠের মধ্যে আমরা ভুল পথ ধরেছিলাম, তাই আমাদের এত বিলম্ব। যে ভদ্রলোকের বাড়ি আমরা গিয়ে উঠলাম, তাঁরাও বাঙালী কিন্তু অনেকদিন বিহারে বাস করবার ফলে একেবারে বিহারী হয়ে গিয়েচেন। ছেলে-মেয়েরা এখন ভালো বাংলা বলতে পারে না। তাঁদের আদর-যত্ন মনে রাখবার জিনিস বটে। রাত্রে আমাদের জন্যে তাঁরা পুরীতরকারি করে দিলেন, আহারান্তে শয্যা আশ্রয় করে মনে হ'ল তিন দিনের মধ্যে আমি আর বিছানা ছেড়ে উঠতে পারবো না।

অম্বিকাকে বললাম—দেওঘর যাওয়া এখানেই ইতি। আমি একা করে কাল সকালে মান্দার হিল যাবো, সেখান থেকে ট্রেনে ভাগলপুর। পায়ে হেঁটে বেড়ানোর শখ আমার মিটেচে।

অম্বিকা আমায় নানারকমে বোঝাবার চেষ্টা করে। এখন ভাগলপুর ফিরলে লোকে কি বলবে, কত জাঁক করে বেরুনো হয়েচে ভাগলপুর থেকে, তুমিই সকলের চেয়ে জোরগলায় চেঁচিয়েছিলে যে পায়ে হেঁটে ভ্রমণ সব ভ্রমণের সেরা। তোমার এই শোচনীয় পরাভবে—ইত্যাদি।

আমি নাছোড়বান্দা। শরীরের সামর্থ্যে না যদি কুলোয়, আমি কি করবো।

আমার এক পা হাঁটবার ক্ষমতা নেই আর। বন্ধুর বকুনি শেষ হবার পূর্বেই আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। কিন্তু ভোরে উঠে দেখি যে আমার পায়ের ব্যথা অদ্ভুত ও অপ্রত্যাশিতভাবে সেরে গিয়েচে। এদিকে আমার বন্ধু চা পান শেষ করে বললেন—তাহ'লে একখানা এক্কা ডাকি, এইবেলা মান্দার হিলে রওনা হওয়া যাক।

আমি বললাম, আর মান্দার হিলে যাওয়ার প্রয়োজন নেই, হাঁটতে পারবো এখন, চলো রওনা হই।

দুজনে আবার পথে উঠলাম।

সবে সূর্যোদয় হচ্চে—ডানদিকে কাঁকোয়ারা স্টেটের অনুচ্চ শৈলশ্রেণী, মাঝে মাঝে শালবন। প্রভাতে মুক্ত বায়ুতে জীবনের জয়গান ঘোষণা করচে। পথের নেশায় মন প্রাণ উত্তেজিত হয়ে উঠেচে—কোথায় মান্দার হিল আর কোথায় ভাগলপুর। প্রায় ছ'মাইল পথ হাঁটবার পরে একটা ছোট্ট পাহাড়ী নদী পার হ'তে হ'ল। উপলরাশির উপর দিয়ে ঝির ঝির করে নির্মল জলের ধারা বয়ে চলেচে। নদীর দুপাড়ে ছোট ছোট কি ঝোপে সুন্দর ফুল ফুটেচে।

নদী পার হয়ে আরও মাইল-পাঁচেক পথ হেঁটে এসেচি; একজন বিহারী ভদ্রলোক আমাদের পাশ দিয়ে টমটম চড়ে যেতে যেতে আমাদের দেখে গাড়ি থামালেন।

আমার বন্ধুকে নমস্কার করে হিন্দীতে বললেন—আপনি কোথা চলেচেন এ ভাবে?

অম্বিকা বললে—বেশ ভালো আছেন নদীয়াচাঁদবাবু? নমস্কার। দেওঘর চলেচি—

—পায়ে হেঁটে? মান্দার হিল থেকে?

—সোজা ভাগলপুর থেকে। কাল বাঁকাতে রাত কাটিয়েচি—ইনি আমার বন্ধু অমুক—ইনিও যাচ্চেন—

ভদ্রলোক টমটম থেকে নেমে পড়লেন। আমাদের দুজনকে বিশেষ অনুরোধ করলেন তাঁর টমটমে উঠতে। আমার বন্ধু ও আমি দুজনেই বিনীতভাবে বললুম, যখন হেঁটে চলেচি, শেষ পর্যন্ত হেঁটেই যাবো। কেউ দেখচে না বলে এখানে খানিকটা গাড়িতে উঠে শেষে ভাগলপুরে ফিরে পায়ে হেঁটে যাওয়ার বাহাদুরি নেওয়া—আমাদের ধাতে সইবে না।

তিনি বললেন—তীর্থ করতে যাচ্চেন নাকি?

আমরা তাঁকে আশ্বস্ত করলাম। পুণ্য অর্জনের লোভ নেই আমাদের। যাচ্চি এমনিই—শখ।

তিনি বললেন—খাওয়া-দাওয়া করবেন এবেলা আমার ওখানে। জামদহ ডাকবাংলোতে আমি কাছারি করবো এবেলা। আমি আগে চলে যাই, কিছু মনে করবেন না। আপনাদের পথের ধারেই পড়বে জামদহ বাংলো। সেখানে আপনাদের পৌঁছতে আরও ঘণ্টা-দুই লাগবে। আমি লোক দাঁড় করিয়ে রাখবো।

ভদ্রলোক টমটমে উঠে গেলেন।

অম্বিকা বললে—উনি বাবু নদীয়াচাঁদ সহায়। লছমীপুর স্টেটের ম্যানেজার। বড় ভালো লোক। আমার সঙ্গে খুব আলাপ আছে। ভালোই হ'ল, দুপুর ঘুরে গেলে আমরা জামদহ পৌঁছবো, সেখানে খাওয়া-দাওয়া করা যাবে এখন।

বেলা প্রায় বারোটার সময়ে আমরা দূর থেকে একটা শালবন দেখতে

পেলুম পথের ধারেই। অম্বিকা বললে, ওর মধ্যেই জামদহ ডাকবাংলো—নদীয়াচাঁদবাবু বলেছিলেন। আমাদের জন্যে পথের ওপর লোক দাঁড়িয়ে ছিল। সে আমাদের বাংলোতে নিয়ে গেল।

নদীয়াচাঁদবাবু অনেক প্রজা নিয়ে কাছারি করচেন। আমাদের যথেষ্ট অভ্যর্থনা করলেন। বনের মধ্যে একটা ইঁদারা, তার চারিদিকে সিমেণ্ট বাঁধানো—আমরা সেখানে স্নান করে ভারি তৃপ্তি পেলাম।

আহারাদির পরে নদীয়াবাবু বললেন—এখানে এই বনের মধ্যে আমায় তিন দিন থাকতে হবে। আপনারা যখন এসেচেন, তখন একটা রাত অন্তত আমার এখানে কাটিয়ে যান। আজ আর আপনাদের কিছুতেই ছাডচিনে।

আমাদের কোনো আপত্তি তিনি শুনলেন না। লোকটি বিশেষ ভদ্র ও শিক্ষিত, তাঁর অনুরোধ এডানো আমাদের পক্ষে সম্ভব হ'ল না।

শালবনের নিস্তব্ধতার মধ্যে কি সুন্দর বৈকাল আর জ্যোৎস্নারাত্রি কাটলো! মন একেবারে মুক্ত, পথের নেশায় মাতাল, কতদূর এসে পড়েচি পরিচিতের সীমা ছাড়িয়ে—এমন একটি সুন্দর রাত্রি জীবনে আর হয়তো না-ও মিলতে পারে। নদীয়াবাবু আমাদের কাছে বসে বসে গল্প-গুজব করলেন অনেকক্ষণ। কথায় কথায় বললেন—আপনারা যদি এসেচেন এ পথে, তবে লছমীপুর দেগে যান একবার। চমৎকার দৃশ্য ওখানকার। আপনারা খুশি হবেন।

—এখান থেকে কতটা হবে?

—প্রায় সাত মাইল—তবে পাকা সডক ছেড়ে অন্য রাস্তায় যেতে হবে—জঙ্গল পডবে খুব।

রাত্রে শুয়ে আমি বন্ধুকে বললুম—জেলাবোর্ডের রাস্তা ছেড়ে দিয়ে চলো আমরা আগে লছমীপুর দেখে আসি।

বন্ধু আপত্তি করলে। সে শুনেচে লছমীপুর ছাড়িয়েই দশ-বারো মাইল বিস্তৃত জঙ্গল, সে পথে হেঁটে যাওয়া বড় বিপজ্জনক, আমাদের যাওয়া উচিত হবে না।

আমি তার কাছে আরাকান ইয়োমার জঙ্গলের কথা বললুম। তার চেয়ে বেশি জঙ্গল আর কি হবে। লছমীপুরের প্রাকৃতিক দৃশ্যের কথা ভাগলপুরে থাকতে অনেকের মুখে শুনেচি। এতদূর যখন এসেচি, লছমীপুর দেখে যাওয়াই ভালো।

অনেক রাত পর্যন্ত কথা-কাটাকাটির পরে অম্বিকাকে রাজি করানো গেল। পরদিন খুব ভোরে উঠে আমরা নদীয়াচাঁদবাবুর কাছে বিদায় নিয়ে লছমীপুর রওনা হবার জন্যে বাঁ-দিকের বনপথ ধরলুম।

তখন সবে সূর্য উঠেচে। সত্যিই পথটির দৃশ্য চমৎকার। এই প্রথম রাঙা মাটি চোখে পড়লো—উঁচুনিচু জমি, শাল ও পলাশ গাছের সারি, মাঝে মাঝে দু একটা বট গাছ। নানা জায়গায় বেড়িয়ে আমার মনে হয়েচে, বট গাছ যত বেশি বনে, মাঠে, পাহাড়ের ওপর অযত্নসম্ভূত অবস্থায় দেখা যায়, অশ্বত্থ তেমন নয়। বাংলার বাইরে, বিশেষ করে এই সব বন্য অঞ্চলে অশ্বত্থ তো আদৌ দেখেচি বলে মনে হয় না—অথচ কত বন-প্রান্তরে কত পাহাড়েয় মাথায়, সঙ্গিহীন সুপ্রাচীন বট বৃক্ষ ও তার মাথায় শাদা শাদা বকের পাল যে দেখেচি, তাদের সংখ্যা নিতান্ত তুচ্ছ হবে না।

দক্ষিণ-ভাগলপুরের এই অঞ্চলের জমি গঙ্গা ও কুশীর পলি-মাটিতে গড়া উত্তর ভাগলপুরের জমি থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এদিকের ভূমির প্রকৃতি ও উদ্ভিদ্-সমাবেশ সাঁওতাল পরগনার মতো, তেমনি কাঁকরভরা, রাঙা, বন্ধুর—শুধু শাল ও মউল বনে ভরা, ঠিক যেন দেওঘর মধুপুর কি গিরিডি অঞ্চলে আছি বলে মনে হয়। বেলা প্রায় ন'টার সময় দূর থেকে একটা মন্দিরের চুড়ো দেখা গেল—কিন্তু চুড়োটা যেন পথের সমতলে অবস্থিত। অম্বিকা

বললে—ওই লছমীপুর। আমি জানি রাজবাড়ির কালীমন্দির খুব বড়, ওটা তারই চূড়ো।

কিন্তু মন্দিরের চূড়ো পথের সমতলে কি করে থাকে, আমরা দুজনে প্রথমটা বুঝতে পারিনি—বুঝলুম যখন আমরা লছমীপুরের আরও নিকটে পৌঁছেচি।

লছমীপুর একটা নিম্ন উপত্যকার মধ্যে অবস্থিত, চারিদিক থেকে পথ-গুলা ঝরনার মতো নিচের দিকে নেমে পড়েচে উপত্যকার মধ্যে। আমাদের পথ ক্রমশ নিচে নামচে, দুধারের শাল বন আরও নিবিড় হয়ে উঠেচে, অথচ কোনো ঘরবাড়ি চোখে পড়ে না—কেবল সেই মন্দিরের চূড়োটা আরও বড় ও স্পষ্ট দেখাচ্চে।

একটা জায়গায় এসে হঠাৎ নিচের দিকে চাইতেই অনেক ঘরবাড়ি একসঙ্গে চোখে পড়ল।

সত্যই ভারি সুন্দর দৃশ্য।

বনজঙ্গলে ভরা একটা খুব নাবাল জায়গায় এই ক্ষুদ্র গ্রামটির ঘরবাড়ি যেন ছবির মতো সাজানো। গ্রামের ঠিক মাঝখানে একটা সেকেলে ধরনের পুরোনো ইঁটের বাড়ি ও সেই মন্দিরটা।

অম্বিকা বললে—ওই রাজবাড়ি নিশ্চয়।

নদীয়াচাঁদবাবু স্থানীয় কোনো এক কর্মচারীর নামে একখানা পত্র দিয়েছিলেন আমাদের সম্বন্ধে, যার বলে আমরা রাজবাড়ির অতিথিশালায় স্থান পেলাম। অতিথিশালাটি বেশ বড়, খোলার ছাদওয়ালা চারপাঁচটি কামরাযুক্ত বাড়ি। দড়ির চারপাই ছাড়া ঘরগুলিতে অন্য কোনো আসবাব নেই।

এখানে একটি অদ্ভুত বেশভূষাধারী যুবককে দেখে আমরা দুজনেই কৌতূহলী হয়ে পড়লুম তার সঙ্গে আলাপ করবার জন্যে। যুবকটির বয়স

ত্রিশের মধ্যে, রং মিশ্‌কালো, মাথায় লম্বা লম্বা বাবরি চুলে কেয়ারি করে টেরি কাটা, গায়ে শাদা ফুলদার আদ্দির পাঞ্জাবি, গলায় রঙীন রুমাল বাঁধা—আর সকলের চেয়ে যা আমাদের চোখে বিস্ময়কর ঠেকলো, তা হচ্চে এই যে, এই দিন-দুপুরে লোকটার পকেটে একটা পাঁচ ব্যাটারির প্রকাণ্ড টর্চ। বাঙালী নয় যে, তা বুঝতে এতটুকু দেরি হয় না।

অম্বিকা বললে—লোকটাকে কিসের মতো দেখাচ্চে বলো তো? ঠিক যেন যাত্রাদলের বড় কেষ্টঠাকুর, মাথায় চাঁচর চিকুর, মায় বাঁশিটা পর্যন্ত হুবহু—না?

---ডেকে নাম জিগ্যেস্ কর না?

কিছু পরেই আমরা অতিথিশালার ম্যানেজারের কাছে যুবকটির পরিচয় পেলুম। সে রাজার শ্যালক, এখানেই সামান্য কিছু কাজ করে রাজ-স্টেটে, বেশ আমুদে লোক---আর নাকি খুব ভালো নাচতে জানে।

আমরা যুবকটির সঙ্গে আলাপ করলাম। আমাদের খুব ভালো লাগলো লোকটিকে। লেখাপড়া বিশেষ কিছু জানে না, কিন্তু বেশ বুদ্ধিমান যে, তা কথাবার্তা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়।

আমি বললাম---আপনার পৈতৃক দেশ কোথায়?

—রাজ খর্সাওন—বি, এন, আর-এ—তবে এখানেই আছি আজ দশ বছর।

---এই বনের মধ্যে বেশ ভালো লাগে আপনার?

—খুব শিকার মেলে কিনা! আপনারা থেকে যান, ভালুক শিকার করতে যাবো।

—ভালুক খুব আছে নাকি?

—এই যে বন দেখচেন, ভালুক আর সম্বর হরিণ এত আছে যে অনেক সময় দিনমানেও লছমীপুর গ্রামের মধ্যে ঢুকে এসে পড়ে। আপনারা

পায়ে হেঁটে যাবেন না বনের মধ্যে দিয়ে—বড় বিপজ্জনক। আমি ঘোড়া দিচ্চি তুজনকে, সঙ্গে শিকারী গাইড্ দেবো, তবে যাবেন।

আমরা বললুম, হেঁটে যখন যাবো ঠিক করেচি—তখন ঘোড়ায় চড়বো না, সেটা ঠিকও হবে না।

যুবকটি ভেবে বললে—তীর্থ করতে যাবেন বলে কি আর একটু ঘোড়ায় চড়তে নেই? বন কতখানি আপনারা জানেন না– বড় দেরি হয়ে যাবে বন পার হতে, যদি পায়ে হেঁটে যান।

—কত বড বন আপনার মনে হয়?

—দশ বারো মাইল খুব হবে, লছমীপুরের জঙ্গল দক্ষিণ ভাগলপুরের বিখ্যাত জঙ্গল। ঘোড়ায় যদি না যান, তবে একজন গাইড্ সঙ্গে নিয়ে যান।

যুবক উঠে চলে গেলে আমরা তুজনে পরামর্শ করে ঠিক করলুম সঙ্গে লোক নেওয়াবও ’কানো দরকার নেই। ওতে আমাদের বাহাতুরি অনেক-খানি কমে যাবে।

অতিথিশালাব ম্যানেজার বললেন—আপনাদের খাবার-দাবার সব তৈরী। যদি বেরুতেই হয়—তবে আপনারা আর বেশি দেরি করবেন না—কারণ জঙ্গল পা'র হ'তে খুব সময় নেবে।

আহাবাদির পর অম্বিকা বললে—একবার রাণীমার সঙ্গে দেখা না করে যাবো না হে। একবার আলাপ কবে রাখি, পরে কাজ দেবে। তুমিও চল না—আলাপ করা যাক। দরকার অন্য কিছু নয়, উকিল মানুষ, এত বড স্টেটের কর্ত্রীর সঙ্গে আলাপ রাখলে স্টেটের মামলা-মোকদ্দমাগুলো পাবার দিক থেকে অনেক সুবিধে।

লছমীপুর গাটোয়ালী স্টেট্। বার্ষিক আয় খুব বেশি না হ'লেও নিতান্ত মন্দ নয়। অম্বিকা বলেছিল তু-লাখ টাকা; অত যদিও ন' হয়, লাখ-খানেকের কম নয় নিশ্চয়ই। বন থেকেই এদের আয় বেশি। বনের

খানিকটা অংশ লাক্ষা-ব্যবসায়ীদের ইজারা দেওয়া হয়, তা বাদে কাঠ ও সম্বর হরিণের শিং আর ছাল বিক্রী করেও যথেষ্ট আয় হয়।

আমরা কালীবাড়ি দেখতে গেলাম। একটি বৃদ্ধ বাঙালী ব্রাহ্মণ এখানকার পূজারী, পুত্র-পরিবার নিয়ে আজ প্রায় ত্রিশ বৎসর লছমীপুরে বাস করচেন। তাঁর বাড়ি ছিল নদীয়া জেলার মেহেরপুর সবডিবিসনে, এখনও তাঁর জ্ঞাতিবর্গ সেখানেই আছে, পৈতৃক বাড়িও আছে, তবে সেখানে এঁদের যাতায়াত নেই বহুকাল থেকে।

আমরা বললুম—এখানে আর কোনো বাঙালী আছেন?

—পূর্বে দুজন বাঙালী ছিলেন স্টেটের কাছারিতে, এখন আর নেই।

—আপনার কোনো অসুবিধে হয় না থাকতে?

—এখন আর হয় না, আগে আগে খুবই হ'ত। কি করি বলুন, পেটের দায়ে সবই করতে হয়। এখানে বছরে চার-পাঁচ শো টাকা পাই—বাড়িভাড়া লাগে না, কিছু জমি-জায়গীরও দেওয়া আছে স্টেট থেকে। মরে গেলে বড় ছেলেটাকে বসিয়ে দিয়ে যাবো। ওকে সংস্কৃত পড়তে পাঠিয়েচি নবদ্বীপে ওর মামার বাড়িতে। এক মস্ত অসুবিধে মেয়ের বিয়ে দেওয়া, এখান থেকে হয় না।

—সময় কাটান কি ক'রে এখানে?

—নিজের কাজ করি, একটা টোল খুলেচি, ছাত্র পড়াই। পাঁচ ছ'জন ছাত্র আছে—তার জন্যে স্টেট থেকে বৃত্তি পাই।

অম্বিকার কাছে ইতিমধ্যে রাজবাড়ি থেকে খবর এল, রাণীমা এইবার পূজা সেরে উঠেচেন, এখন দেখা হ'তে পারে।

অম্বিকা দেখা করতে গেল এবং আধঘণ্টার মধ্যেই বেশ হাসিমুখে ফিরে এল। বললে—রাণীমা বড় ভালো লোক, উনি আমাকে স্টেটের কাজ দিতে চেয়েচেন। খুব খাতির করেচেন আমায়।

—এইবার চলো বেরিয়ে পড়া যাক। বেলা ত্নটো বাজে, অত বড় বন পার হতে হবে তো!

—আমি জেলাবোর্ডের রাস্তা দিয়ে যাবার কথা বলছিলুম—

—নিশ্চয়ই তুমি বনের কথায় ভয় পেয়ে গিয়েচ—না?

—রাণীমা বলছিলেন বনে অনেক রকম বিপদ আছে। তবে তুমি না ছাড়ো, অগত্যা বনের পথেই যেতে হয়।

লছমীপুর ছেড়ে আমরা খানিকটা চড়াই পথে উঠেই হঠাৎ একেবারে জঙ্গলের মধ্যে এসে পড়লাম। জঙ্গল খুব নিবিড় নয়, প্রধানত কেঁদ, শাল ও পিয়াল গাছ বেশি বনের গাছের মধ্যে। ঝোপ জিনিসটা বিহারে কোথাও দেখিনি এই জঙ্গল ছাড়া।

শরতের শেষ, অনেক রকম বনের ফুল ফুটে আছে, অধিকাংশই অজানা—বাংলা দেশের পরিচিত বনফুল একটাও চোখে পড়লো না কেবল শিউলি ফুল ছাড়া। ত্ন-একটা ছাতিম গাছও দেখা গেল তবে তাদের সংখ্যা নিতান্ত কম।

বনের মধ্যে পায়ে চলার একটা পথ কিছু দূর পর্যন্ত পাওয়া গেল। হঠাৎ এক জায়গায় গিয়ে পথটা তিনটি পথে ভাগ হয়ে তিন দিকে চলে যাওয়াতে আমরা প্রমাদ গনলাম। সঙ্গে গাইড নেওয়া যে কেন উচিত ছিল, তখন খুব ভালো বুঝলাম। আমাদের চারিধারে শুধু গাছপালা আর বন-ঝোপ—শুধু বনস্পতির দল আকাশের দিকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে—আমাদের মাথার ওপর বনগাছের ফাঁকে ফাঁকে শরতের নীল আকাশ। কোনো লোকালয় নেই, একটা লোক নেই যে তাকে জিগ্যেস করি পথের কথা।

মনে একটা অদ্ভুত আনন্দ এল হঠাৎ কোথা থেকে।

ঘরে বসে সে আনন্দ কোনোদিন কখনো পাওয়া যায় না। অম্বিকাও দেখলুম পথের নেশায় মাতাল হয়ে উঠেচে। ও বললে—চলো চোখ বুজে

যে পথে হয়, না হয় সন্ধ্যা পর্যন্ত বনের মধ্যে ঘুরবো, রাত হয় গাছের ওপরে উঠে কাটিয়ে দেওয়া যাবে।

আন্দাজ ক'রে একটা পথ বেছে নিয়ে তাই ধরে চললাম। ক্রমশ বন নিবিড়তর হয়ে উঠেচে, আমাদের মনে হচ্ছিল যে যে-কোনো মুহূর্তে আমরা ভালুক কি বাঘের সামনে পড়তে পারি। এ বনে সে ব্যাপারটা এমন কিছু অসম্ভব নয়।

অম্বিকা বললে—এসো একটা রাত বনের মধ্যেই কাটিয়ে দেওয়া যাক।

আমারও নিতান্ত অনিচ্ছা ছিল না, কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল দুজনে সামনের দিকে এগিয়েই চলেচি, দুজনেরই ঝোঁক বন পার হয়ে ফাঁকা জায়গায় পড়বার দিকে। বনের মধ্যে কোনো গাছ এমন নেই, যার ফল খাওয়া যায়, একমাত্র আমলকি ছাড়া। সেকালের মুনি-ঋষিরা শোনা যায় বনের মধ্যে কুটির নির্মাণ করে নাকি বনের ফল খেয়ে জীবনধারণ করতেন। কথাটার মধ্যে কতদূর সত্যতা আছে জানি না। আমি অনেক স্থানের বন ঘুরে যে অভিজ্ঞতা লাভ করেচি, তাতে আমার মনে হয়েচে মানুষের খাদ্যোপযোগী ফলের গাছ পার্বত্য অরণ্যে ক্বচিৎ দেখা যায়—তাও আম, কলা, বেল, আনারস, লিচু প্রভৃতি ভালো জাতীয় ফল নয়—হয় আমলকি, কেঁদ প্রভৃতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর ফল, বড়জোর বুনো রামকলা, বিচি বোঝাই ও মানুষের অখাদ্য। মানুষের খাদ্যোপযোগী বহুপ্রকার ফলবৃক্ষের একত্র সমাবেশ মানুষের হাতে তৈরী ফলের বাগান ছাড়া আর কোথাও দেখা যাবে না।

আমি সিংহভূম ও উড়িষ্যার অরণ্যাঞ্চলে দেখেচি শুধু শাল, অর্জুন, বন্য আমলকি, কেঁদ, পলাশ ও আসান গাছ ছাড়া অন্য কোনো প্রকার গাছ মাইলের নয় মাইল বিস্তীর্ণ অরণ্যের মধ্যে কোথাও নেই—একমাত্র আমলকি ও কেঁদ ছাড়া এদের মধ্যে অন্য কোনো গাছে মানুষের খাওয়ার উপযুক্ত

ফল ফলে না—হিমালয়ের ও আসামের আরণ্য প্রদেশেও খাদ্যোপযোগী ফল-বৃক্ষ বেশি নেই। উড়িষ্যার কোনো কোনো বনে বন্য বিল্ববৃক্ষ দেখা যায় বটে—কিন্তু তার ফলের ভেতরটা আঠা ও বিচিতে ভর্তি, স্বাদ কষা ও ঈষৎ তিক্ত, মানুষের পক্ষে অখাদ্য।

বিশেষ করে আমার বলবার বিষয় এই, সাঁওতাল পরগনা, দক্ষিণ বিহার, সিংহভূম ও মধ্যপ্রদেশের আরণ্য প্রদেশ মানুষের প্রতি ভয়ানক নিষ্ঠুর—এখানে বিচিত্র বন্যপুষ্প নেই, খাওয়ার উপযুক্ত বিশেষ কোনো ফল নেই। মুনি-ঋষিরা আর যে কোনো বনেই বাস করুন, এই সব স্থানের বনে নিশ্চয়ই বাস করতেন না—করলে অনাহারে মারা পডতেন। অন্য কোনো দেশের অরণ্যে প্রকৃতি মানুষের জন্যে ফলের বাগান সাজিয়ে যদি রেখেই থাকেন—তবে তার সন্ধান আমার জানা নেই।

ফলের কথা বাদ দিয়ে এবার বন্য ফুলের কথা বলি।

বন্য পুষ্পের বিচিত্র শোভার কথা শোনা যায় বটে, কিন্তু সব অঞ্চলের সব অরণ্যের বেলায় সে কথা খাটে না। সাধারণত ধরে নিতে হবে সুখাদ্য ফলের ন্যায় নয়নানন্দদায়ক পুষ্পের দর্শনও মানুষের তৈরী উদ্যানেই মেলে—প্রকৃতিবচিত আরণ্য-অঞ্চল মানুষের সুখ-সুবিধার দিক থেকে দেখতে গেলে বড কৃপণ।

অতএব যে-কোনো বড অরণ্যে ঢুকলেই যে বনপুষ্পের শোভায় মন মুগ্ধ করবে, এ যিনি ভাবেন, তিনি অরণ্য দেখে নিরাশ হবেন।

বনের ফুল ফোটে বিশেষ বিশেষ ঋতুতে, তাও দু এক রকম মাত্র ফুল সেই সেই ঋতুতে দেখা যায়—নানা ধরনের ফুল একসঙ্গে কখনই দেখা যায় না। সে দেখা যায় মানুষের হাতের ফুলের বাগানে। যিনি বহুবিধ রঙীন পুষ্পের বিচিত্র সমাবেশ দেখতে ভালোবাসেন, তাঁকে যেতে হবে আলিপুরের হর্টিকালচারাল সোসাইটির উদ্যানে, অন্তত আমি এমন কোনো

অরণ্য দেখিনি, যেখানকার বিচিত্র বন্যপুষ্পশোভা তাঁকে অতটা আনন্দ দিতে পারবে।

বসন্তে দেখেছি সিংহভূম ও উড়িষ্যার অরণ্যে গোলগোলি ফুলের বড় শোভা। কিন্তু সব বনে এ গাছ দেখা যায় না, কোনো বনে আছে, কোনো বনে আদৌ নেই। এই গাছ দেখতে ঠিক একটি পত্রহীন আমড়া গাছের মতো, কিন্তু কখনই খুব বড় হয় না। বসন্তে পাতা ঝরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফুল ফোটে, ফুলগুলির আকৃতি ও বর্ণ অনেকটা সূর্যমুখী ফুলের মতো। বনের সবুজ পাতার মধ্যে থেকে এখানে-ওখানে এক-একটা শুভ্রকাণ্ড, নিষ্পত্র, আঁকাবাঁকা গোলগোলি গাছ হলদে ফুলে ভরা দাঁড়িয়ে আছে—এ দৃশ্য যিনি একবার দেখেচেন, তিনি কখনো ভুলবেন না।

এ ছবি আরও অপূর্ব হয়, যদি কাছে বড় বড় অনাবৃত শিলাখণ্ড থাকে। উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিদ্ হুকার তাঁর প্রসিদ্ধ 'হিমালয় জার্নাল' নামক গ্রন্থে গোলগোলি ফুলের সৌন্দর্যের যথেষ্ট সুখ্যাতি করেচেন—তাঁর বইয়ে নিজের হাতে আঁকা ছবিও আছে এই ফুলের।

বসন্তে আরও দু একপ্রকারের ফুল দেখেচি এই অঞ্চলের বনে, যেমন লোহাজাঙ্গি ও ঝাঁটি ফুল। এদের ফুল হয় অনেকটা চামেলি ফুলের মতো—তবে গন্ধহীন। পলাশ সর্বত্র নেই—যেখানে আছে, যেমন পালামৌ ও রাঁচি অঞ্চলের প্রান্তরে ও বনে, সেখানে রক্তপলাশের শোভা বড় অদ্ভুত হয়। কিন্তু প্রান্তর ছাড়া পার্বত্য অরণ্যে পলাশ গাছের ভিড় বড় একটা থাকে না। শাল ফুলের সুগন্ধ আছে—কিন্তু দেখতে বিশেষ কিছু নয়। মহুয়া ফুলের সম্বন্ধেও এই কথা খাটে।

কোনো কোনো বনে বর্ষা ঋতুতে কুরচি ফুল যথেষ্ট দেখা যায়—বিশেষ করে সিংহভূম অঞ্চলে।

শিমুল ফুল বনের মধ্যেটেষ্কু গাছ আলো করে থাকলে যে কি শোভা

হয়, যাঁরা বেঙ্গল নাগপুর রেলপথের শৈলনের স্টেশনঘেরা উভয়পার্শ্ববর্তী আরণ্য অঞ্চল বসন্তে ভ্রমণ করেচেন, তাঁরা বুঝতে পারবেন। দুঃখের বিষয় সিংহভূমের মাত্র এই স্থানটুকু ছাড়া অন্য কোথাও বড় একটা শিমুল গাছ বনে দেখা যায় না। সাধারণত শিমুল গাছের স্থান বনে নয়, মানুষের পল্লীতে কিংবা পল্লীর আশপাশের মাঠে। তাই বলছিলুম বন-প্রকৃতি মানুষের সুখ সুবিধায় বড়ই উদাসীন।

মুচুকুন্দ কলকাতার রাস্তার দুধারে যথেষ্ট দেখা যায়, বাংলার পাড়াগাঁয়েও আছে, কিন্তু কোনো বনে কখনো এ গাছ দেখিনি।

বাকি রইল বন্য শেফালি ও সপ্তপর্ণ। বন্য শেফালি অজস্র দেখা যায় নাগপুর অঞ্চলে পার্বত্য অরণ্যে। সিংহভূমেও আছে ; তবে অত বেশি নয়। সপ্তপর্ণ দক্ষিণ বিহারের বনপ্রদেশে যথেষ্ট আছে—অন্য কোথাও একদম নেই। উড়িষ্যা ও সিংহভূমের অরণ্যে সারাদিন খুঁজে বেড়ালেও একটা বন্য সপ্তপর্ণ চোখে পড়বে না—কিন্তু পড়বে যেখানে মানুষের বাসস্থান। কেবল মাত্র বাংলা দেশেই দেখা যায় পল্লীগ্রামের আশপাশের বনে অযত্নসম্ভূত বন্ত সপ্তপর্ণ বৃক্ষ হেমন্তের প্রারম্ভে মধুর পুষ্প-সুবাসে পথিকের মন আনন্দে ভরিয়ে দেয়।

রক্ত করবীর বন দেখেচি চন্দ্রনাথে, কিন্তু সে গেল বাংলা দেশের মধ্যে। খুব বাহারে ও রঙীন্ কোনো ফুল সাধারণত রুক্ষ পার্বত্য অঞ্চলের অরণ্যে দেখাই যায না, যদিও থাকলে খুব ভালো হ'ত।

একসময়ে আমরা দূর থেকে কয়েকটি পাহাড়ের চূড়া দেখতে পেলাম, মেঘের মধ্যে নীলরঙের তিনটি চূড়া, কেঁদ আর শালবনের ফাঁকে অনেক দূরের আকাশের পটে যেন আঁকা রয়েচে। অম্বিকা ও আমি ঠিক করে নিলাম ঐ নিশ্চয়ই ত্রিকূট। অম্বিকা বললে—ও পাহাড় কিন্তু অনেকদূরে।

—মেঘের মধ্যে বলে চোখে ধাঁধা লেগে অমনি হচ্চে। মেঘ সরে গেলে অত দূর বলে মনে হবে না।

বন একেবারে নিবিড়। শুকনো পাতার রাশি গাছতলায় এত জড় হয়েচে যে পায়ে দলে যাবার সময় একটা একটানা মচ্ মচ্ শব্দ বহুক্ষণ ধরে শুনচি।

এদিকে বেলা বেশ পড়ে এসেচে, রোদ রাঙা হয়ে বড় বড় কেঁদ-গাছের মগডালে লেগেচে। এ জঙ্গলটাতে আবার বন্য বাঁশ, খয়ের ও বহেড়া গাছ খুব বেশি। সন্ধ্যা তো হয়ে এল, যদি জঙ্গল শেষ না হয় তবে কি করা যাবে সে বিষয়ে আমরা আগে থেকে পরামর্শ করলাম।

অম্বিকা বললে, গাছে উঠে রাত কাটানো যাবে, সেই যে-কথা আগে বলেছিলুম।

—তা যদি উঠতে হয় তবে সন্ধ্যার আগেই আশ্রয় নিতে হবে সেখানে, অন্ধকার হ'লে এ বনে আর এক পা-ও চলা উচিত হবে না।

অম্বিকারও তাই মত। লছমীপুরের জঙ্গলে ভালুক ও বাঘ যথেষ্ট আছে ভাগলপুরে থাকতে শুনে এসেচি। বন্দুক ও উপযুক্ত গাইড না নিয়ে বনের মধ্যে যাওয়াই উচিত নয়, একথা আমাদের সবাই বলেছিলেন—এমন কি রাণী-সাহেবা পর্যন্ত। আমরা কারো কথা না শুনে যখন এসেচি, তখন এর আনুষঙ্গিক বিপদের জন্যেও আমাদের তৈরী থাকতে হবে বৈকি।

সন্ধ্যা হবার আগে দেখা গেল পথটা উৎরাইয়ের দিকে নামচে। আমরা অনেকদূরে নেমে এলুম, ক্রমশ একটা পাহাড়ী ঝরনা আমাদের পথের ওপর কুলুকুলু রবে চলেচে রাশি রাশি নুড়ির বাধা অগ্রাহ্য করে। ঝরনা পার হয়ে আবার একটা চড়াইয়ের পথ, খয়ের ও বহেড়ার জঙ্গলও পূর্ববৎ নিবিড়। সম্বর হরিণ নাকি এই জঙ্গলে খুব বেশি, তারা মানুষ দেখলে তেড়ে এসে শিঙ দিয়ে গুঁতিয়ে মেরে ফেলে দেয়। এ পর্যন্ত দু-একটা খেঁকশিয়াল

ছাড়া অন্য কোনো জানোয়ারের টিকি দেখা যায়নি যদিও; এবার কিন্তু সন্ধ্যা হয়ে এল, এবার সাবধান হয়ে চলাই দরকার।

চড়াইয়ের জঙ্গলে অনেকটা চলে এলুম। সন্ধ্যার অন্ধকার বেশ ভালো ভাবেই নামলো, আমরা কি করবো ভাবচি এমন সময়ে একটা কি অদ্ভুত ধরনের শব্দ আমাদের কানে গেল দূর থেকে।

দুজনেই দাঁড়িয়ে রইলুম। বাঘ বা ওই ধরনের কিছু ?

অল্পক্ষণ পরেই বনের নিবিড় অন্তরাল থেকে বার হয়ে এল একটা সাদা কাপড়ের ডুলি। দুজন ডুলি বইচে, পেছনে জন-তিনেক লোক, ওদের সকলের হাতেই লাঠি ও বর্শা।

আমরা ওদের দেখে যতখানি অবাক, ওরাও আমাদের দেখে তার চেয়ে কম অবাক নয়।

আমরা বললুম, কোথায় যাবে তোমরা ?

আমাদের প্যাণ্ট্-কোট পরা, হ্যাট্ মাথায় মূর্তি দেখে ওরা বেশ ভয় খেয়ে গিয়েচে বোঝা গেল। বিনীতভাবে তারা বললে, তারা লছমীপুরে যাবে।

—ডুলির মধ্যে কি ?

—একটি মেয়ে আছে বাবুজী—

অম্বিকা উকিল মানুষ, সে এগিয়ে গিয়ে বেশ একটু মুরুব্বিয়ানার সুরে বললে, কোথাকার মেয়ে, কি বৃত্তান্ত, আমরা জানতে চাই। কোথা থেকে আনচো ?

একটি নিরীহ গোছের দেহাতী লোক এগিয়ে এসে আমাদের আভূমি নত হয়ে সেলাম করে বললে, গরিব পরওয়ার, আমার আউরৎ আমার বাড়ি থেকে লছমীপুরে ওর বাপের বাড়ি যাচ্চে, আমি ওর স্বামী, নাম বিঠল ভকৎ হুজুর

আমরা তো অবাক। বিঠল ভকৎ তার স্ত্রীকে নিয়ে এই প্রকাণ্ড বনের মধ্যে দিয়ে রাত্রিকালে শ্বশুরবাড়ি চলেচে।

আমরা বললুম, বন আর কতটা আছে ?

বিঠল ভকৎ বললে, আর এক ক্রোশ, কিন্তু ডানদিক ঘেঁষে যান। বাঁদিকের পথে চললে এখনও দু তিন ক্রোশ বন পাবেন।

—কোনো ভয়-ভীত্ আছে এ বনে ?

—জানোয়ার আছে বৈকি। ভালুকের ভয় এই সময়টা খুব।

—তোমাদের খুব সাহস তো! এই রাত্রিকালে বনের মধ্যে দিয়ে বউ নিয়ে যাচ্চ ?

—আমাদের এই জঙ্গলের দেশেই বাড়ি বাবুসাহেব, ভয় করলে চলে না। আমাদের সঙ্গে অস্ত্র আছে।

ওরা চলে গেল। আমাদের সাহস বিঠল ভকৎ অনেকটা বাড়িয়ে দিয়ে গেল সন্দেহ নেই। আমরা দুজনেই তখন এগিয়ে চলেচি ডানদিক ঘেঁষে। জঙ্গলের মধ্যে জ্যোৎস্নার আলোছায়ার জাল ক্রমশ খুব স্পষ্ট হয়ে উঠলো। নিস্তব্ধ বিজন অরণ্যানী আমাদের চারিদিকে বিস্তৃত, নিজেদের ঘরবাড়ি ছেড়ে কতদূর এসে পড়েচি, কোথায় যেন চলেচি—এ কথা ভাবতে আমার এত আনন্দ হচ্ছিল! নৈশ পাখীর আওয়াজ—আর বনের মধ্যে কোথাও বনশিউলি ফুটেচে, তার গন্ধ সন্ধ্যার পর থেকে শুরু হয়েচে। মাঝে মাঝে গন্ধটা খুব ঘন, এক এক জায়গায় বড় পাতলা হয়ে যায়, এক এক জায়গায় থাকেই না—কিন্তু একেবারে কখনই যায় না।

বন ক্রমশ কমে আসচে বোঝা গেল। আর আধঘণ্টা জোর হাঁটবার পরে বন ছাড়িয়ে আমরা ফাঁকা মাঠের মধ্যে পড়লাম। কিন্তু কোনোদিকে একটা বস্তি নেই। মাঠে শুধু শাল আর মউল গাছ দূরে দূরে, জ্যোৎস্নার আলোতে এই দীর্ঘ অজানা প্রান্তর যেন আমাদের কাছে দক্ষিণ আমেরিকার

পাম্পাস তৃণভূমি—আকাশের নেশা, পথহীন পথের নেশা, অজানার উদ্দেশে ক্লান্তিহীন যাত্রার নেশা!

অথচ কতটুকুই বা যাবো! আমরা উত্তরমেরু আবিষ্কার করতে যাইনি, যাচ্ছি তো ভাগলপুর থেকে দেওঘর, বড়জোর একশো পঁচিশ কি ত্রিশ মাইল। কিংবা হয়তো তারও কম!

আসল কথা, মনের আনন্দই মানুষের জীবনের অস্তিত্বের সব চেয়ে বড় মাপ-কাঠি। আমি দশ মাইল গিয়ে যে আনন্দ পেলুম, তুমি যদি হাজার মাইল গিয়ে সেই আনন্দ পেয়ে থাকো তবে তুমি-আমি দুজনেই সমান। দশ মাইলে আর হাজার মাইলে পার্থক্য নেই।

তবে ঘরকে একেবারে মন থেকে তাড়াতে হয়। ঘর মনে থাকলে পথ ধরা দেয় না। ঘর দুদিনের বন্ধন, পথ চিরকালের।

জয়পুর ডাক-বাংলোয় পৌঁছে গেলুম আরও প্রায় একঘণ্টা হেঁটে। এখানে চৌকিদারকে ডেকে বললুম—বাপু, রঘুনাথ পাটোয়ারী কোথায় থাকে, তার হাতে এই চিঠিখানা দিয়ে এসো তো।

চিঠিখানা লছমীপুরের দেওয়ান দিয়েছিলেন পাটোয়ারীর কাছে আমাদের সম্বন্ধে। চৌকিদার চলে যাওয়ার কিছু পরেই দেখি চার-পাঁচজন লাঠি-হাতে লোক সঙ্গে ক'রে জনৈক পাগড়িবাঁধা, মেরজাইআঁটা বৃদ্ধ এদিকেই আসচে। কাছে এসে লোকটি এক লম্বা সেলাম দিয়ে সামনে দাঁড়ালো। তারই নাম রঘুনাথ, বাবুরা স্বচ্ছন্দে থাকুন ডাকবাংলোয়, সে এখুনি খাওয়া-দাওয়ার বন্দোবস্ত করে দিচ্চে। বিশেষ করে ডাকবাংলোতে রাত্রে পাহারার জন্যে লোক এনেচে সঙ্গে।

—পাহারার লোক কেন?

—বাবুসাহেব, এই ডাকবাংলো জঙ্গলের ধারে মাঠের মধ্যে। লোকজন নেই কাছে—এখানে প্রায়ই ডাকাতি হয়। এক মাড়োয়ারী শেঠ এখানে

ছিল সে-বছর, তাকে মেরে-ধরে টাকাকড়ি নিয়ে যায়। জায়গা ভালো না।

—আমাদের সে ভয় নেই পাটোয়ারীজী—সঙ্গে কিছু নেই যে নেবে। তবে লোক থাকে রেখে দাও। আর খাওয়া-দাওয়ার হাঙ্গামা ক'রো না—কেবল একটু চা যদি হ'ত—

—সব বন্দোবস্ত করে দিচ্চি এখুনি। আপনারা স্টেটের অতিথি—খাবেন না তা কি কখনো হয়। দেওয়ানজী লিখেচেন আপনাদের আদর-যত্নের কোনো ত্রুটি না হয়। আর, টাকাকড়ির কথা বলচেন, এ জংলী দেশে চার আনা পয়সার জন্যে অনেক সময় মানুষ খুন হয়। পাহারা রাখতেই হবে।

রাত্রে পুরী ও হালুয়ার ব্যবস্থা করে দিলে রঘুনাথ পাটোয়ারী। একটা জিনিস লক্ষ্য করলুম, এমন চমৎকার ভঁয়সা ঘি আর কখনো দেখিনি কোথাও—লছমীপুর আর এই জয়পুর ডাকবাংলো ছাড়া। কলকাতার বাজারে আমরা যে জিনিস ভঁয়সা ঘি বলে কিনে থাকি, তা আর যাই হোক্, খাঁটি ভঁয়সা ঘি যে নয়, তা বেশ ভালো ভাবেই বুঝলাম। এই রকম ঘি আর দেখেছিলুম বৈকুণ্ঠ পাঁড়ের বাড়িতে। পাটোয়ারীজীকে ডেকে বললুম —পুরী কি-ঘিয়ে ভাজা?

—কেন বাবুসাহেব, ভঁয়সা ঘিয়ে।

—একটু নিয়ে এসে দেখাতে পারো?

একটা বাটিতে খানিকটা ঘি ওরা আমাদের কাছে নিয়ে এল—তার রং কলকাতার বাজারের ঘিয়ের মতো সাদা নয়—কটা, মাছের ডিমের মতো দানাদার। সুগন্ধে ঠিক গাওয়া-ঘির মতো—বিশেষ কোনো প্রভেদ নেই।

পাটোয়ারী বললে—বাবুসাহেব, দেহাত থেকে মাড়োয়ারীরা এই ঘি নিয়ে গিয়ে পাইল করে, মানে চর্বি আর অন্য বাজে তেলের সঙ্গে কিংবা

খারাপ ঘিয়ের সঙ্গে মেশায়—তারপর টিন-বন্দী করে বাজারে ছাড়ে। শহর বাজারে সেই জিনিস ভঁয়সা ঘি বলে চলে। খাঁটি ভঁয়সা ঘি কোথা থেকে আপনারা বাজারে পাবেন ?

রাত্রে সুনিদ্রা হ'ল, শরীর দুজনেরই ছিল খুব ক্লান্ত। একবার মাঝ-রাত্রে উঠে বাংলোর বাইরে এসে চেয়ে দেখলুম—দূরে লছমীপুরের জঙ্গলের সীমারেখা আলো-আঁধারে অদ্ভুত দেখাচ্চে। আকাশে বৃহস্পতি ও শনি এক সরলরেখায় অবস্থিত ; জ্বলজ্বল করচে বৃহস্পতি, তার নিচে কিছু দূরেই শনি মিটমিট করচে। বিশাল মাঠের সর্বত্র বড বড শাল ও মহুয়া ছডিয়ে আছে দূরে দূরে। অল্পদূরেই ত্রিকূটের দুটি শৃঙ্গ আধো-অন্ধকার আকাশে মাথা তুলে দাঁডিয়ে। কি একটা রাত-জাগা পাখী প্রান্তবের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে মাঝে মাঝে কুস্বরে ডাকচে। ডাকবাংলোর বারান্দায় রঘুনাথ পাটোয়ারীব দরওয়ান তিনটি নাক ডাকিয়ে অঘোরে ঘুমুচ্চে। বনপ্রান্তরে যেন কি-একটা অব্যক্ত রহস্য থম্ থম্ করচে—যা মনেই শুধু অনুভব করা যায়—কিন্তু মুখে কখনো প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

পরদিন সকালে উঠে সকলের কাছে বিদায় নিয়ে পথে উঠলাম এসে।

দুপুর পর্যন্ত হেঁটে মহিষারডি বলে একটা গ্রামে এক আহীর গোয়ালার বাড়ি একটু জল চাইলাম।

গ্রামখানি ছোট—প্রায় সবই গোয়ালা অধিবাসী গ্রামে। বাড়ির মালিক বললে—কোথা থেকে আসচেন আপনারা ?

—ভাগলপুর থেকে।

—কিসে ?

—পায়ে হেঁটে, বৈদ্যনাথজী যাচ্চি।

কথাটা শুনে শ্রদ্ধায় লোকটা অভিভূত হয়ে পডলো। আমাদের

বিশেষ অনুরোধ করলে আমরা যেন সে-বেলা তার আতিথ্য স্বীকার করি। খাওয়া-দাওয়া সেরে ওবেলা রওনা হ'লে রাত আটটার মধ্যে আমরা ত্রিকূটের পাদদেশে মোহনপুর ডাকবাংলোয় পৌঁছে সেখানে রাত কাটাতে পারি।

আমাদের রাজি না হয়ে উপায় ছিল না। অত রৌদ্রে ক্লান্ত শরীর নিয়ে পথ হাঁটা চলবে না এবেলা।

লোকটির নাম হরবংশ গোপ।

সে বাড়ির সবাইকে ডেকে এনে আমাদের দেখিয়ে বললে—গ্যাখ, কলিকালে ধর্ম নেই কে বলে? বাবুজিরা ভাগলপুর থেকে পাঁওদলে আসচেন বৈদ্যনাথজীর মাথায় জল চড়াতে। অথচ বাবুরা ইংরিজি বিদ্যের জাহাজ—মস্ত বড় এলেমদার লোক। দেখে শেখ্।

আমরা দুজনেই সঙ্কুচিত হয়ে পড়লুম—এ প্রশংসা আমাদের প্রাপ্য নয়। তীর্থ করতে আমরা যাচ্চিনে এই সওয়া-শো মাইল হেঁটে—এই সরল পল্লী-বাসীরা সে কথা বুঝবে না। পুণ্যের আকর্ষণ ভিন্ন আর কিসের আকর্ষণে আমাদের এতখানি পথ টেনে এনেচে, তা এদের বোঝাতে গেলে আমাদের উন্মাদ ঠাওরাবে। অতএব ভক্ত তীর্থযাত্রী সেজে থাকায় জটিলতা নেই ভেবে আমরাও ওদের কথার প্রতিবাদ করে ওদের ভুল ভাঙবার আগ্রহ দেখালাম না।

ওরা তারপর বিনীতভাবে জিগ্যেস্ করলে, আমরা কি খাবো।

আমরা বললুম—যা হয় খেতে পারি। তার জন্যে ব্যস্ত হতে হবে না। আমাদের খাওয়া না হ'লেও চলবে।

হরবংশ গোপ সে কথা শুনলে না। চাল ডাল বার করে দিলে—আমরা রেঁধে খাবো। ওইখানে পড়ে গেলুম মুশকিলে। পথে বার হয়ে এ পর্যন্ত রান্না করে খেতে হয়নি একদিনও। আমরা ওজর-আপত্তি করলুম—ওরা ব্রাহ্মণকে রেঁধে খাইয়ে জাত মারতে রাজি নয়।

মহিষারডি গ্রামখানার অবস্থান-স্থান বড় চমৎকার। বামে কিছুদূরে ত্রিকূট শৈল; ডাইনে খানিকটা নাবাল জমি, তাতে শুধু বড় বড় পাথর ছড়ানো আর চারা শালের বন—দূরে একটা বড় বনের শীর্ষদেশ দেখা যায়—খুব ফাঁকা জায়গাটা।

তা ছাড়া অনেক আকর্ষণ আছে। এ ধরনের সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্যে ঐশ্বর্যবান গ্রাম রেলস্টেশনের কাছে থাকলে নিশ্চয়ই সেখানে কলকাতার লোকে বাড়ি না করে ছাড়তো না। গ্রামের যেদিকটা নাবাল জমি, তার বড় ঢালুতে চারা শালের বনে খুব বড তিন চারখানা শিলাখণ্ড ঠিক যেন হাতীর মতো উঁচু ও বড়। অন্তত দুখানা এমন শিলার ওপরে দুটি অর্জুন গাছের চারা ঠিক একেবারে পাথর ঘেঁসে দাঁড়িয়ে ও দুটোতে যথেষ্ট ছায়াদান কবচে। বেশ ওঠা যায় পাথরে—সকালে, বিকেলে, রাত্রে ত্রিকূট শৈল ও পেছনদিকের মুক্ত প্রান্তরের দিকে চোখ রেখে অনেকক্ষণ বসে আপনমনে কাটানো যায়, বই পড়া যায়—বড় সুন্দর নিভৃত শিলাসন। আশেপাশে নিকটে দূরে অনেকগুলো পলাশবৃক্ষ।

রাঙা সিঁদুরের মতো মাটি, কাঁকরের ডাঙা, ছবির মতো একটি ঝরনা ত্রিকূট থেকে বেরিয়ে গ্রামের পশ্চিম দিক দিয়ে বয়ে চলেচে সেই নাবাল জমিটার পশ্চিমপ্রান্ত ঘেঁসে।

ছবিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করবার জন্যেই যেন গ্রামের মধ্যে কয়েকঝাড় কাঁটা-বাঁশ রাঙা-মাটির ডাঙার ওপর সাজানো।

অম্বিকাকে বললুম—চেয়ে দেখ গ্রামখানার রূপ। এখানটা বাস করার উপযুক্ত স্থান। আমাব যদি কখনো সুবিধে হয়, ঠিক এই মহিষারডি গ্রামে এসে বাস করবো।

অম্বিকাও বললে—সত্যি, এটা একটা বিউটি স্পট। যদি এত দূর আর এমন বেখাপ্পা জায়গায় না হ'ত—আমিও এখানে বাস করতুম।

আমি ভেবে দেখলুম, রেল থেকে এই দূরত্বই (অন্তত বত্রিশ মাইল) ওকে আরও সৌন্দর্য দান করেচে। রেলস্টেশনের কাছে হ'লে এ গ্রাম যেন সাধারণের উচ্ছিষ্ট হয়ে পড়তো—এ এখন রূপসী, সরলা বন্যবালা—শুভ্র ও অপাপবিদ্ধ। এই দিশাহীন রাঙামাটির মুক্ত প্রান্তর, অদূরের ওই শৈলচূড়া, হাতীর মতো বড় বড় পাথরের আসনগুলো—নাবাল জমিটার ও ঝরনাটার সৌন্দর্য এ গ্রামকে অদ্ভুত শ্রী দান করেচে—অথচ এখানে কলকাতার কোনো লোক এখনও বাড়ি করেনি—কোনদিন করবেও না—এ গ্রাম এমনি জনবিরল, নিস্তব্ধ ও শান্ত বনপ্রান্তরের মধ্যে চিরদিন নিজের সৌন্দর্য অটুট রেখে চলবে—একথা ভেবেও মনে আনন্দ পেলুম।

এই চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে মনে একটা গুপ্ত-বাসনা অবিশ্যিই থাকে—যদি কখনো সুবিধে হয় তবে এখানে বাড়ি করবো।

—জমির এখানে কি দাম হরবংশ ?

—জমির দাম ? কি করবেন বাবুসাহেব ?

—ধরো যদি বাস করি ?

হরবংশ আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে বললে—বাস করুন না, জমি কিনতে হবে না বাবুজি। ওই মোড়ের ধারে ভালো জমি আমার নিজের আছে—আপনাকে দিচ্চি। আসুন না! যেখানে আপনাদের পছন্দ হবে গাঁয়ের মধ্যে জমি নিন। পনেরো কুড়ি টাকা বিঘে দরে জমি বিক্রি হয়। ওই রাঙা মাটির বড় ডাঙাটা নিন না! বাসের পক্ষে চমৎকার জায়গা। ওটা বাইশ বিঘের ডাঙা—আমি গ্রামের প্রধানকে বলে সস্তায় করে দেবো। দশটাকা বিঘে দরে ডাঙাটা আমি আপনাকে করে দিতে পারি। প'ড়েই ত রয়েচে আমার জন্ম থেকে। দশটাকা বিঘে পেলে বর্তে যাবে।

মহিষারডি থেকে পরদিন সকালে বেরিয়ে পড়লাম।

যাবার সময় বার বার মনে করলুম, যদি কখনো সুবিধে হয়, আর

একবার এই সুন্দর গ্রামখানিতে ফি'রে আসবো। অবিশ্যি এখনও পর্যন্ত সে কল্পনা কার্যে পরিণত হয়নি—কিন্তু মাঝে মাঝে প্রায়ই মনে হয় গ্রামখানির কথা। গত বৎসর বড়দিনের পবে কার্যোপলক্ষে একবার দেওঘর যেতে হয়েছিল, কতবার ভেবেছিলুম লছমীপুরের পথে গিয়ে একবার মহিষারড়ি গ্রামে হরবংশ গোপের সঙ্গে দেখা করে আসি, আবার ওদের রাঙামাটির ডাঙার সেই হাতীর মতো বড় পাথরখানার ওপর বসে আসি!

কিন্তু মানুষের সব ইচ্ছা সব সময় পূর্ণ হয় কই?

মোহনপুব ডাকবাংলোয় আমরা পৌঁছে গেলাম বেলা দশটার মধ্যে। এই স্থানটিও খুব সুন্দর—ত্রিকূট-শৈলের পাদদেশে ডাকবাংলোটি অবস্থিত, দেওঘর থেকে বাউসি দিয়ে যে রাস্তা গেছে, তারই ধারে।

আমরা সেখানে বেশিক্ষণ ছিলাম না। ঘণ্টা দুই বিশ্রাম ক'রে বেলা দুটোর সময় সেখান থেকে রওনা হবো ঠিক করেচি, কিন্তু অম্বিকা বললে—এতদূব এসে একবার ত্রিকূট পাহাড়ে ওঠা দরকার। পাহাড়ে না উঠে যাবো না।

দুজনে পাহাড়ে উঠতে আরম্ভ করলুম।

প্রথম অনেকদূর পর্যন্ত কাঁটা-বাঁশের বন। পাহাড়ে উঠবার পথ বেশ ভালো, বড় বড় পাথরের পাশ বেয়ে ঝরনার জল গড়িয়ে আসচে—কিছুদূর উঠে জন-দুই সাধুর সঙ্গে দেখা হ'ল।

একজন বললেন—বাবুজিরা কোত্থেকে আসচেন?

—ভাগলপুর থেকে, পায়ে হেঁটে দেওঘর যাবো।

—আপনাদের ধর্মে মতি আছে, একালে এমন দেখা যায় না।

সাধু বাবাজিদের কাছে মিথ্যে ভক্ত সেজে কি করব, আমরা খুলেই বললুম সব কথা। আমাদের আসল উদ্দেশ্য পায়ে হেঁটে দেওঘর আসা, বৈদ্যনাথজি-দর্শন নয়, যদিও মন্দিরে নিশ্চয়ই যাবো এবং দেবদর্শনও করবো।

ওঁরা আমাদের ঠাকুরের প্রসাদ খেতে দিলেন, হালুয়া ও দুটি কলা।
আমরা কিছু প্রণামী দিয়ে সেখান থেকে নেমে এলুম।
বেলা পড়ে এল পথেই—দেওঘর পৌঁছুতে প্রায় রাত আটটা বাজলো।

১৯৩২ সালে আমার একটি বন্ধু মধ্যপ্রদেশের রেওয়া স্টেটের দারকেশা বলে একটি ক্ষুদ্র পার্বত্য গ্রাম থেকে আমায় চিঠি লিখলেন, সেখানে একবার যাবার অনুরোধ করে। তাঁর চিঠিতে স্থানটির অদ্ভুত প্রাকৃতিক দৃশ্যের কথা পড়ে আমি আর স্থির থাকতে পারলাম না। মধ্যপ্রদেশের ঘন বন ও পাহাড়ের মধ্যে গ্রামখানি অবস্থিত। তিনি সেখানে কণ্ট্রাক্টরের কাজ করেন, ইদানীং কাঠের ব্যবসাও আরম্ভ করেছিলেন, দুতিনটি ভালো ঘোড়াও কিনেচেন, অনেক কুলি ও লোকজন তাঁর হাতে, বনে বেড়াতে ইচ্ছা করলে তিনি সেদিকে যথেষ্ট সুবিধে করে দেবেন লিখেচেন।

আমি কখনও মধ্যপ্রদেশে যাইনি তার আগে, বেঙ্গল নাগপুর রেলের গাড়ি চড়ে এমন কি কোনোদিন রামরাজাতলাতেও যাইনি। তিনি লিখলেন, বিলাসপুর থেকে যে লাইন কাটনি গিয়েচে, তারই ধারে কার্গিরোড্ বলে একটি ছোট স্টেশন আছে, সেখান থেকে বত্রিশ মাইল ঘোড়ায় চেপে যেতে হবে তাঁর ওখানে পৌঁছুতে। তিনি স্টেশনে ঘোড়া ও লোক রেখে দেবেন আমার চিঠি পেলে।

আমার সেই বন্ধুটির ছোট ভাই কলকাতায় থেকে কলেজে পড়ে। তার সঙ্গে গিয়ে একদিন দেখা করলাম। সে-ও আমায় খুব উৎসাহ দিলে। সে ছুটিতে একবার সেখানে গিয়েছিল, চমৎকার জায়গা, গ্রামের ধারেই বিশাল বনভূমি, হরিণের দল চরে বেড়ায়, ময়ূর তো যথেষ্ট, গ্রামের গাছপালায় ডালে বনময়ূর এসে বসে—ইত্যাদি।

আমি বললুম—কোন্ সময় যাওয়া ভালো? এখন তো বর্ষাকাল।

—পূজোর সময় রাস্তা-ঘাট ভালো হয়ে যায়, পাহাড়ী ঝরনার জল শুকিয়ে যায়—সেই সময়েই যান।

ঠিক হ'ল সে-ও পূজোর ছুটিতে আমার সঙ্গে যাবে। কিন্তু মাস-দুই পরে যখন পূজোর অবকাশ এসে পড়লো—সে বললে, তাকে একবার তাদের গ্রামে যেতে হবে, এখন সে যেতে পারবে না।

আমি তাকে বললুম—তোমার দাদাকে চিঠি লিখে দাও আমি ষষ্ঠীর দিন কলকাতা থেকে রওনা হবো, তিনি যেন সব বন্দোবস্ত রাখেন।

সে বললে—ঘোড়া চড়তে পারেন তো? বত্রিশ মাইল ঘোড়ার ওপর যেতে হবে। রাস্তাও খুব ভালো না। উঁচু-নিচু পাহাড়-জঙ্গলের রাস্তা।

আমি তাকে আশ্বস্ত করলুম, ঘোড়ায় চড়া আমার যথেষ্ট অভ্যাস আছে। ওর চেয়ে বেশি পথও আমি ঘোড়ায় চড়ে গিয়েচি। দিন ঠিক করে দুজনেই দুখানা পত্র দিলাম তার দাদার কাছে।

নির্দিষ্ট দিনে জিনিসপত্র নিয়ে হাওড়া স্টেশন থেকে বেঙ্গল নাগপুর রেলপথের বম্বে মেলে রওনা হ'লাম। সেবার সারা বর্ষাকাল ধরে খুব বৃষ্টি হয়ে দিন-পনেরো-কুড়ি আকাশ বেশ নির্মল হয়ে রৌদ্র ফুটেছিল। যাবার সময় দেখলুম রেলের দুধারে যথেষ্ট ধান হয়েচে, ফসল খুব ভালো হবে। বৈকালের ছায়ায় বহুদূরবিস্তৃত শ্যামল ধানক্ষেতের শোভা দেখতে দেখতে কোলাঘাটে পৌঁছে গেলুম। রূপনারায়ণের পুল যখন পার হই, তখন সন্ধ্যার অন্ধকার নেমেচে। বম্বে মেল ঝড়ের বেগে ছুটে চলে গিধনি, ঘাটশিলা, গালুডি পার হয়ে গেল।

রাত হয়েচে বেশ।—আমার মুশকিল হয়েচে, খড়্গপুর জংশনে খাবার কিনিনি, ভেবেছিলুম তখনও তত রাত হয়নি—আগের কোনো স্টেশনে কিনবো এখন। বি, এন, আর সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা ছিল না—এ লাইনে যে

ভালো খাবার পাওয়া যায় না, তখন তা জানতুম না। অপকৃষ্ট ঘি-এ ভাজা পুরী ও কুশ্রী তরকারি দেখে খাবার প্রবৃত্তি কমে গেল।

টাটানগরে গাড়ি প্রায় আসে, এক সহযাত্রী ভদ্রলোক পাশ থেকে আমায় বললেন—মশাই, যদি কিছু মনে না করেন—আমার বাড়ির খাবার সঙ্গে আছে, আপনাকে কিছু দিতে পারি ?

তাঁর সঙ্গে মাঝে মাঝে আমার দু-চারটি কথাবার্তা হয়েচে। ভদ্রলোক ডাক্তার, রায়পুর যাচ্চেন তাঁর কোন্ এক আত্মীয়ের বাড়ি—এইটুকু মাত্র তাঁর পরিচয় তিনিই দিয়েছিলেন কথাবার্তার মধ্যে।

ভদ্রলোক দেখি খাবার বার করে দুভাগে ভাগ করচেন।

আমি বিনীত ভাবে তাঁকে বললুম, আমার ক্ষিদে নেই, কিছু খাবো না। শরীর ভালো নয়।

ভদ্রলোক আমার মুখের দিকে চেয়ে বললেন—কেন, কি হয়েচে আপনার ?

—না, বিশেষ কিছু হয়নি। খাবার ইচ্ছে নেই।

লোকটি অদ্ভুত ধরনের। কতকালের পরিচিতের মতো তিনি আমার হাত ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন—বাঃ খাবেন না বললেই হ'ল ? এত খাবার দিয়েচে বাড়ি থেকে, আমি কি একলা খাবো, না খেতে পারি ? আপনি তো কিছুই খাননি, সারারাত কাটাবেন কি করে ? আর এ লাইনে ভালো খাবার পাবেন-না যে কিনে খাবেন এরপর খিদে পেলে। ওকথা শুনবো না—খান, খান, আসুন—বলেই তিনি আমার সামনে খাবারের এক ভাগ এগিয়ে দিলেন।

আমি এমন ধরনের মানুষ কখনো দেখিনি, মানুষকে এত অল্পক্ষণের মধ্যে আত্মীয় ও অন্তরঙ্গের মতো ভাবতে পারে যে লোক, তার অনুরোধ উপেক্ষা করা বড় সহজ কথা নয়।

অগত্যা খেতে হ'ল।

ভদ্রলোক নিজে খান, আর আমার পাত্রের দিকে চেয়ে বলেন—বেশ তরকারিটা, না? আমার মা, বুঝলেন না?

আমি সম্ভ্রমের ভাব মুখে এনে বলি—ও!

—বাহাত্তরের ওপর বয়স।

—বলেন কি!

—নিশ্চয়ই। বাহাত্তরের ওপর বয়স।

এর উত্তরে কি বলা উচিত ঠিক বুঝতে পারিনে। খুব খানিকটা বিস্ময় ও সম্ভ্রমের ভাব মুখের ওপর এনে ফেলার চেষ্টা করি—যদিও একটি বৃদ্ধা ভদ্রমহিলার বয়স বাহাত্তর হওয়ার মধ্যে এমন একটা আশ্চর্য ব্যাপার কিছুই নেই।

ভদ্রলোক আমার দিকে চেয়ে সগর্বে বললেন—মা এখনও সংসারের যাবতীয় রান্না সব নিজের হাতে করে থাকেন। এই যা খাচ্চেন, সব তাঁর নিজের হাতের।

আমি এবার আর নিরুত্তর রইলুম না, উত্তর দেওয়ার পথ খুঁজে পেয়েচি। বললুম—তাই বলুন! এ রকম রান্না কি কখনো একালের মেয়ের হাতে···খেয়েই আমার সন্দেহ হয়েছিল, এমন রান্না তো অনেকদিন খাইনি—এ না জানি কার হাতের!

ভদ্রলোক হাসি-হাসি মুখে আমার দিকে চেয়ে বললেন—পারবে কেউ আজকালের মেয়ে? বলুন!

—আরে রামোঃ! একালের মেয়ে—হুঁঃ—

আমি অবজ্ঞাসূচক হাসি টেনে আনি মুখে।

মনের গোপন তলায় একটা প্রশ্ন বার বার উঁকি মারছিল—ভদ্রলোক অবিবাহিত না বিপত্নীক? কিংবা স্ত্রীর সঙ্গে বনিবনাও নেই, এমন নয় তো?

—আর দুখানা পুরী নিন—না না লজ্জা করবেন না মশাই, লজ্জা করলে ঠক্‌বেন রাত্রে। সেই বিলাসপুরে ভোর, তার আগে কিছু মিলবে না ভালো খাবার—

খাওয়া দাওয়া শেষ হ'ল দুজনেরই। ভদ্রলোক নিশ্চয়ই খুব মাতৃভক্ত, তাঁর মাতৃদেবীর গুণকীর্তন শুনতে হ'ল অনেকক্ষণ বসে। শোবার ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও শয্যা আশ্রয় করতে পারলাম না।

তারপর কখন্ ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, আমার ঠিক মনে নেই, একটা কি স্টেশনে দেখি ভদ্রলোক আমায় ঝাঁকুনি দিয়ে বলচেন—ও মশাই, উঠুন—একটু চা খান—খুব ভালো চা এই স্টেশনের—এই ধরুন কাপটা—

উঁকি মেরে জানালা দিয়ে দেখি স্টেশনের নাম ঝাস্থ্র্গুডা।

বললুম, রাত কত মশাই?

—তিনটে পঁচিশ—

ট্রেন ছাড়লে চেয়ে দেখি রেলের দুধারে শেষরাত্রের অন্ধকারে কেবল বন আর বন। মধ্য-প্রদেশে এসে পড়া গেল নাকি? আরও অনেক স্টেশন চলে গেল। বন আর পাহাড়, পাহাড় আর বন, শেষ-রাত্রের ঘন অন্ধকারে কেমন অপরূপ মনে হচ্চে।

কখনো এ লাইনে আসিনি—বনের এমন শোভা যে এ লাইনে আছে তা আমার জানা ছিল না। সেদিক থেকে বেঙ্গল নাগপুর রেলপথ একটি বিশেষ লাইন, যা কিনা চক্ষুষ্মান্ ও প্রকৃতি-রসিক যাত্রীর সাম্‌নে আদিম ভারতের ছবি ধীরে ধীরে খুলে ধরবে, তার নিবিড় অরণ্যানী ও শৈলশ্রেণী, কোল, মুণ্ডা, ওঁরাওদের বস্তির সারি, স্থানের অনার্য নাম ইত্যাদি মনে করিয়ে দেয় প্রাক্-আর্য যুগের ভারতবর্ষের কথা।

জানালা খুলে অন্ধকারে বনশ্রেণীর দিকে চেয়ে বসে রইলুম। ঘুম আমায় চোখ থেকে চলে গেল। পয়সা খরচ করে দেশ বেড়াতে এসেচি

ঘুমোবার জন্যে নয়। আমার সহযাত্রী কিছুক্ষণ বসে ছিলেন, তারপর আবার শুয়ে পড়লেন। ট্রেনের কামরার মধ্যে কোনো শব্দ নেই, সবাই ঘুমুচ্চে, আমার নীরব উপভোগের বাধা জন্মায় এমন কোনো বিবাদী সুর কানে আসে না, মনে হ'ল বহুকাল ধরে চেয়ে থাকলেও চোখ আমার কখনো শ্রান্ত হয়ে উঠবে না, মন তার আনন্দকে হারাবে না।

রাত্রের অন্ধকারে সে বিশাল বনভূমির দৃশ্য যে না দেখেচে, সে পৃথিবীকে অত্যন্ত মহিমময় একটি রূপে আদৌ প্রত্যক্ষ করেনি, তার শিক্ষা এখনো সম্পূর্ণ হয়নি। বিশালের অনুভূতি মনে জাগায় এমন যে-কোনো দৃশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের বক্তৃতার চেয়েও অনেক মূল্যবান জিনিস শিক্ষার দিক থেকে। আমাদের দেশের স্কুল-কলেজ এখনও এ বিষয়ে উদাসীন, নতুবা প্রত্যেক ছুটিতে ছেলেদের নিয়ে দেশ বেড়াবার ব্যবস্থা করতো, পয়সা খরচ করে যদি নাও হয়, পায়ে হেঁটে যতদূর হয় তাও তো করা যেতে পারে।

আমার এই দৃঢ় ধারণা, যে দেশভ্রমণ করেনি প্রকৃতিকে বিভিন্নরূপে দেখেনি, কোথাও বা মোহন, কোথাও বা বিরাট, কোথাও রুক্ষ ও বর্বর—তার শিক্ষা সম্পূর্ণ হ'তে অনেক বাকি।

আমার সহযাত্রী এই সময় ঘুম থেকে উঠে আমায় বললেন—কোন্ স্টেশন গেল ?

আমি স্টেশনের নাম পড়িনি, তা জানালুম। তিনি উঠে বসলেন। বাইরের অরণ্যের চেহারা দেখে বললেন—ও, এবার বিলাসপুরের কাছাকাছি এসে পড়েচি, এ সব সম্বলপুরের ফরেস্ট।

—তাই নাকি ? আমি জানতুম না। চমৎকার দেখাচ্ছিল।

—ঘুমোননি বুঝি ? বসে বসে দেখছিলেন নাকি ?

—না, এই ঝার্সুগুডা থেকে একটু অমনি—

—আপনি নতুন আসচেন, আমি বহুবার দেখেচি এ সব। সেই টানেই তো আসি।

—আপনারও খুব ভালো লাগে এসব—না?

—খুব। কালাহাণ্ডি ফরেস্টের নাম শুনেচেন? আমার এক বন্ধুর সঙ্গে সেখানে শিকারে গিয়েচি—বড় ইচ্ছে করে আবার যেতে।

লোকটিকে এতক্ষণ ভালো চিনতে পারিনি। সম্ভ্রমে আমার মন পূর্ণ হয়ে গেল। পিপাসা থাকলেই হ'ল—না দেখলেও ক্ষতি নেই। পিপাসা আত্মার জিনিস—দেখাটা বহিরিন্দ্রিয়ের। মনের বেদীতে হোমের আগুন না নিবে যায়। সাগ্নিক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের মতো সে আগুন অতি যত্নে যে রক্ষা করে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত চলতে পারে, সে মৃত্যুকেও জয় করবে—কারণ তার চোখ ও মন তৈরী হয়ে গিয়েচে। তার আত্মায় স্পর্শ লেগেচে বিরাটের, অনন্তের।

আমার সহযাত্রী সোৎসাহে কালাহাণ্ডি ফরেস্টে শিকারের কাহিনী বলে যেতে লাগলেন। শুনতে শুনতে আমার কখন্ নিদ্রাবেশ হয়েচে জানিনে—হঠাৎ কতক্ষণ পরে যেন আমার কানে গেল কে বলচে—উঠুন, উঠুন, বিলাসপুর আসচে—জিনিস গুছিয়ে নিন্—ও মশাই—

তন্দ্রা ভেঙে গেল। ট্রেনের বেগ কমিয়েচে, বন পাহাড় অদৃশ্য, অন্ধকার কখন মিলিয়ে গিয়ে বেশ দিনের আলো ফুটেচে। দূরে একটা স্টেশনের ডিস্ট্যান্ট সিগন্যাল দেখা গেল। আমি জিনিসপত্র গুছিয়ে নিলাম, কারণ আমায় বিলাসপুরেই নামতে হবে। আকাশের দিকে চেয়ে দেখি ভয়ানক মেঘ করেচে, মন বড় দমে গেল মেঘ দেখে। আবার যদি বৃষ্টি শুরু হয় তবে এবারকারের বেড়ানোটা মাটি করে দেবে।

হ'লও তাই।

বিলাসপুর রেলওয়ে রেস্তোরাঁতে বসে চা খাচ্চি—এমন সময় ভীষণ

বৃষ্টি নামলো। সে বৃষ্টি থামবার কোনো লক্ষণ দেখলুম না ঘণ্টা-খানেকের মধ্যেও, অগত্যা বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতেই গিয়ে কাটনি লাইনের ট্রেনে চড়লুম।

আধঘণ্টা পরে ট্রেন ছেড়ে দিলে।

দুধারে শালের বন আর অনুচ্চ পাহাড়। রেলের জানালা দিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখি শ্রাবণ মাসের বর্ষাদিনের মতো নিবিড় মেঘাচ্ছন্ন চেহারাখানা আকাশের—মেঘের জোড় মিলিয়ে দিয়েচে—দুই মেঘের মধ্যে একচুল ফাঁক নেই আকাশের কুত্রাপি।

প্রমাদ গনলাম মনে মনে।

সূর্যের আলো না দেখতে পেলে মন আমার কেমন যেন মিইয়ে মুষ্‌ড়ে পড়ে। বর্ষাকালে বর্ষা ভালো লাগে না এমন কথা বলচিনে—কিন্তু পয়সা খরচ করে এতদূর বেড়াতে এসে যদি এমন অকালবর্ষা নামে, তবে মন খারাপ হওয়া খুব বেশি অস্বাভাবিক নয় বলেই আমার বিশ্বাস।

কয়েকটি মাত্র স্টেশন পেরিয়ে এসেই কার্গিরোড্‌—ছোট স্টেশনটা, চারিদিক পাহাড় ও বনে ঘেরা।

একরকম ভিজতে-ভিজতেই নামলুম গাড়ি থেকে। জনপ্রাণী নেই কেউ কোনোদিকে, কোথায় বা বন্ধুর লোক, কোনোদিকে একটা ঘোড়ার টিকিও দেখলুম না। জিনিসপত্র নিয়ে স্টেশনের টিকিটঘরের সামনে একটা বেঞ্চির ওপব বসে রইলুম।

হয়তো এমন হতে পারে, বন্ধুর প্রেরিত লোকটা ঘোড়া নিয়ে আসতে আসতে এই ভীষণ বৃষ্টিতে কোথাও আশ্রয় নিয়েচে—তাই সম্ভব। সে ক্ষেত্রে বৃষ্টিটা থামলেই সে এসে পড়বে।

অবিশ্রান্ত বৃষ্টি চললো মুষলধারে, ঘণ্টা দুই কাটলো—বেলা এগারোটা। কাছের একটা পার্বত্য ঝরনা ফুলে ফেঁপে উঠেচে—নালা দিয়ে তোড়ে

জল চলেচে—পাহাড় থেকে জলের তোড় নেমে রাস্তায় অনেকখানি ডুবিয়ে দিয়েচে।

বেলা এগারোটার পর বৃষ্টি একটু কম জোরে পড়তে লাগলো, একেবারে থামলো না—কিন্তু বন্ধুর প্রেরিত কোনো লোকের চিহ্নও দেখা গেল না রাস্তার ওপর।

আমি ঠায় বসে আছি বেঞ্চিখানার ওপর, মাদ্রাজী স্টেশন-মাস্টার একবার আমার দিকে চেয়ে দেখে নিজের বাসায় চলে গেল। স্টেশন জনহীন।

আমি পেছনের অনুচ্চ পাহাড়শ্রেণীর দিকে চেয়ে রইলুম অনেকক্ষণ। মেঘ যেন পাহাডের মাথায় এসে জড়িয়ে আছে—ভারি চমৎকার দেখাচ্চে—ঠিক এমনি দৃশ্য দেখেছিলুম—সেও ঠিক এমনিধারা এক বর্ষণ-মুখর দিনে—ফতেপুর সিক্রির বিখ্যাত বুলন্দ দরওয়াজার উঁচু খিলানের মাথায়, সবুজ বনটিয়ার ঝাঁক যেন মেঘের মধ্যে ঢুকচে আর বেরুচ্চে। মেঘের রাশ যেন জড়িয়ে জড়িয়ে পাক খাচ্চে বুলন্দ দরওয়াজার খিলানের কার্নিসে। এই বনবেষ্টিত নির্জন স্টেশনটিতে বসে কয়েক বৎসর আগে দেখা সে ছবিটা মনে এল।

মুশকিল হয়েচে, ছাতিটা পর্যন্ত আনিনি যে, না হয় জিনিসপত্র স্টেশনঘরে রেখে একটু পাহাড়ের ওপর গিয়ে বেড়িয়ে আসবো!

বেলা দুটো বাজলো স্টেশনের ঘড়িতে, মাদ্রাজী স্টেশন-মাস্টারটি বাসা থেকে ফিরে এল, বোধ হয় খাওয়া-দাওয়া সেরে ঘুমিয়ে উঠে এল এবং পূর্ববৎ একজায়গায় বসে আছি দেখে আমার দিকে চেয়ে দেখতে দেখতে স্টেশনঘরে ঢুকলো। কাটনি থেকে একখানা ডাউনট্রেন কিছুপরেই এল, মিনিট দুই দাঁড়ালো, ছেড়ে বিলাসপুরের দিকে চলে গেল।

চারিদিকে চেয়ে দেখেচি। এ বনের মধ্যে কোথাও একটা দোকান-

পসার চোখে পড়েনি যে এক পয়সার মুড়ি কিনে খাই। কিছু মেলে না এ বনে, নিকটে একটা বস্তি পর্যন্ত নেই। এমন জানলে বিলাসপুর থেকে কিছু খাবার কিনে আনতাম।

স্টেশন-মাস্টারকে জিগ্যেস করবো? কোনো দোকান না থাকলে ওরাই বা খাবার কোথা থেকে আনায়? কিন্তু জিগ্যেস করতে কেমন বাধো-বাধো ঠেকতে লাগলো। ভাবলুম, লোকটা মনে করতে পারে হয়তো তার বাড়িতেই আমি খেতে চাইচি। না, এ প্রশ্ন ওকে করা হবে না।

বেলা চারটে। তখন আমি সত্যিই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েচি। যদি লোক না-ই আসে, তবেই বা কি করবো? স্টেশনের দেওয়াল-সংলগ্ন টাইম-টেবিল দেখে বুঝলাম রাত সাড়ে সাতটায় বিলাসপুর ফিরে যাবার আর একখানা ডাউনট্রেন আছে—তাতেই ফিরে যাবো বিলাসপুরে এবং সেখান থেকে কলকাতায়। পয়সা খরচ করে এতদূরে অনর্থকই এলুম! এখানে বসে থেকেও তো আর পারিনে। সেই বেলা ন'টা থেকে আর বেলা চারটে পর্যন্ত না খেয়ে-দেয়ে ঠায় একখানা বেঞ্চির ওপর বসে আছি, স্টেশনটা মুখস্থ হয়ে গেল; এর কোথায় কি আছে আমি যতকাল বেঁচে থাকবো, তত-কাল নিখুঁত ভাবে মনে থাকবে এমন গভীর ভাবে এর ছবি আঁকা হয়ে গিয়েচে আমার মনে। অথচ বৃষ্টি মাঝে মাঝে থামলেও একেবারে নির্দোষ হয়ে থেমে যায়নি।

এই সময় স্টেশন-মাস্টারটি স্টেশন ঘর থেকে বেরিয়ে আবার নিজের বাসায় ফিরে চললো। যাবার সময় পুনরায় আমার দিকে কৌতূহলের দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে গেলো; একবার জিজ্ঞাসাও করে না যে আমি কে, কেন এখানে সেই সকাল থেকে বসে আছি দারুব্রহ্মের মতো অচল অবস্থায়—বেশ লোক যাহোক্!

স্টেশন আবার জনহীন। একে মেঘান্ধকার দিন, তায় হেমন্তের ছোট

বেলা, এরই মধ্যে যেন বেশ বেলা পড়ে আসে আসে হ'ল, মনে হ'তে লাগলো সন্ধ্যা হবার আর বেশি দেরি নেই। কি করা যায় এ অবস্থায়? রাত্রি কাটাতে হ'লে যতদূর বুঝচি, স্টেশন-মাস্টারের স্টেশনের ঘরখানার মধ্যে আমায় জায়গা দেবে না, এই বাইরের বেঞ্চিখানাতেই আমায় শুয়ে থাকতে হবে।

এমন সময় দূরে বাজনা-বাদ্যির শব্দ শোনা গেল। চেয়ে দেখি একদল লোক বাজনা বাজিয়ে স্টেশনের দিকে আসচে। কাছে এলে দেখলুম তারা বরযাত্রী, দশ-বারো বছরের একটি বালক বরসাজে ডুলি চেপে এসেচে ওদের সঙ্গে। আশ্বিন মাসে বিবাহ কি রকম? এদেশে বোধহয় হয়ে থাকে।

ওদের মধ্যে তিন-চারজন লোক এসে আমার বেঞ্চিতে বসলো। নিজেদের মধ্যে ওরা খুব গল্প-গুজব হল্লা করচে, একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম—কেউ কোনো-রকম ধূমপান করচে না। পরের পয়সায় ধূমপান করবার এমন সুযোগ যখন বরযাত্রী হয়ে এরা ছেড়ে দিচ্চে তখন মনে হ'ল ধূমপানের প্রথা এদেশে কম। পরে জেনেছিলুম, আমার অনুমানের মধ্যে অনেকখানি সত্যতা আছে। কাঁচা শালপাতা জড়ানো পিকা ছাড়া এদেশে বিদেশী চুরুট বা সিগারেটের চলন খুব কম।

একজন আমার দিকে চেয়ে হিন্দিতে বললে, বাবু, কোথায় যাবেন?

বাবা! এতক্ষণ পরে মানুষেব সঙ্গে কথা বলে বাঁচলুম। প্রাণ হাঁপিয়ে উঠেছিল কথা না বলে। বললুম, দারকেশা যাবো—

সে বিস্ময়ের সঙ্গে আমার দিকে চেয়ে বললে, দারকেশা! আপনি কোন্ গাড়িতে নেবেচেন? কোথা থেকে আসচেন?

—সকালের গাড়িতে। কলকাতা থেকে আসচি—

—তবে এতক্ষণ বসে আছেন যে?

সব খুলে বললাম। লোকটির চেহা । ও পরিচ্ছদ দেখে খুব উচ্চবর্ণের

বলে মনে হয়নি, এই বরযাত্রীর দলের মধ্যে কেউই উচ্চবর্ণের নয় এই আমার ধারণা, কিন্তু লোকটি ভদ্র ও অমায়িক। সব শুনে সে বললে, আপনার তো বড় কষ্ট হয়েচে দেখচি, সারাদিন বসে এভাবে, খাওয়া-দাওয়া হয় নি বোধহয়। আপনি কি করবেন এখন ?

—কি করবো, বুঝতে পারচিনে।

—দারকেশায় যাবেন কেন, সেখানে বড্ড বন, জংলী জায়গা—

শুনে আমার আরও আগ্রহ বাড়লো দারকেশা দেখবার জন্যে। সে জায়গা না দেখে চলে যাবো এত দূর এসে ? ওকে বললাম, কোনো ব্যবস্থা হতে পারে সেখানে যাবার ?

সে ওদের দলের দু-তিন জনকে ডেকে গোঁড বুলি মিশ্রিত হিন্দীতে কি পরামর্শ করলে, তারপর আমার দিকে চেয়ে বললে, সব ঠিক হয়ে গেল। আমাদের দলে যারা এসেচে, এদের মধ্যে তিনজন ডুলি নিয়ে ফিরে যাবে। আপনি ডুলি চেপে এখান থেকে ন-মাইল দূরে মান্‌সার বলে একটা গাঁয়ে যাবেন। সেখানে রাত্রিটা থাকবেন।

—কোথায় থাকবো ? ডাকবাংলো আছে ?

—সে ব্যবস্থা বলে দিচ্চি ডুলিওয়ালাদের। আপনি ওদের ডুলিভাড়া একটা দিয়ে দেবেন সেখানে গিয়ে। ওরা আপনাকে থাকবার জায়গা করে দেবে।

—তারপর আর বাকি পথ ? বত্রিশ মাইলের ন'মাইল হ'ল মোটে।

—আজ রাত তো সেখানে থাকুন। কাল সকালে উঠে একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

এই ব্যবস্থাই ভালো। ফিরে যাওয়া বা এখানে স্টেশনের ওজন-কলের মতো বসে থাকার চেয়ে এগিয়ে চলাই যুক্তি। ন'মাইল ন'মাইলই সই। লোকটিকে যথেষ্ট ধন্যবাদ দিয়ে আমি ডুলি চাপলাম।

উঁচু-নিচু পাহাড়ী পথ, তোড়ে জল চলেচে রাস্তার পাশের নালা দিয়ে। শালগাছ সর্বত্র। অভিজ্ঞ পণ্ডিতেরা মধ্যপ্রদেশের এই অংশকে Deccan trap-এর অন্তর্ভুক্ত বলে নির্দেশ করেচেন, শালবৃক্ষ এই অঞ্চলে সকলের চেয়ে বেশি জন্মায়।

স্টেশন ছাড়িয়ে প্রথমটা দু'ধারে অনেক পাহাড় পড়লো, তারপর রাস্তা অনেকখানি নিচু হয়ে গিয়ে একটা ঝরনা পার হয়েচে, তারপর খানিকটা সমতল প্রান্তর, ইতস্তত ছোট-বড শিলাখণ্ড ছড়ানো।

সেই মাঠের মধ্যে বেলা পড়ে এল। মেঘাচ্ছন্ন আকাশের তলায় সন্ধ্যার অন্ধকার ক্রমশ ঘন হয়ে নামচে। আমার ডুলির পেছনে পেছনে ওদের মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তিটি আমার জিনিসপত্র মাথায় করে নিয়ে আসছিল। তাকে দেখে আমার মনে হ'ল লোকটি নিতান্ত ক্ষীণজীবী, দুর্ভিক্ষের আসামী। ডুলি-বাহকদের একজনকে বললুম, এ বেচারী মোট বইতে পারচে না; তোমরা কেউ জিনিস নিযে ওর কাঁধে ডুলি দাও।

তারা হেসে বললে—বাবু, চুপ করে বসুন, ও একজন ভালো শিকারী। গায়ে ওর খুব জোর—কোনো ভাবনা নেই।

—কি শিকার করে?

—হরিণ মারে, ভাল্লুক মারে। সব কিছু মাবে—

—কোন্ জঙ্গলে শিকার করে?

—আপনি যেখানে যাবেন বাবু সেখানে খুব বড জঙ্গল আছে। সেখানে ও গিয়েচে অনেকবার।

শুনে লোকটার প্রতি আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা হ'ল। ওর দিকে ভালো করে চেয়ে দেখলুম, গায়ে চর্বি বোধহয় এক আউন্সও নেই, কিন্তু লোহার তারের মতো শক্ত দড়ি-দড়ি হাত-পা। গলাটা যেন একটু বেশি লম্বা, চক্ষুদুটির

দৃষ্টি তীক্ষ্ণ, গলায় হাড় বেরুনো, চেহারায় দস্তুরমত বিশেষত্ব আছে। বার বার চেয়ে দেখতে ইচ্ছে হয়।

পথে বেশ অন্ধকার হ'ল।

আমার একটু ভয় যে হয়নি, একথা বললে মিথ্যে কথা বলা হবে। সঙ্গে তিনজন অপরিচিত লোক, স্যুটকেসে কিছু টাকা-কড়িও আছে, জামায় সোনার বোতাম আছে, হাতঘড়ি আছে, এই পাহাড়ী জায়গায় এদের বিশ্বাস কি।

জিগ্যেস্ করলুম—মানসার আব কতদূর হে ?

—আর বাবু তিন মিল।

ওদের তিন মিল আর শেষ হয় না, তাবপর তুঘণ্টা কেটে গেল। ডুলির বাইরে বড অন্ধকার হয়ে এসেচে, কিছু দেখা যায় না, তবে মনে হচ্ছে মাঝে মাঝে শালবন, মাঝে মাঝে ছোট-বড পাহাড পডচে রাস্তার তু'ধারে, ঝরনার জলের শব্দও পাচ্চি।

আজ দেবীপক্ষের সপ্তমী, অথচ মাঠ বন ঘুট-ঘুটে অন্ধকার।

আরও কিছুক্ষণ পরে দূরে অন্ধকাবের মধ্যে তু একটা আলো দেখা গেল। একটা ছোটমতো খালের হাঁটুজল পেরিয়ে আমরা মানসারে পৌঁছে গেলুম।

ওরা বললে—বাবু, আপনাকে থাকবার জাযগায় দিয়ে আসি। কাল সকালে এসে আবার আমবা দেখা করবো।

একটা বড চালাঘরে ওরা আমায নিয়ে গেল। ঘরের সামনেটা একেবারে ফাঁকা, তিনদিকে কিসের বেড়া দেওয়া অন্ধকারে ভালো ঠাওর হ'ল না। একটা আলো পর্যন্ত নেই, ভীষণ অন্ধকার। আমি তো অবাক, এ রকম ঘরে জিনিসপত্র নিয়ে রাত কাটাবো কেমন করে ?

বললুম, এ কারো বাড়ি, না কী এটা ?

আমাদের মণ্ডপ-ঘর। সাধারণের জন্যে সাধারণের চাঁদায় তৈরী। এখানে থাকুন, কোনো ভয় নেই। আমি খুব আশ্বস্ত হলুম না। আর কোনো কিছুর ভয় না থাকলেও সাপের ভয় যে আছে, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। মধ্যপ্রদেশের এই সব বনাঞ্চলে শুনেচি নাকি শঙ্খচূড় (King Cobra) সাপের খুব প্রাদুর্ভাব।

ওদের বললুম কথাটা। ওরা আমায় নানাপ্রকারে আশ্বাস দিলে। সাপ কখনো তারা চোখে দেখেনি, সাপ কাকে বলে তারা জানেই না। আমি নির্ভয়ে এ ঘরে রাত্রি যাপন করতে পারি।

কিন্তু সাপ যদি না-ও থাকে, এ খোলা জায়গায় চোরের ভয়ও কি নেই? নিশ্চয়ই এখনো এদেশে সত্যযুগ চলচে না।

ওরা আমার কথা শুনে হাসলে। চুরি নাকি এদেশে অজ্ঞাত। তাদের জ্ঞানে কখনো মানসারে চুরি হয়নি। বিশেষ করে বিদেশী লোকের জিনিস কেউ ছোঁবেও না।

আমাকেই রান্না করতে হ'ল রাত্রে। যবের রুটি, ঢেঁড়সের তরকারি ও দুধ। এদেশে আটার রুটি খাওয়ার প্রচলন তত নেই—বাজার থেকে আটা ময়দা এরা বড় একটা কেনে না। নিজেদের ক্ষেত্রোৎপন্ন যব, গম ও মকাইয়ের রুটিই সারা বছর খায়। গম খুব বেশি হয় না বলেই তার সঙ্গে যব ও মকাই যোগ না করলে বছর কাটে না। অনেক সময় যব, গম ও মকায়ের ছাতু—তিন দ্রব্যের সংমিশ্রণেও রুটি তৈরি করা হয়।

রাত্রে সুনিদ্রা হ'ল। পরদিন সকালে উঠতেই গ্রামের অনেক লোক আমার সঙ্গে দেখা করতে এল। তাদের মুখে খবর নিয়ে জানা গেল মাত্র পঁচিশ-ত্রিশ ঘর লোকের বাস এ গ্রামে। প্রধান উপজীবিকা চাষ ও লাক্ষা-সংগ্রহ। লাক্ষাকীট পোষা ও সংগ্রহ করে মাড়োয়ারী মহাজনদের কাছে

বিক্রি করা সারা উড়িষ্যা, ছোটনাগপুর ও মধ্যপ্রদেশের একটি প্রধান কুটীর-বাণিজ্য।

আকাশের দিকে চেয়ে প্রমাদ গনলাম। আবার ভয়ঙ্কর মেঘ জমা হয়েচে, বর্ষা দেখচি নামলো কালকের মত। এই বর্ষার মধ্যে এই আশ্রয় ছেড়ে রওনা হব কিনা ভাবতে ভাবতে বৃষ্টি নামলো সত্যিই।

প্রথমে ফোঁটা ফোঁটা, তারপর মুষলধারায়, সঙ্গে সঙ্গে ঝড়। সেই সময়টা আমার ঘরে কেউ নেই, সবাই গল্প করে উঠে গিয়েচে। একটি বালক ভিজতে ভিজতে এক ঘটি দুধ নিয়ে এল আমার জন্যে।

আমি তাকে বলি—চা পাওয়া যায় না এখানে?

—না বাবু-সাহেব।—এ কথা আমার আদৌ মনে ছিল না যে বন-জঙ্গলের দেশে চা পাওয়া যাবে না হয়তো। মনে পড়লে বিলাসপুর থেকেও তো নিতে পারতুম। অগত্যা গরম দুধ খেয়ে চায়ের পিপাসা দূর করতে হ'ল। ছেলেটি দুধ জ্বাল দিয়ে দিলে। দুধ এক সেরের কম নয়; আমি ওকে বললুম—কত দাম দেবো?

সে বললে, প্রধান বলে দিয়েচে বাবু-সাহেবের কাছে দুধের দাম নিবিনে।

—তোর দুধ?

—হাঁ বাবুজি, আমাদের বাড়ির দুধ। মা দিয়েচে।

—তোর জল-খাবার বলে দিচ্চি—দুধের দাম না হয় না নিবি!

—না বাবু-সাহেব, পয়সা আমি নিতে পারবো না।

—আমি তোকে বকশিস্ দিতে পারিনে?

—না বাবু, আমরা বকশিস্ নিইনে। আমরা মাহাতো, গোয়ালা—দুধই বেচি।

না, একে দেখচি কিছু বোঝানো যাবে না। ভিজতে ভিজতেই ছোকরা

চলে গেল। দুপুরের আগে সে-ই আবার এল কিছু চাল ও ঢেঁড়স্ নিয়ে। নুন তেল কাল রাত্রের দরুন কিছু অবশিষ্ট ছিল। ওর সাহায্য নিয়ে ভাত ও ঢেঁড়স্-ভাতে রান্না করলুম—দুধ ছিল আধ-সেরের ওপর, সেটা আর একবার গরম করে নিলাম। খাওয়া শেষ হ'ল; ছোকরাকেও খেতে বললুম, সে আপত্তি করলে।

বেলা দুটোর সময় আকাশ বেশ পরিষ্কার হয়ে রোদ উঠলো। গ্রামের লোক দেখা করতে এল, ওদের চাল-ডালের দাম দিতে গেলে কিছুতেই নিলে না। মণ্ডপঘরে যারা আশ্রয় নেয়, তারা গ্রামের অতিথি। প্রধানেরা এ সব ব্যবস্থা করে, গ্রাম-ভাটি থেকে এর খরচ হওয়ার প্রথা এদেশে বহু প্রাচীন।

আমি বললুম—বেশ, গ্রাম-ভাটিতে কিছু চাঁদা দিতে কোনো আপত্তি হতে পারে কি?

—না বাবু-সাহেব, অতিথির কাছ থেকে কিছু নেওয়া নিয়ম নেই।

সত্যিকার ভারতবর্ষকে চিনতে হ'লে এ ধরনের গ্রামে, অরণ্যে, পাহাড়-পর্বতে, নানা শ্রেণীর লোকের সঙ্গে মিশে পায়ে হেঁটে বেড়াতে হয়। ট্রেনের ফার্স্ট ক্লাসে বেড়ালে আর যাকেই চেনা যাক, চীরবাসা ভৈরবী ভারত-মাতাকে চেনা যায় না।

বেলা দুটোর পরে ওরা একটা ঘোড়া ভাড়া করে দিলে। ঘোড়ার সহিসই আমার জিনিসপত্র নিয়ে ঘোড়ার সঙ্গে যাবে ঠিক হ'ল। দারকেশা পর্যন্ত ঘোড়ার ভাড়া ও সহিসের মজুরি ধার্য হ'ল পাঁচ টাকা।

আমি রওনা হয়ে পথে বেরিয়েচি—মাইল দুই এসে দেখি দুজন লোক আসচে, একটা ছোট টাট্টু ঘোড়ায় চড়ে একজন, ঘোড়ার পেছনে পেছনে আর একজন।

আমাকে দেখে ওরা দাঁড়িয়ে গেল। আমিও ঘোড়া থামালুম।

—তোমরা কোথায় যাচ্চ ?

—কার্গি রোড স্টেশনে। প্রতাপবাবু পাঠিয়েচেন। বাবুজি কি কলকাতা থেকে আসচেন ? আপনার নাম ?

আমি বললুম—এত দেরি করে এলে কেন ? তোমাদের জন্যে স্টেশনে বসে বসে কাল হয়রান হয়েচি।

আসলে এদের চিঠি পেতে দেরি হয়েছিল। এ সব জংলী জায়গায় চিঠি বিলি হ'তে দু-একদিনের এদিক-ওদিক হয়ে যাওয়া খুব অস্বাভাবিক ব্যাপাব নয়।

আমি আমার আগের ঘোড়াকে বিদায় দিয়ে নতুন ঘোড়ায় চড়লুম। নতুন সঙ্গীদেব বললুম—বেলা তো এখুনি যাবো-যাবো হ'ল, রাত্রে কোথায় থাকা যাবে ?

ওরা বললে—চোরামুখ গালার কারখানায়।

—সে কতদূর ?

—এখনও বাবুজি, আট মাইল। রাত সাতটায় সেখানে পৌঁছবো।

পথের সৌন্দর্য সত্যিই বড় চমৎকার। পথের বাঁ-পাশে একটা ছোট নদী এঁকে বেঁকে চলেচে, অভ্রকণা মেশানো বড বড় শিলা দিয়ে তার দুই পাড যেন মাঝে মাঝে বাঁধানো। এক একটা গাছের কি আকা-বাঁকা ভঙ্গি ! পডশী ও ভেলা গাছ এ অঞ্চলে প্রায় সর্বত্র, কিন্তু কোথাও বেশি বড় বন নেই।

একটা পাহাডের আডালে সূর্য অস্ত যাওয়ার দৃশ্যটা সুন্দর লাগলো। তখন আকাশ অনেকটা পরিষ্কার হয়ে স্থানে স্থানে নীল রং বেরিয়ে পড়েচে। কিছুক্ষণ পরে অন্ধকার হয়ে এল, তারপরেই অস্পষ্ট জ্যোৎস্না ফুটলো।

দুতিনটি বস্তি পার হওয়া গেল রাস্তায়। একটা বস্তিতে কি একটা পাঠ হচ্চে। চাঁদোয়ার নিচে বাতি জ্বলচে, অনেকগুলি মেয়ে-পুরুষ পাঠককে

ঘিরে দাঁড়িয়ে শুনচে। আমাদের দেশের কথকতার মতো। সন্ধ্যার পর বন আর চোখে পড়ে না, শুধুই একঘেয়ে মোরুম ছড়ানো বড় বড় মাঠ—এ মাঠে যদি ডাকাত প'ড়ে আমাদের সবাইকে খুন করেও যায়, তাহ'লেও কেউ দেখবে না। কোনো দিকে লোক নেই, একটা বস্তির আলোও চোখে পড়ে না। আমার মনে হয় পূরো দুঘণ্টা লাগলো এই বিস্তীর্ণ প্রান্তর পার হ'তে, অবিশ্যি ঘোড়া ছুটিয়ে যাবার উপায় ছিল না আমার—কারণ পথ চিনি না, সঙ্গের দুজন লোক ঘোড়ার পাশে হেঁটে যাচ্চে—তাদের ছাড়িয়ে যাওয়া চলে না।

প্রায় যখন সাড়ে সাতটা, তখন দূরে আলো দেখা গেল।

ওরা বললে—ওই চোরামুখ বস্তির আলো।

বেশ শীত করচে, বোধ হয় বাদলার হাওয়া আর এই একদম খোলা মাঠের জন্যেই। অগ্রহায়ণের প্রথমে যেমন শীত পড়ে বাংলা দেশে, সেই রকম শীতটা। গরম কাপড় সঙ্গে বিশেষ কিছু আনিনি, মনে হ'ল না-এনে বড় ভুল করেচি।

চোরামুখ পৌঁছে একটা বড় গোলার কুলি-ধাওড়ার মতো ঘরে ওরা আমায় ওঠালে। ওদের সঙ্গে কোনো আলো নেই—আমার সঙ্গেও না—জায়গাটা নিতান্ত অন্ধকার। জিনিসপত্র নামিয়ে বিশ্রাম করচি, এমন সময় আমার নজরে পড়লো ঘরটার সামনের রাস্তা দিয়ে বাঙালী ধরনের ধূতি-কামিজ পরা একজন লোক যাচ্চে—কিন্তু অস্পষ্ট জ্যোৎস্নার আলোয় ঠিক চিনতে পারলুম না লোকটি বাঙালী কি না।

আমি ওদের বললুম—এখানে দোকান আছে তো?

—হ্যাঁ বাবু, ছোট একটা বাজার আছে—সব পাওয়া যায়।

ওদের পয়সা দিলাম চাল আলু ইত্যাদি কিনে আনতে। মোমবাতি যদি পাওয়া যায়, তাও আনতে বলে দিলাম। আমি অন্ধকারে বসে আছি

চুপ করে—প্রায় মিনিট কুড়ি পরে দেখি আগের সেই বাঙালী-পোশাক পরা লোকটি সামনের রাস্তা দিয়ে যেদিক থেকে এসেছিল, সেদিকে যাচ্ছে। দু-একবার ডেকে জিগ্যেস করবার ইচ্ছে হ'লেও শেষ পর্যন্ত চুপ করেই রইলুম।

তারপর আমার লোক দুটি জিনিসপত্র নিয়ে ফিরে এল। ওরা মোম-বাতি পায়নি—কিন্তু মহুয়ার তেল ও মাটির প্রদীপ কিনে এনেচে। দড়ি দিয়ে সল্‌তে করে মাটির প্রদীপই জ্বালানো গেল। পাথর কুড়িয়ে এনে উনুন করে ঘরের এককোণে রান্না চড়িয়েচি ওদের সাহায্যে—ভাত প্রায় নামে নামে—এমন সময় পেছন থেকে কে পরিষ্কার বাংলায় বলে উঠলো—মশাই কি বাঙালী ?

পিছন দিকে চেয়ে দেখি সেই বাঙালী-পোশাক পরা লোকটি। বললুম, আজ্ঞে হ্যাঁ, বাঙালীই বটে। কলকাতা থেকে আসচি।

ভদ্রলোক মহা খুশি হ'লেন মনে হ'ল। বললেন—তা এখানে কি করচেন ?

আমি সংক্ষেপে সব ব্যাপার খুলে বললুম। তিনি ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে বলে উঠলেন—তাও কি কখনো হয়! আপনি বাঙালী, এখানে এসে হাত পুড়িয়ে বেঁধে খাবেন ? আসুন, চলুন। ওসব যা রাঁধচেন, আপনার সঙ্গের লোক খাবে এখন। আপনি চলুন আমার বাড়ি।

—আপনি কি করে জানলেন আমার কথা ?

—বাজারে শুনলাম। বললে, এক বাঙালী বাবু কলকাতা থেকে এসেচেন, দারকেশা যাচ্চেন, আপনারই গুদামে আশ্রয় নিয়েচেন—চাল-ডাল কিনে এনেচে আপনার লোক তাও জানি।

—এ বুঝি আপনার গুদাম ?

—এখানে জংলী গালা রাখা হয়, আমারই ঘরটা বটে।

ভদ্রলোকের সনির্বন্ধ অনুরোধ, এড়াতে না পেরে গেলুম ওঁর সঙ্গে। মিনিট পাঁচ-ছয় সোজা রাস্তায় গিয়ে তারপর একটা সরু পথ গিয়েচে বাঁ-দিকে। সে পথে গিয়ে কাঠের পুলের ওপর দিয়ে বাঁ দিকের সেই যে পাহাড়ী নদী বা ঝরনা, আমাদের সঙ্গে রাস্তার সমান্তরাল ভাবে অনেকদূর থেকে চলে আসচে, সেইটে পার হওয়া গেল। ঝরনাটা পার হয়ে আবার একটু উঁচুদিকে উঠে মাঠের রাস্তায় আরও মিনিট তিন-চার হাঁটবার পর একখানা খোলার বাংলো ধরনের পাঁচিল-ঘেরা বাড়ির সামনে এসে তিনি বললেন, আসুন, এই হ'লো গরিবের কুঁড়ে। বসুন এখানে। চা খান তো? বাড়িতে বলে আসি। আপনি বাঙালী, বড় আনন্দ হ'ল, বাঙালীর মুখ কতদিন যে দেখিনি!

সত্যই ভদ্রলোককে মনে হচ্ছিল যেন কতকালের পুরাতন পরিচিত আত্মীয়। বিদেশে না যে কখনো বার হয়েচে, সে বুঝবে না দূরদেশে একজন বাঙালীর দেখা পাওয়া কি আনন্দের ব্যাপার।

অল্পক্ষণ পরে ভদ্রলোক এসে বসলেন—চা-ও এল।

আমি বললুম—এখানে কতদিন আছেন?

—তা আজ সতেরো বছর, কি তার কিছু বেশি।

—কি উপলক্ষ্যে থাকা হয় এখানে?

—আমার একটা গালার কারখানা আছে, দেখাবো এখন। তাই নিয়ে পড়ে আছি—এই তো চাকুরির বাজার।

—না না, বেশ ভালো করেচেন। আপনি বাঙালী, এতদূর এসে গালার কারখানা খুলেচেন, এ খুব গৌরবের কথা। চলচে বেশ ভালো?

—আজ্ঞে হাঁ, তা এক রকম আপনার বাপ-মায়ের আশীর্বাদে; তবে কি জানেন, এতদিন যা হয় হয়েচে, মন আর এখন টেকে না।

—আপনার বাড়ির সব এখানেই বোধ হয়। তবে আর মন টেকাটেকি কি, সব নিয়েই যখন আছেন।

ভদ্রলোক তখনকার মতো চুপ করে গেলেন আমার মতে সায় দিয়ে, দু'একবার নিরুৎসাহ-সূচক ঘাড় নেড়ে। রাত্রে বাড়ির মধ্যে খেতে গিয়ে দেখি বৃদ্ধা মাতা ছাড়া ভদ্রলোকের সংসারে দ্বিতীয় লোক নেই, সম্ভবত আর একটি ছোট ছেলে বা মেয়ে থাকে, সে তখন পাশের ঘরে ঘুমুচ্ছিল।

ঘরদোরের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ ও অগোছালো। বাড়ির পেছনে একটা সংকীর্ণ উঠান, তার মধ্যে কিসের একটা মাচা; উঠানটাতে বেজায় কাদা হয়েচে ক'দিনের বৃষ্টিতে। মাটির কলসীতে জল রাখা মাচাতলার নিচে। ইতিপূর্বে ভদ্রলোকের নাম জেনেছিলাম; তিনি ব্রাহ্মণ, নদীয়া জেলায় বাড়ি একথাও জেনেচি। তাঁর বৃদ্ধা মাকে পায়ের ধূলো নিয়ে প্রণাম করলুম।

খাওয়ার আয়োজন বিশেষ কিছু নয়। মোটা চালের ভাত, ডাল ও ঢেঁড়সের তরকারি, বড়ি ভাজা। এদেশে কোনো তরি-তরকারি বা মাছ বড একটা মেলে না—ঢেঁড়স ও টোমাটো ছাড়া। খাওয়া-দাওয়ার বড কষ্ট। এসব কথা শুনলাম ভদ্রলোকের কাছেই।

খাওয়ার পরে যেতে উদ্যত হলুম, ভদ্রলোক অবাক হয়ে বললেন—কোথায় যাবেন? সেই খোলা গুদোমে? আপনি বেশ লোক তো! এখানে আপনাকে রাত্রে একটু জায়গা দিতে পারবো না বুঝি?

রাত্রে শোবার আগে ওঁর অনেক কথাই বললেন আমার কাছে। ভদ্রলোকের দুবার স্ত্রীবিয়োগ হয়েচে—এই বয়সে সংসার শূন্য, একটি মাত্র আট বছরের ছেলে আছে। বৃদ্ধা মায়ের কষ্ট আর চোখে দেখা যায় না। নিজের বয়স হয়েচে পঁয়ত্রিশ মাত্র।

ভদ্রলোকের মন বুঝে বললুম—আপনার বিবাহ করা উচিত পুনরায়।

ভদ্রলোক ঘাড় নেড়ে বললেন—তা মশায় হয় কি করে। এখানে থেকে কোনো যোগাযোগ করা অসম্ভব।

—কেন ?

—সন্ধান পাই কোথা থেকে বলুন। বাঙালীর মুখই দেখিনে। সেই তো হয়েচে মুশকিল।

কিছুক্ষণ একথা-ওকথার পর ভদ্রলোক বললেন—আপনি কতদিন এদেশে থাকবেন ?

—কত আর, দিন কুড়ি কি একমাস।

—ফিরে গিয়ে দয়া করে যদি একটি মেয়ের সন্ধান করে দেন তবে বড়ই···এই দেখুন বুড়ো মা একা সংসারের সব খাটুনি খাটেন, তারপর ছেলেটির যত্ন করা, তাও তেমন হয় না, সংসারের কতদিক একা দেখবো বলুন।

—বেশ, বেশ, আমি ফিরে গিয়ে নিশ্চয়ই চেষ্টা করবো—

—আমরা ভট্টাচাজ্যি, রাঢ়ী শ্রেণী। আগের বিয়ে কোথায় করেছিলাম, সে ঠিকানাও আপনাকে দিচ্চি। যাঁরা মেয়ে দেবেন, তাঁরা সন্ধান নিয়ে দেখতে পারেন, বংশে কোনো খুঁত নেই আমাদের।

সকালে উঠে আমাকে তিনি গালাব কারখানায় নিয়ে গেলেন। বড় বড় মাটির গামলায় বোধহয় গালা ভিজানো আছে, চামড়ার কারখানার মতো ভীষণ দুর্গন্ধ, আর ভারি অপরিষ্কার সমস্ত জায়গাটা। খুব বড় খোলার ঘর, লম্বা ধরনের। যে গুদামটাতে রাত্রে ছিলাম, ঠিক তেমনি ধরনের কুলি-ধাওড়ার মতো সেই ঘরটা।

বললুম—গালা কোথা থেকে কেনেন ?

—জংলী গালা গোঁড় মেয়েরা বিক্রী করতে আসে, তাই কিনি। এখানে আরও দুটো কারখানা আছে মাড়োয়ারীদের।

—কি রকম আয় হয় কারখানা থেকে, যদি কিছু মনে না করেন ?

—মনে করবো কেন বলুন। তা মাসে গড়ে শ-দেড়েক টাকা দাঁড়ায়, খরচ-খরচা সব পুষিয়ে। তবে আরও বাড়াতুম, কিন্তু কাজে মন লাগচে না মশাই।

নিতান্ত খারাপ আর নয়, একজন বাঙালী ভদ্রলোক এতদূরে এসে স্বাধীন ব্যবসা চালাচ্চেন মাড়োয়ারী বণিকদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে, কেরানিগিরি না করে। এতে আনন্দ হবার কথা বটে। আমি তাঁকে বোঝালাম অনেক, নিরুৎসাহ হওয়ার কারণ নেই, সব ঠিক হয়ে যাবে, তিনি ব্যবসা যেন না ছাড়েন।

সকালে চা খেয়ে ওঁদের কাছে বিদায় নিলাম।

ভদ্রলোক আমার সঙ্গে কিছুদূর পর্যন্ত এলেন। দু তিনবার আমায় জিজ্ঞাসা করলেন আমি কলকাতায় ফিরে সব ভুলে যাবো না তো? বিশেষ করে তাঁর বিষয়টা। আরও বললেন—যাবার সময় এই পথেই তো ফিরবেন, আমার সঙ্গে না দেখা করে যেন যাবেন না।

বললুম—নিশ্চয়ই, এ পথে ফিরবার সময় মায়ের হাতের রান্না না খেয়ে কি যাবো ভেবেচেন ?

—ওকথাটা তাহ'লে—

—হ্যাঁ হ্যাঁ। সে আমার মনে রইল। বিশেষ চেষ্টা করবো জানবেন।

বন্ধুর পথের বাঁকে আমার ঘোড়া ও লোকজন অদৃশ্য হয়ে যাওয়া পর্যন্ত ভদ্রলোক চোরামু। বস্তির শেষপ্রান্তে একটা গাছের তলায় দাঁড়িয়ে ছিলেন, পিছন ফিরে দু একবার রুমালও উড়িয়েছি।

ফিরবার সময় এপথে ফিরিনি, ভদ্রলোকের সঙ্গে আর দেখাও হয়নি।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করি, দেশে ফিরে ভদ্রলোকের বিবাহের জন্য আমি দু-তিন জায়গায় মেয়ে সন্ধান করেছিলাম—আমার স্বগ্রামস্থ এক

প্রতিবেশীর বিবাহযোগ্যা কন্যা ছিল, তাদের কাছেও কথা পেড়েছিলুম। ভদ্রলোকের ঠিকানা দিয়ে পত্র-ব্যবহার করবার অনুরোধও করি।

কিন্তু যে ক'টি পাত্রীর সন্ধান করেছিলাম, তাদের অভিভাবকদের মধ্যে কেউই অত দূর বলে জঙ্গলের দেশে মেয়ের বিবাহ দিতে রাজি হননি।

আমার স্বগ্রামের পাত্রীটির বাপ একরকম রাজি হয়েছিলেন কারণ তাঁর অবস্থা তত ভালো ছিল না, কিন্তু মেয়ের মা ভয়ানক আপত্তি তোলেন।

আমায় ডাকিয়ে বললেন, অমন সীতা-নির্বাসনে কে মেয়ে দেবে বাপু? আমার মেয়ে তো ফেল্‌না নয়, সেখানে গিয়ে কথা বলবার লোক পাবে না, হাঁপিয়ে উঠবে।

যাক্ সে কথা। চোরামুখ ছাড়িয়ে বেলা দশটার সময় আমরা পৌঁছে গেলুম সালকোণ্ডা বলে একটা ছোট গাঁয়ে। রাস্তার ধারেই একটা চুনের ভাঁটি আছে, আশেপাশে অনেকগুলো বড়-ছোট চুনের ভাঁটি। এখানে অনেকগুলি গোঁড় কুলি কাজ করে, তাদের জন্যে বড বড কুলি-ধাওড়া খান পাঁচ ছয় ভাঁটির আশেপাশে ছড়ানো। জায়গাটাব দৃশ্য বেশ ভালো লাগলো আমার কাছে। চারিধারে বড় বড শাল ও ভেলা গাছ, মাঝে মাঝে ধাতুপ ফুলের ঝোপমতো গাছ—একদিকে তো ধাতুপ ফুলেরই বেডা। শাল গাছের ফাঁক দিয়ে একটা পুকুর দেখা যাচ্ছে কিছু দূরে। দূরে ও নিকটে শৈলশ্রেণী, প্রকৃতপক্ষে স্থানটির চারিধার ঘিরেই শৈলমালা, মধ্যে যেন একটি বড় উপত্যকা।

এই অঞ্চলের সব বন পাহাড় ও গ্রাম 'ছত্তিশ গড়ি' পরগনার মধ্যে পড়ে।

পূর্বে এই দিকের সব স্থান মারাহাট্টা সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল, এখনও অনেক ছত্তিশ গড়ি মারহাট্টা পরিবার এই সব গ্রামের অধিবাসী। তবে স্থানীয় আদিম অধিবাসী গোঁড়দের সংমিশ্রণে এদের অনেক পরিবর্তন

হয়েচে, অনেক জায়গায় উভয় জাতির আচার-ব্যবহার উভয়ের মধ্যে বিস্তৃতিলাভ করেচে, বিশেষ করে এই সব দুর্গম বন্য-অঞ্চলে।

চুনের ভাঁটির গদিতে বসে কাজ করচেন জনৈক মারাঠী ভদ্রলোক। তাঁর চেহারা ও পোশাক-পরিচ্ছদ, মাথার মুরাঠা সবই আমার চোখে অদ্ভুত লাগলো। আমি তাঁর দিকে চেয়ে আছি দেখে তিনি উঠে এলেন আমার কাছে। হিন্দীতে বললেন—আপনি কোথা থেকে আসচেন? আমি পরিচয় দিতে তিনি যথেষ্ট বিনয়ের সঙ্গে বললেন—আসুন, আমার গদিতে একটু বসুন।

গিয়ে বসলুম তাঁর সঙ্গে। ভদ্রলোকের চেহারা এমনি, যে বার বার চেয়ে দেখতে ইচ্ছে হয়; সুন্দর বলে ততটা নয়, যতটা কিনা আমার চোখে অপরিচিত সাজপোশাক ও মুখের গড়নের জন্যে।

আমায় বললেন—আজ আমার ওখানে দয়া করে থাকতে হবে। আমার বন্ধু অনেক বাঙালী আছেন, আমি বাঙালীদের বড় ভালোবাসি। আমি বিশ্বাস করি ভারতবর্ষের জাতীয় জাগরণের মূলে রয়েচে বাঙালী। এই সম্পর্কে তিনি সুরেন্দ্রনাথ ও চিত্তরঞ্জনের নাম উল্লেখ করলেন বারবার, অত্যন্ত সশ্রদ্ধ-ভাবে। বাংলাদেশ থেকে বহুদূরে ছত্তিশ গড়ির শৈলারণ্য-বেষ্টিত ক্ষুদ্র এক গ্রামে এক চুনের ভাঁটিতে বসে আমার মাতৃভূমির দুজন সুসন্তানের নাম উচ্চারিত হ'তে শুনে গর্বে, আনন্দে আমার বুক ভরে উঠলো।

ভদ্রলোক নিজের পরিচয় দিলেন। নাম বালকৃষ্ণ ত্র্যম্বক, রংড়ে ব্রাহ্মণ, বাড়ি খাণ্ডোয়া নাগপুরের ওদিকে। এখানে এই চুনাপাথরের খনি ইজারা নিয়ে ভাঁটিতে চুন পুড়িয়ে মোটর লরি করে এগারো ক্রোশ দূরবর্তী রেলওয়ে স্টেশনে চালান দেন। আমি যে পথে এসেচি, ও পথে বা স্টেশনে নয়, কারণ ওটা মোটর গাড়ি চলাচলের উপযুক্ত রাস্তা নয়।

বালকৃষ্ণ ত্র্যম্বক আমাকে তাঁর বাসায় নিয়ে গেলেন। তাঁর স্ত্রী, দুই

মেয়ে ও একটি দশবৎসরের ছেলে থাকে বাসায়। সকলেই আমার সামনে বার হ'লেন বটে মেয়েরা, কিন্তু কথা কেউই বললেন না।

গৃহস্বামী জিগ্যেস্ করলেন—আপনি স্নান করুন। জল তুলে দেবে, না পুকুরে নাইবেন ?

—পুকুরের জল ভালো ?

—খুব ভালো, এমন জল কোথাও দেখবেন না।

সত্যিই শালবনের মধ্যে পুকুরটিতে স্নান করে খুব আরাম হ'ল। আজ মেঘ মোটেই নেই আকাশে, বেশ রৌদ্র চড়েচে, এতখানি ঘোড়ায় চড়ে এসে গরম বোধ হচ্ছিল দস্তুরমত। তা ছাড়া, চালবিহীন ঘোড়ায় চড়ার দরুন পেটে খিল ধরে গিয়েচে।

বালকৃষ্ণজী বললেন—আমরা কিন্তু মাছমাংস খাইনে বাবুজী—আপনার বড় অসুবিধে হবে খেতে।

আমি শশব্যস্ত হয়ে বললুম—কি যে বলেন। তাতে হয়েচে কি ? আমি মাছমাংসেয় ভক্ত নই তত।

খাবার জিনিস অতি পরিপাটি। 'তুপ' অর্থাৎ ঘিয়ে ডোবানো মোটা আটার রুটি, কুমড়োর ছোঁকা, পাঁপর, ছোলার ডাল, চাটনি ও মহিষের দুধের দই। বালকৃষ্ণ ত্র্যম্বক একা আহার করলেন আমার মতো সাতজনের সমান। সেই মোটা রুটি আমি চারখানাব বেশি ওদের অত্যন্ত অনুরোধ সত্ত্বেও খেতে পারলাম না, উনি খেলেন কম্‌সে কম ষোলখানি। সেই অনুপাতে ডাল-তরকারি ও দইও টানলেন।

আহারাদির পর তাঁকে বললুম—এদেশে অন্য কি ব্যবসা সুবিধে ?

—আপনি যেখানে যাচ্চেন, ওদিকে জঙ্গল বেশি, অনেকে জঙ্গল ইজারা নিয়ে কাঠ বিক্রি করে।

—কোনো বাঙালীকে ব্যবসা করতে দেখেচেন এদিকে ?

—একজন আছেন তাঁর নাম আমি জানিনে, অমর-কণ্টকের কাছে অনেক বন তিনি ইজারা নিয়ে কাঠ চালান দিতেন জানি।

বন কোথাও কেটে ফেলেচে, একথা আমাব ভালো লাগে না। অর্থের জন্যে প্রকৃতির হাতে সাজানো অমন সৌন্দর্য-ভূমি বিনষ্ট করা বর্বরতা ছাড়া আর কিছু না। এমন একদিন আসবে যেদিন লোকে এ ভুল বুঝতে পারবে, কিন্তু আরণ্য-সৌন্দর্য তখন পৃথিবীতে কোথাও অবশিষ্ট থাকবে কিনা কে জানে?

এখান থেকে দারকেশা মাত্র দশ মাইল। সন্ধ্যার মধ্যে সেখানে পৌছনো যাবে। আমি আমার সঙ্গীদের বললুম, কার্গিরোড থেকে মোটে বত্রিশ মাইল শুনেছিলাম দারকেশা, এ:তো তার অনেক বেশি হয়ে গেল—

ওরা বললে—বাবু, চল্লিশ মাইলের ওপর চাডা কম হবে না, তবুও আপনাকে আমরা খানিকটা সোজা পথ দিয়ে এনেচি। আসল পথটা ঘুরানো, কিন্তু এর চেয়ে ভালো.

সালকোণ্ডা চুনের ভাঁটি ছাড়িয়ে জমি ক্রমশ নিচু হয়ে গেল। যখনই এমন হয় তখনই আমি জানি এবার নিশ্চয়ই কোনো নদী আছে সামনে। হ'লও তাই, একটা খরস্রোতা পাহাড়ী নদী পডলো সামনে, তার নামও সালকোণ্ডা। নদীর ওপর কাঠের গুঁড়ি ফেলে দিয়ে পুল তৈরি করা, তার ওপর দিয়ে ঘোড়া যাবে না, অথচ নদীর বেগ দেখে মনে হ'ল, না জানি গভীবতাই বা কতটা।

ঘোডা নামিয়ে দিলাম। দেখি ক্রমশ জল বাডচে, ক্রমে আমার এমন অবস্থা হ'ল রেকাব থেকে পা তুলে পা দুখানা মুড়ে জিনের দুপাশে নিয়ে এলাম, তখনও জল বাডচে। পার্বত্য নদীতে বৃষ্টি নামলেই আর দেখতে হবে না, কোথা থেকে যে জল বাডবে! জিনে পর্যন্ত জল ঠেকিয়ে তখন ঘোড়া দেখি আর একটু উঁচু জায়গায় পা পেলে। ডাঙায় উঠে এমন গা

ঝাড়া দিয়ে উঠলো বুনো ঘোড়াটা যে, আমায়সুদ্ধ, জিনসুদ্ধ ফেলে দিয়েছিল আর কি। যে ঘোড়ার চাল থাকে না, সে ঘোড়ার আদব-কায়দা কখনই সুমার্জিত ও ভদ্রতাসঙ্গত হয় না, এ আমি বহুদিন থেকে দেখে আসচি।

এই দশ মাইলের শোভা কিছুই নেই, তবে এক চক্রবাল থেকে অন্য চক্রবাল পর্যন্ত বিস্তীর্ণ উঁচুনিচু মরুম কাঁকরের ডাঙার যদি কারো কাছে মূল্য থাকে, সে হিসেবে এ অঞ্চলের তুলনা নেই।

শুধু Space যাদের ভালো লাগে, জনহীন মুক্ত Space, তাদেব কাছে এমন স্থান হঠাৎ কোথাও মিলবে না। পৃথিবীর মুক্ত-রূপের মহনীয় সৌন্দর্যে এ স্থান সত্যিই অতুলনীয়।

তবে অনেকে এর মধ্যে গাছপালা হয়তো দেখতে চায়, হয়তো ভাবে, এতটা ফাঁকা কেন রে বাপু, মাঝে মাঝে দু-দশটা শালঝোপ থাকলে এমন বা কি মন্দ হ'ত!

কিংবা যদি থাকতো মাঝে মাঝে শিমূল গাছ বা রক্তপলাশ, তবে ফাল্গুন মাসের প্রথমে ফুল ফুটলে এই অঞ্চল হয়ে উঠতো মায়াময় পরীরাজ্য।

এই সব ভাবতে ভাবতে বেলা প্রায় পড়ে গেল। রোদ রাঙা হয়ে এসেচে। সেই সময় অপূর্ব দৃশ্য! হঠাৎ আমি ঘোড়া থামিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লুম।

বহু দূরে, পশ্চিম দিকচক্রবালের অনেকটা জুড়ে কালো বনরেখা দেখা দিয়েচে। রেখা ক্রমে স্পষ্টতর হয়ে উঠলো, তখন বেলা নেই, সন্ধ্যার অন্ধকার নামলো। আমার সঙ্গীদের জিগ্যেস করলুম, ওই কি দারকেশা?

ওরা বললে, বন আরও অনেক দূরে, দারকেশা আব বেশি দূর নেই।

একটা ছোট পাহাড়ের আড়ালে অনেকগুলো ঘরবাড়ি দেখা গেল, এতক্ষণ আমি লক্ষ্য করিনি। ওরা বললে—ওই দারকেশা।

আমার বন্ধুটি এখানে কন্ট্রাক্টারি করেন। দুপয়সা হাতে যে না করেচেন এমন নয়। অনেক দিন পরে একজন বাঙালী বন্ধু পেয়ে তিনি খুব খুশি।

আমি রোজ সকালে উঠে বনের দিকে বেড়াতে যাই, কখনো ফিরি দুপুরে, কোনদিন সন্ধ্যাবেলা। বন্ধু বললেন—বনে যখন-তখন অমন যেও না—বড্ড জন্তু-জানোয়ারের ভয়।

—কি জন্তু?

—ভাল্লুক তো আছেই, বাঘ আছে, বুনো কুকুর আছে।

দারকেশা একটি ছোট বস্তি।

এর পশ্চিম দিকে চক্রবাল জুড়ে অরণ্যরেখা ও শৈলশ্রেণী। গ্রাম থেকে বনের দূরত্ব দু মাইলের বেশি নয় কিন্তু বন এখানে কোনা-কুনি ভাবে বিস্তৃত, উত্তরপশ্চিম কোণ থেকে দক্ষিণপশ্চিম কোণের দিকে চলে গেল লম্বা টানা বনরেখা; যে জায়গাটা খুব নিকটে এসে পড়েচে, সেইটিই দু'মাইল।

বনের মধ্যে ছোট-বড় চুনাপাথরের টিলা ও অনুচ্চ শিলাশৃঙ্গ। এই বন তেমন নিবিড় নয়। এক ধরনের শুভ্রকাণ্ড, বনস্পতিজাতীয় বৃক্ষ এই বনে আমি প্রথম দেখি। এর গুঁড়ি ও ডালপালা দেখলে মনে হবে কে যেন গাছের গায়ে পঙ্খের কাজ করেচে, চক্‌চকে সাদা। গুঁড়ির গায়ে হাত দিলে হাতে খড়ির গুঁড়োর মতো এক প্রকার সাদা গুঁড়ো লেগে যায়, মুখে মাখলে পাউডারের কাজ করে। এই গাছের নাম রেখেছিলাম শিব গাছ।

দারকেশা একটা উঁচু পাথুরে-ডাঙার ওপর, তিনদিক থেকে ডাঙাটা নিচু হয়ে সমতল জমির সঙ্গে মিশেচে, ছোট্ট একটি পাহাড়ী ঝরনা ডাঙার

নিচে বয়ে যাচ্ছে ঝিরঝির করে, ঝরনার দুধারে ছোট ছোট গাছ ও এক প্রকারের লতার ফুল।

এখানে ছত্রিশগড়ি রাজপুত অধিবাসীদের মধ্যে একজন ব্যবসায়ী আছে, সে আমার বন্ধুর অধীনে কাঠ জোগানোর কাজ করেছিল অনেকদিন।

লোকটার নাম মাধোলাল। আমি তার সঙ্গে অনেক সময় বসে বসে তাদের দেশ সম্বন্ধে গল্প করতাম।

মাধোলাল একদিন আমায় তার বাড়িতে নিমন্ত্রণ করলে। খাওয়ালে মোটা মোটা যবের আটার রুটি, উচ্ছে ভাজা ও লঙ্কার আচার। এদেশে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিকে ভালো-মন্দ খাওয়ানো উচিত বলে আদৌ ভাবে না, যা হয় খাওয়ালেই হ'ল।

মাধোলালের বাড়ি খেয়ে আমার পেট ভরলো না। রুটি দিয়ে উচ্ছে ভাজা কখনো খাইনি, সুখাদ্যের তালিকার মধ্যে অন্তত আমি এই অদ্ভুত সংমিশ্রণের নাম করতে পারিনে। শেষকালে এল যে জিনিসটা, তাকে আমি নাম দিয়েচি গমের পায়েস।

কাঁচা গমের ছাতুর সঙ্গে দুধ আর ভেলিগুড গুলে এই জিনিসটি তৈরী, তার সঙ্গে মেথি বাটা ও হিং মিশানো, বাঙালীর মুখে অখাদ্য।

খাওয়ার পরে মাধোলাল আমার কাছে এক অদ্ভুত প্রস্তাব করলে।

—বাবুজি, আপনি এদেশে বাস করুন।

—কেন মাধোলালজি ?

—আপনাকে বড ভালো লাগে। এদেশে বিয়ে করুন না ?

—বলো কি মাধোলালজি! আমাদের সঙ্গে গোঁড়া ছত্রিশগড়ি সমাজের কে মেয়ের বিয়ে দেবে ?

—বাবুসাহেব, বলেন তো জোগাড় করি। কেন দেবে না ?

— আছে নাকি সন্ধানে ?

—আপনি বললেই সন্ধান করি। আছেও।

—এই গাঁয়েই নাকি ?

—হ্যাঁ বাবুজি। ব্রাহ্মণের মেয়ে, দেখতে বেশ সুন্দরী।

—গৌড় সমাজের ?

—না বাবু, গৌড়দের জন্যে মিশনে পালিত মেয়ে। ইংরিজি লেখাপড়া, সূচের কাজ, রান্না—সব জানে।

মনে মনে মাধোলালের বুদ্ধির প্রশংসা না করে পারলাম না। মিশনে পালিতা মেয়ে ছত্রিশগড়ি সমাজের কেউ বিয়ে করবে না জেনে শুনে। তবে বাঙালী বাবুদের জাতও নেই, সমাজও নেই, দাও তার ঘাড়ে চাপিয়ে।

আমার বন্ধুর কাছে জিগ্যেস করে জানলুম মাধোলাল একজন সমাজ-সংস্কারক। মেয়েটিকে সে এনে নিজের বাড়িতেই রেখে দিয়েচে আজ চার-পাঁচ বছর, তাকে ভালো জায়গায় বিয়ে দেওয়া মাধোলালের একটা সাধ।

মাধোলাল দু তিন-দিন পরে আমায় আব একদিন রাস্তায় পাকড়ালে।

—বাবুজি, আমার সেই কথার কি হ'ল ?

—সে হবে না, মাধোলালজি।

—কেন বাবুজি, মেয়ে আপনি দেখুন কেমন, তারপর না হয়—

—না মাধোজি, মিশনের মেয়ে আমাদের সমাজে চলবে না। আমাদেরও তো সমাজ আছে, না নেই ?

—বাবুজি, আপনি না করেন, ওর একটি ভালো পাত্র তবে জোগাড় করে দেবেন ?

—আমি কথা দিতে পারিনে মাধোলালজি, তবে চেষ্টা করে দেখতে পারি।

দারকেশা থেকে এগারো মাইল দূরবর্তী গবর্নমেণ্ট রিজার্ভ ফরেস্ট্ একদিন দেখতে গেলুম। সেদিন সঙ্গে কেউই ছিল না—আমি ঘোড়া করে বেলা দশটার সময় বার হয়ে বেলা একটার সময় একেবারে পথহীন বিজন বনের মধ্যে গিয়ে পড়লাম।

বড় বড় গাছ, পাতায় পাতায় জড়াজড়ি—নিচে কোথাও যেন মাটি নেই, শুধুই সাদা পাথরের নুড়ি ছড়ানো—মাঝে মাঝে ঝরনা। এ বনেও অনেক বুদ্ধ-নারিকেলের গাছ দেখা গেল। ঝরনার ধারে ঘন জঙ্গল, অন্যত্র বন এত ঘন নয়। এই বনে অত্যন্ত ম্যালেরিয়া ফুলের ভিড় (Lantana Camera), বিশেষ করে ঝরনার ধারে। এই সুদৃশ্য ফুল এখানে ফুটেচে খুব বেশি ও নানা রঙের।

বনের মধ্যে এক জায়গায় বাঘ শিকারের মাচান বাঁধা। দেখে মনে হ'ল কিছুদিন আগে এখানে কেউ শিকার করতে এসেছিল। এই বন যে হিংস্রজন্তু-অধ্যুষিত, তা মনে পড়লো এই মাচান দেখে—আরও গভীরতর অরণ্যে অবেলায় প্রবেশ করা সমীচীন হবে না ভেবে ঘোড়ার মুখ গ্রামের দিকে ফেরালুম।

পথে একজন খাকী পোশাক পরা কালো লোকের সঙ্গে দেখা। লোকটি গবর্নমেণ্টের অরণ্যবিভাগের জনৈক কর্মচারী। আমায় দেখে বললে—আপনি কোথায় গিয়েছিলেন ?

আমি বললুম, বনে বেড়াতে গিয়েছিলাম।

লোকটি বললে—অন্যায় করেচেন, একা যাওয়া আপনার উচিত হয়নি। বনে বাঘের ভয় আছে, এ সব অঞ্চলের বাঘ বড় খারাপ। একটা মানুষ-খেকো বাঘও বেরিয়েচে বলে জানি।

সামনে আসচে কোজাগরী পূর্ণিমার জ্যোৎস্নারাত্রি। আমার প্রবল

আগ্রহ ছিল অমন জ্যোৎস্নারাত্রিটি বনের মধ্যে কোথাও যাপন করা। অনেক বক্তৃতা দিয়েও একজন লোককেও জোগাড় করা গেল না যে আমার সঙ্গী হ'তে পারে, কারণ মানুষ-খেকো বাঘের কথা কানে শুনে সেখানে একা যেতে চাইবো এমন সাহস আমার ছিল না।

অবশেষে দারকেশার পূর্বপ্রান্তে একটা ছোট পাহাড়ের ওপর সে রাত্রে খানিকক্ষণ বসে থেকে আমার সাধ খানিকটা মিটলো। আমার সঙ্গে গ্রামের দু-তিন জন লোকের মধ্যে মাধোলালও ছিল।

মাধোলাল এই অরণ্য-অঞ্চল সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানে। আমায় বললে, বাবুসাহেব, আমার কোথাও যেতে ভালো লাগে না।

—কেন মাধোজি ?

—মন হাঁপিয়ে ওঠে, মনে হয় সব চাপা।

—বনের মধ্যে গিয়েচ রাত্রে ?

—অনেকবার বাবুজি। আমার এক বন্ধু ভালো শিকারী ছিল, সে বনে মাচান বাঁধলে, বাঘ শিকার করবার জন্যে। অনেকদিন আগের কথা।

—তারপর ?

—আমি বললাম আমায় সঙ্গে নাও। সে প্রথমে কিছুতেই রাজি হয় না, তারপর রাজি হ'ল একটা সর্তে। বললে—মাচানে তোমায় বেঁধে রাখা হবে। আমি তো অবাক, বেঁধে রাখা হবে কেন ? সে বললে, যখন বাঘ আসবে, তখন তুমি এমন লাফ-ঝাঁপ মারবে ভয়ে যে, মাচান থেকে পড়ে যেতে পারো—হয়তো আমায়ও বিপদগ্রস্ত করতে পারো। আমি রাগ করলুম বটে মনে মনে, কিন্তু রাজি হয়ে গেলুম।

—বেঁধে রাখলে নাকি ?

—মাচানের খুঁটি আর গাছের গুঁড়ির সঙ্গে দড়ি দিয়ে কসে বেঁধে রাখলে। পরে বুঝেছিলুম এই বেঁধে রাখবার জন্যই সেদিন আমার আত্ম

আমার বন্ধুর প্রাণরক্ষা হয়েছিল। রাত বেশি হ'ল, মাচার ওপর আমরা মাত্র দুজন। এই যে বন দেখচেন, এই বনেরই ব্যাপার। তবে তখন আরও ঘন ছিল, এখন ইজারাদারেরা কেটে কেটে অনেক সাবাড় করে দিয়েচে। অনেক রাত্রে বাঘ এল—প্রকাণ্ড ম্যান-ইটার। আমার বন্ধু বললে—গুলি করো। আমি জীবনে তখন বন-মুরগী ছাড়া কোনো বড জন্তু মারিনি—আর বুনো বাঘ কখনো দেখিওনি। তার গর্জন শুনে আর চেহারা দেখে আমার হাত পা কাঁপতে লাগলো। বন্দুক হাত থেকে পড়ে যায় আর কি। তারপর সেই বাঘ যখন আমার বন্ধুর গুলি খেয়ে লাফ মেরে ভীষণ হাঁক দিয়ে সামনে উঠতে গেল—আমি মাচানের পেছন দিয়ে লাফ দিয়ে মাটিতে পড়বার চেষ্টা করলাম।

আমার তখন জ্ঞান নেই, বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়েচে ভয়ে। দু-দুবার বাঘ লাফ মারলে দু সেকেণ্ডের মধ্যে, দু-দুবার আমি পেছন থেকে লাফ দিয়ে মাটিতে পড়বার চেষ্টা করলাম সেই দুই সেকেণ্ডের মধ্যে। পারলাম না শুধু গাছের সঙ্গে বাঁধা আছি বলে। তখন বন্ধু বললে, যদি তোমায় না বাঁধতাম, বুঝেচ এখন কি হ'ত?

—বাঘ মারা পড়লো শেষ পর্যন্ত?

—নাঃ, সে রাত্রে সেটা পালালো। পরদিন সকালে এক মাইল দূরে এক জায়গায় ঘাসের মধ্যে বসে আছে, তখন আবার গুলি করা হ'ল। বাঘ গর্জে করলে— তখন দুই ভুরুর মাঝখানে আর এক গুলি। ওই হচ্চে আসল জায়গা, যতক্ষণ ওখানে গুলি না লাগচে, ততক্ষণ বাঘ বা কোনো জন্তু কাবু হবে না। অন্য যে কোনো জায়গায় গুলি লাগলে, বাঘ জখম হ'তে পারে বটে, মরবে না।

আমি জানতাম মাধোলাল বড় শিকারী না হ'লেও ইদানীং জানোয়ার মেরেচে অনেক। আমার বন্ধুর মুখেই ওর শিকারের অনেক গল্প শুনেচি।

বললুম—আচ্ছা মাধোলালজি, অনেক বনে তো বেড়িয়েচ, কখনো কোনও অদ্ভুত ধরনের জানোয়ার, যার কথা কেউ জানে না—এমন কিছু দেখেচ ?

আমার এ প্রশ্নের উদ্দেশ্য এমন সুন্দর জ্যোৎস্না-রাত্রিতে এই বৃহৎ অরণ্যের প্রান্তে বসে মনে একটু রহস্য ও ভয়ের ভাব নিয়ে আসা। জীবনকে উপভোগ করবার একটা দিক হচ্চে, যে-সময়ে যে-রসের বা অনুভূতির আবির্ভাব প্রীতিকর—সে সময়ে সেটি মনে আনবার চেষ্টা করতে হবে। দূরে বনরেখা জ্যোৎস্নার আলোয় অস্পষ্ট দেখালেও টানা, সোজা, কোনাকুনি রেখাটি টের্চা ভাবে দূরদিগন্তে যে কোন্ মায়ালোকের সীমা নির্দেশ করচে, আকাশচ্যুত জ্যোৎস্নারাত্রির দল যেন ওই বনের অন্তরালে দল পাকিয়ে থাকে—আরও কত অজানা সৌন্দয, অজানা ভয়, অজানা বিপদের দেশ ওটা।

আমার সামনে বড একটা শিলাখণ্ড, তার গা ঘেঁসে একটা বাঁকা গাছ। গাছটার বড় বড পাতা, অনেকটা পেঁপে পাতার মত, পাথরখানার ওপর অনেকগুলো শুকনো পাতা ঝরেও পড়েচে—তার মধ্যে খড় খড় শব্দ করে এদেশী বড় বহুরূপী যাতায়াত করচে।

মাধোলাল আমার কথার উত্তরে বললে—না বাবুজি, তা কখনো দেখিনি।

—দেখ ভেবে। তোমার দেখে আশ্চর্য মনে হয়েছিল, এমন কিছু ?

আমি ওকে ছাড়চিনে, ও না বললে কি হবে ? এমন সুন্দর জ্যোৎস্না-রাত্রে ওর মুখে একটা অদ্ভুত ধরনের গল্প না শুনলেই চলবে না আমার।

কিন্তু মাধোলাল অনেক আকাশপাতাল ভেবেও কিছু বার করতে পারলে না। অদ্ভুত জানোয়ার কিছু দেখেনি, তবে বাঘ তারপর দু-চারটে মেরেচে, ভালুক, শূয়োরও—আর হরিণের তো কথাই নেই।

বললুম—তবে মাধোলাল, আমার একটা আশ্চর্য গল্প শুনবে ?

মাধোলাল উৎসাহের সঙ্গে বললে—নিশ্চয়ই, বলুন।

বানিয়ে বানিয়ে ওকে একটা খুব বড় ও অদ্ভুত ধরনের জানোয়ারের গল্প করলুম—আরাকান ইয়োমার জঙ্গলে দেখেছিলুম। মাধোলাল বিশ্বাস করলে। আমার উদ্দেশ্য খানিকটা ভয় ও রহস্যের সৃষ্টি করা, এই অরণ্য-প্রান্তের এমন অপূর্ব পূর্ণিমারাত্রিকে আরও নিবিড় ভাবে পাবার জন্যে।

শীত করতে লাগলো। তখন রাত বারোটার কম নয়।

আমি ওকে বললুম—এ বন খুব বড় ?

—রেওয়া স্টেট্ পর্যন্ত চলে গিয়েচে—বেশি নয়, মাইল বাইশ তেইশ এখান থেকে। ওদিকে অমরকণ্টক পর্যন্ত চলেচে। খুব বড় বন।

—বেশ দেখবার জায়গা—না ? সিনারি ভালো ?

—সিনারি আপনারা কাকে বলেন বুঝি না। তবে এমন সব জায়গা আছে, যেখানে গেলে আর বাড়ি ফিরে আসতে ইচ্ছা করে না, এখানেই থাকি মনে হয়। একটা জায়গার কথা বলি। পশ্চিম দক্ষিণ কোণে এই বনের একটা পাহাড়ের নাম ঘোড়াঘাটির পাহাড়। দেখতে চান তো একদিন নিয়ে যাবো। সাদা পাথরের পাহাড়টা, অনেকটা উঁচু, বড্ড কাঁটা-গাছের জঙ্গল, আর পাথরের ফাটলে পাহাড়ী মৌমাছির চাক। গ্রামের লোকেরা ঘোড়াঘাটির পাহাড়ে মধু সংগ্রহ করতে যায় চৈত্র মাসে। সে সময় একরকম সাদা ফুল ফোটে, খুব বড় বড়, ভারি সুগন্ধ। ঘোড়াঘাটির পাহাড়ে ওই ফুলের গাছ অনেক। বেশ বড় গাছ। আপনি গিয়ে দেখবেন, যাকে আপনারা সিনারি বলেন, তা আছে কি না।

—এখান থেকে কতদূর হবে ?

—তা তেরো-চোদ্দ মাইল হবে। ঘোড়াঘাটি পাহাড়ের গায়ে দুটো গুহা আছে, একটার মধ্যে একজন সাধু থাকতেন—আজ প্রায় পনেরো

বছর ছিলেন। এখন কোথায় চলে গিয়েচেন। আর একটা গুহায় ঢোকা যায় না, মুখটা কাঁটাজঙ্গলে বুজোনো। যাবেন একদিন ?

যাবার যথেষ্ট আগ্রহ সত্ত্বেও আমার সেখানে যাওয়া হয়নি।

এর দুদিন পরে আমি এখান থেকে রওনা হই পদব্রজে। বনের মধ্যে দিয়ে উনিশ মাইল রাস্তা হেঁটে গিয়ে তবে রেওয়া স্টেটের প্রান্তে শালগটি-সাস্তারা ডাকবাংলো। বনের বিচিত্র শোভা এই উনিশ মাইল পায়ে হেঁটে না গেলে কিছু বোঝা যেতো না।

আসল ভারতবর্ষের রূপ যেন দেখেচি, প্রাচীন ভারতবর্ষ। আর্যাবর্তের বিশাল সমতলভূমি নয়, যা নাকি গঙ্গা ও যমুনার পলি-মাটিতে সেদিন তৈরী হ'ল—কালকের কথা।

এ ভারতবর্ষ যখন হয়েচে তখন হিমালয় পর্বত গজায়নি, বহু প্রাচীন যুগ-যুগান্তের পূর্বের বৃদ্ধতম ভারতবর্ষ এ ; এর অরণ্য এক সময় বৈদিক আর্যগণের বিস্ময়, রহস্য ও ভীতির বস্তু ছিল ; প্রথম ইউরোপীয় পর্যটকদের কাছে কঙ্গো ও ইউগাণ্ডার আগ্নেয় গিরিশ্রেণী ও ঘনারণ্য যেমন ছিল, ঠিক তেমনটি।

বনের অদ্ভুত রূপ দেখতে হয় যদি তবে পদব্রজে ওপথে অমর-কণ্টক পর্যন্ত যাওয়া উচিত। তবে হিমারণ্যের মতো বিচিত্র বনপুষ্পশোভা এ বনে নেই, মধ্যপ্রদেশের বনভূমির রূপ অন্য ধরনের, একটু বেশি রুক্ষ ও অনাড়ম্বর।

বনপুষ্প ও ফার্ন পাওয়া যায় যেখানে আছে বড় বড় পাহাড়ী ঝরনা, তার ধারে বড় বড় আর্দ্র শিলাখণ্ডের গায়ে কত কি ছোট ছোট লতা ও চারা-গাছে রঙীন্ ফুল ফুটে আছে বটে কিন্তু বাইরের বনে এ সময়ে কোনো ফুল দেখিনি, কেবল বন্য শেফালি ছাড়া।

এ বনে বন্য শেফালি গাছ অজস্র। পথের ধারে যা পড়ে, তাতেই

আমার মনে হয়েচে এই গাছের সংখ্যা এ অঞ্চলে যথেষ্ট। তবুও আমি গভীর বনের মধ্যে যাইনি, আমার সঙ্গে চার-পাঁচজন অমর-কণ্টকের যাত্রী ছিল, তারাও আমাকে পথ ছেড়ে অরণ্যের অভ্যন্তরপ্রদেশে ঢুকতে দেয়নি।

মাঝে মাঝে ছোট ছোট গ্রাম পড়ে। গ্রামে ছোট মুদীর দোকান, সেখানে সিজার সিগারেট পর্যন্ত পাওয়া যায়। আর পাওয়া যায় আটা, ডাল ভেলিগুড, নুন, মোটা চাল। বিভিন্ন মিশন সোসাইটি এই সব বন্য-পল্লীতে স্কুল বসিয়ে গোঁড়দের শিক্ষাদানে যথেষ্ট সাহায্য করচে। খৃষ্টধর্মাবলম্বী লোকের সংখ্যা কোনো কোনো গ্রামে নিতান্ত কম নয়।

দুপুরে নিভৃত কোনো ঝরনার ধার খুঁজে নিয়ে গাছের নিবিড় ছায়ায় আমরা রান্না চড়াতাম। আমাদের দলের পাচক ছিল মান্দারু বলে একটি ছোকরা। সে মাধোলালের বাড়িতে প্রতিপালিত হয়েছিল ছেলেবেলা, এখন কাঠের মিস্ত্রির কাজ করে। যদিও সে একজন দস্তুরমত ভবঘুরে, কোথাও বেশিদিন থাকা তার ধাতে নাকি একেবারেই সয় না।

আমি বলতুম—আজ কি রান্না হবে মান্দার?

—আটা আব দাল।

—আর কি রাঁধতে জানো?

—আর আলুর চোখা।

দুবেলা এই একই রান্না, নতুনত্ব নেই। আটার হাতে গড়া রুটি, অড়বের ডাল আর আলুর চোখা। এমন বিচিত্র রান্না জীবনে কখনো খাইনি। এমন ঘোর আনাড়ি ও প্রতিভাবিহীন রাঁধুনীও সহজে খুঁজে মিলবে না। এতদিন হাতে কলমে বান্নার কাজ করা সত্ত্বেও মান্দারু এতটুকু উন্নতি করতে পারেনি ও কাজে, কোনোদিন পারবেও না।

বনের মধ্যে যে-কটি অদ্ভুত দিন কেটেছিল, তার কথা জীবনে কখনো ভুলব না। মধ্যপ্রদেশের এই সব বনে যথেষ্ট হিংস্রজন্তুর বাস বটে—কিন্তু

আমরা কোনোদিন কিছু দেখিনি। আমার একজন সঙ্গী এক রাত্রে বললে, সে নাকি বাইসন দেখেচে—কিন্তু তার কথা আমার বিশ্বাস হয়নি।

প্রথম তো, বাইসন মাদ্রাজ অঞ্চলে ছাড়া ভারতের অন্য কোনো বনে দেখা যায় না। মধ্যপ্রদেশে 'গৌর' বা 'গায়ের' বলে যে মহিষজাতীয় জন্তু আছে তাকে অনেকে 'ইণ্ডিয়ান বাইসন' বলেন বটে কিন্তু মধ্যপ্রদেশের বনে 'গৌর' প্রায় নির্বংশ হয়ে এসেচে। শিকারীরা বন-বাদাড় ঠেঙিয়েও তার সন্ধান পান খুবই কম। দ্বিতীয় কথা, এই বন্যজন্তু অত্যন্ত হুঁশিয়ার, মানুষের সাড়াশব্দ তারা অনেক দূর থেকে পায় এবং সে জায়গার ত্রি-সীমানায় ঘেঁসে না।

তবে শেয়াল প্রায়ই যেতো—আর দেখতুম ময়ূর; প্রায়ই ময়ূর ডাল থেকে উড়ে বসত পথের ওপর। ময়ূর ছাড়া আরও অনেক রকমের পাখী ছিল সে বনে, দুপুরে যখন গাছতলায় একটু বিশ্রাম করতাম, তখন বিহঙ্গ-কাকলী আমাদের পথশ্রান্তি দূর করতো।

এই রকম বেড়াবার একটা নেশা আছে—বড় ভয়ানক নেশা সেটি। তা মানুষকে ঘরছাড়া করে ভবঘুরে বানিয়ে দেয়। আমরা যে-ক'জন বনের পথে চলেচি, সকলেই প্রাণে প্রাণে অনুভব করছিলুম সেই অদ্ভুত ও তীব্র আনন্দ, শুধু মুক্ত জীবনেই যার দেখা মেলে।

আমরা সাধারণত রাত্রে কোনো একটা গ্রামে আশ্রয় নিতাম, সকাল হ'লে হাঁটা শুরু করে দুপুরের মধ্যে দশ-বারো মাইল কি পনেরো মাইল পার হয়ে যেতাম। এই সকালের হাঁটাই হ'ল আসল। বিকেলে বেশিদূর যেতে না যেতে বনের মধ্যে ক্রমশ ঘন ছায়া নেমে অন্ধকার হয়ে আসতো, তখন কোথাও আশ্রয় না নিলে চলতো না।

দুপুরে অনেকখানি পথ হেঁটে একটা সুন্দর জায়গা আমরা বেছে নিতুম,

যেখানে বড় বড় গাছের ছায়া, ঝরনার জল কাছে, বসবার উপযুক্ত শিলাখণ্ড পাতা, পাখীর কাকলীতে বনভূমি মুখর। তারপর মান্দারু জায়গাটা ডাল্-পালা ভেঙে পরিষ্কার করতো, আমরা কম্বল পেতে ফেলতুম তিন চার খানা—কখনো বা জোড়া দিয়ে, কখনো আলাদা আলাদা। কতরকমের গল্প হ'ত, চা চড়তো, আমরা চা খেয়ে খুব খানিকটা বিশ্রাম করে ঝরনার জলে নেয়ে আসতুম—এদিকে মান্দারু রান্না চড়িয়েচে, আরও কিছুক্ষণ বসবার পরে মান্দারু শালপাতায় আমাদের ভোজ্য পরিবেষণ করতো। খেয়ে-দেয়ে ঘণ্টাখানেক সবাই ঘুমিয়ে নিতো, তারপর আবার উদ্যোগ করে তাঁবু উঠিয়ে সবাই মিলে রওনা হওয়া যেতো।

কোনো উদ্বেগ নেই, চিন্তা নেই মনে—দূর কোনো বৃক্ষচুড়ায় ময়ূরের ডাক, বনের ডালপালায় বাতাসের মর্মর শব্দ, ঝরনার কলতান, প্রচুর অবকাশ ও আনন্দ, এ যেন আমরা আবার আমাদের প্রাচীন আবণ্য জীবনে ফিরে গিয়েচি। বিংশ শতাব্দীব কর্মবহুল দিনগুলি থেকে পিছু হেঁটে দায়িত্বহীন মুক্ত জীবনের আনন্দে আমাদেব মন ভরপূর। তা ছাড়া, এই বিরাট বনপ্রকৃতির নিবিড় সাহচর্যও আমাদের সকলের মনে কেমন একটা নেশা জাগিয়ে তুলেচে।

আমাদের মধ্যে একজন বললে, তার কোনো এক বন্ধু আলমোড়া থেকে পায়ে হেঁটে হিমারণ্যের বিচিত্র সৌন্দযেব মধ্যে ওই পথে গঙ্গোত্রী যমুনোত্রী যাবাব জন্যে বেরিয়েছিল, সে আর ফিরে এল না। এখন ওইখানে কোনো জায়গায় থাকে, সাধুসন্ন্যাসীর জীবন যাপন কবে। হিমালয়ের নেশা তাকে ঘরছাড়া করেচে।

একদিন সন্ধ্যাবেলা আমরা একটি ক্ষুদ্র গোঁড বস্তিতে পৌঁছুলাম। আমাদের থাকবার উপযুক্ত ঘর নেই সেখানে, ছোট ছোট কুঁড়ে ঘর, তাদেরই জায়গা কুলোয় না। অবশেষে একটা গোয়াল ঘরে আমাদের

জায়গা করে দিলে। কিছুক্ষণ পরে বস্তির লোকজন আমাদের ঘিরে গল্প-গুজোব করতে এল।

একজন বললে—তোরা ভাল্লুকের ছানা কিনবি?

আমরা দেখতে চাইলাম। তারা দুটি ছোট লোম-ঝাঁকড়া বিলিতি কুকুরের ছানার মতো জীব নিয়ে এল। মাত্র দুমাস করে তাদের বয়েস, এই বয়েসেই বড় কুকুরের মতো গায়ের শক্তি। ওরা বললে, একটা বাঘের বাচ্চাও ছিল, কিছুদিন আগে ডোঙ্গর গড থেকে এক সাহেব শিকারী এসেছিল, তার কাছে ওরা সেটা বিক্রী করেচে।

আমরা ভালুকের ছানা কিনিনি, বনের মধ্যে কোথায় কি খাওয়াবো, দলের অনেকেই আপত্তি করলে।

বস্তিটাতে ঘর-দশেক লোক বাস করে। আমরা বললাম—তোমরা জিনিসপত্র কেনো কোথা থেকে?

ওরা বললে—এখানে আমরা ভুট্টা আর দেধানার চাষ করি। নুন কিনে আনি শুধু অমরকন্টকের বাজার থেকে। তীরধনুক আছে, পাখী আর হরিণ শিকার করি। অমরকন্টকের মেলার সময় হরিণের চামড়া, ভালুকের ছানা, পাখীর পালখ ইত্যাদি বিক্রী করি যাত্রীদের কাছে। তা থেকে কাপড় কিনে আনি।

বেশ সহজ ও সরল জীবনযাত্রা। তবে এরা বড় অলস। জীবন-যাত্রার অনাড়ম্বর সরলতাই এদের অলস ও শ্রমবিমুখ করে তুলেচে। পয়সা দিতে চাইলেও কোনো শ্রমসাধ্য কাজ এরা সহজে করতে রাজি হয় না। পয়সা রোজগার করবার বিশেষ ঝোঁক নেই। বিনা আয়াসে যদি আসে তো ভালো, নতুবা কষ্ট করে কে আবার পয়সা উপার্জন করতে যায়। সবগুলি বন্য গ্রামেই প্রায় এই অবস্থা।

কতবার বলে দেখেচি—এক বোঝা কাঠ ভেঙে এনে দে না, পয়সা দেবো।

ওরা সোজা জবাব দিয়ে বসে—আমাদের দিয়ে হবে না বাবু, আমরা পারবো না।

—পয়সা পাবি, দে না।

—কি হবে পয়সা বাবু। পারবো না আমরা।

অথচ পয়সা-কড়ি বিষয়ে এরা যে উদাসীন ও সরল, তা আদৌ নয়। সুবিধা পেলে বিদেশীকে ফাঁকি দিতে বা ঠকিয়ে জিনিস বিক্রী করতে ওস্তাদ। আসল কথা, খেটে পয়সা রোজগার করা ওদের ধাতে সয় না।

বেলা আটটার সময় ঘুম ভেঙে উঠে কানে শালপাতার পিকা বা বিড়ি গুঁজে নিকটবর্তী কোনো জলাশয়ের ধারে সারাদিন বসে হয়তো মাছ ধরচে। মেয়েরা বাড়ি থেকে খাবার দিয়ে এল, লোকটি চুপ করে ঠায় জলের ধারে অর্জুন গাছের ছায়ায় বসেই আছে। এক জায়গায় এতক্ষণ বসে থাকতেও পারে! দারকেশাতে এ দৃশ্য কতবার দেখেচি।

আর একটা জিনিস, এদের সময়ের জ্ঞান নেই অনেকেরই।

—বয়স কত?

—কি জানি বাবু?

—তবুও, আন্দাজ?

—বিশ পঁচাশ হবে।

হয়তো উত্তরদাতার বয়েস ষাট পেরিয়েচে, তবুও তার কাছে বিশও যা পঞ্চাশও তাই। কতদিন আগে একটা ব্যাপার ঘটেছিল তার সঠিক ধারণা এদের একেবারেই থাকে না, অনেককে জিগ্যেস করে দেখেচি। সময়ের মাপজোপ সভ্যসমাজেই প্রয়োজন, সভ্যতার সংস্পর্শে যারা আসেনি তাদের সময়-সমুদ্রের ঊর্মিমালা গণনার প্রয়োজন কি।

আমরা দামুণ্ডি বলে একটা গ্রামে পৌঁছে দুদিন বিশ্রাম করলুম। এখান থেকে রেলওয়ে স্টেশন মাত্র ন'মাইল। অমরকণ্টকের যাত্রীরা

এখান থেকে হেঁটে অমরকণ্টক চলে যাবে, আমি স্টেশনে গিয়ে ট্রেনে উঠবো। দামুণ্ডি পৌছবার পূর্বে আমরা যে গ্রাম থেকে রওনা হই, তাদের অধিবাসীরা আমাদের বারণ করেছিল—বাবুসাহেব, ওপথে যাবেন না, বড় বাঘের ভয়, তিন চারজন মানুষকে বাঘে নিয়েচে, গোরু-বাছুর তো রোজই নেয় বস্তি থেকে।

আমরা খুব সতর্ক হয়ে পথে হাঁটতাম, অথচ এই পথে বন খুব কম, মোরুম ছড়ানো ডাঙাই প্রায় সবটা, মাঝে মাঝে ছোট ছোট বন আর পাহাড়। এই ছোট বনের মধ্যেই নাকি বাঘে মানুষ নিয়েচে!

এই সব বন্যগ্রামে বাঘের উৎপাত খুব বেশি।

একজন বৃদ্ধ বললে—এমন গ্রাম নেই, যেখান থেকে বছরে দু চারটে গোরু-বাছুর না নেয়, মানুষও নেয় মাঝে মাঝে।

—বাঘ ছাড়া আর কি জানোয়ারের উৎপাত আছে?

—বাঘের পরেই বুনো মহিষের উপদ্রব। ফসল বড় নষ্ট করে দেয় এরা।

—তোমরা কি কর তখন?

—আমরা আগুন জ্বালি, টিন বাজাই—সারা রাত জাগতে হয় ক্ষেতের মধ্যে মাচা বেঁধে।

—বাঘ মারো না?

—বাবু, সবাই শিকারী নয় তো, বাঘ শিকার করা সহজ নয়। যখন বড্ড উৎপাত হয়, তখন অন্য জায়গা থেকে শিকারী ডেকে আনতে হয়।

—তীরধনুক দিয়ে বাঘ শিকার করে?

—চিরকাল তাই হয়ে এসেচে, যখন কিছুতেই না পারা যায়, তখন বন্দুকওয়ালা সাহেব শিকারীকে আনাতে হয়। তাও একবার এমনি হ'ল, সাহেব শিকার করতে গিয়ে বাঘের হাতে জখম হ'ল, শহরের দাওয়াইখানায় নিয়ে যেতে যেতে পথেই মারা পড়লো।

—বড় সাপ দেখেচ কখনো ? আছে এ বনে ?

—বড় ময়াল সাপ আছে, তবে তাদের বড় একটা দেখা যায় না, পাহাড়ের গুহায় কিংবা গাছের খোড়লে লুকিয়ে থাকে। একবার আমি একটা দেখেছিলাম। অনেকদিন আগের কথা, তখন আমার জোয়ান বয়স, পাহাড়ের ধারে ছাগল চরাতে গিয়েচি এমন সময় একটা ছাগল হঠাৎ ব্যা-ব্যা করে ডাকতে লাগলো কোন্ দিক থেকে। অনেক ছাগল এদিকে-ওদিকে মাঠের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েচে, প্রথমটা তো বুঝতে পারিনি কোথা থেকে ডাক আসচে—

—তারপর ?

—তারপর দেখি এক জায়গায় একটা বাবলা গাছ আছে, তার তলায় সামান্য একটু জায়গায় লম্বা লম্বা ঘাসের বন, সেই বনটার মধ্যে থেকে ছাগলের ডাক আসচে। ব্যাপার কি দেখতে গেলাম। গিয়ে দেখি এক ভীষণ অজগর সাপ ছাগলটার পেছন দিকের দুখানা ঠ্যাং একেবারে গিলে ফেলেচে। বাবলা গাছের গুঁড়িতে সাপটা জড়িয়ে ছিল, এইবার একটু একটু করে পাক খুলচে। তখন আমি ছাগলের সামনের পা ধরে টানাটানি আরম্ভ করতেই সাপটা আর পাক না খুলে গাছের গুঁড়ি এমন করে জড়িয়ে এঁটে ধরলে যে আমি জোর করেও ছাগলটাকে ছাড়িয়ে নিতে পারিনে। ময়াল সাপের গায়ে ভীষণ জোর। তখন গ্রাম থেকে লোক ডেকে নিয়ে গিয়ে সাপটা মেরে ফেলি।

দামুণ্ডি ছাড়িয়ে মাইল দশেক হেঁটে আমি অমরকণ্টক রোড স্টেশনে এসে ট্রেন ধরে কলকাতায় ফিরি।

১৯৩৩ সালে খবরের কাগজে বার হ'ল যে উড়িষ্যার অন্তর্গত সম্বলপুর

জেলার বিক্রমখোল নামক স্থানে ঘন অরণ্যের মধ্যে একটা পাহাড়ের গায়ে প্রাগৈতিহাসিক যুগের শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়েচে। অনেক লোক দেখতে যাচ্চে এবং স্থানীয় পুলিশে লোকজন যাবার অনেক সুবিধে করে দিয়েচে। এ-কথাও কাগজে বেরিয়েছিল, স্থানটির প্রাকৃতিক দৃশ্য বড় সুন্দর এবং হরিণ বনমোরগ, সম্বর প্রভৃতি বন্যজন্তু যথেষ্ট পাওয়া যায়। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস তখন 'বঙ্গশ্রী'র সম্পাদক। সজনীবাবু আমাকে 'বঙ্গশ্রী'র তরফ থেকে বিক্রমখোল পাঠাতে সম্মত হ'লেন—সঙ্গে যাবেন 'বঙ্গশ্রী'র তৎকালীন সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণকুমার রায় ও ফটোগ্রাফার হিসাবে বন্ধুবর শ্রীযুক্ত পরিমল গোস্বামী। খ্যাতনামা ব্যারিস্টার শ্রীযুক্ত নীরদরঞ্জন দাস গুপ্তের মধ্যম ভ্রাতা প্রমোদরঞ্জনও আমাদের সহযাত্রী হবেন ঠিক হ'ল।

৩রা মার্চ শুক্রবার আমরা হাওড়া স্টেশন থেকে নাগপুর প্যাসেঞ্জারে রওনা হবো ধার্য ছিল। এদিন বেলা তিনটের সময় আমি 'বঙ্গশ্রী' আপিসে গিয়ে কিরণ ও পরিমলবাবুকে তাগাদা দিলাম। পরিমলবাবু ক্যামেরা ও জিনিসপত্র নিয়ে সেখানে আমার অপেক্ষাতেই বসে ছিলেন। আমি বললাম —আপনারা রওনা হয়ে যাবেন সাতটার সময়ে, হাওড়া স্টেশনে বি, এন, আরের ইন্টার ক্লাস টিকিটঘরের সামনে দাঁড়িয়ে থাকবেন, যতক্ষণ আমি না যাই।

প্রমোদবাবুকেও ফোন্ করে সে কথা জানানো হ'ল। বনজঙ্গলের পথে কয় বন্ধুতে মিলে একসঙ্গে যাবো, মনে যথেষ্ট উৎসাহ ও আনন্দ। নির্দিষ্ট সময়ে হাওড়া স্টেশনে গিয়ে দেখি শুধু কিরণবাবু দাঁড়িয়ে আছেন টিকিটঘরের সামনে। ট্রেন ছাড়তে মিনিট কুড়ি মাত্র বাকি—আমাদের দুজনেরই মন দমে গেল। বন্ধুরা সব একসঙ্গে গেলে যে আনন্দ হবার কথা, দুজনে মাত্র গেলে সে আনন্দ পাওয়া যাবে না। অনেকবার এ-রকম

হয়েচে, যারা যারা যাবে বলেচে কোথাও শেষপর্যন্ত তাদের অধিকাংশই আসেনি।

কিরণবাবু বললেন—টিকিট করে চলুন আমরা আগে গিয়ে জায়গা দখল করি।

নাগপুর প্যাসেঞ্জারে বেজায় ভিড় হয়, আমরা সবাই তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী, সুতরাং কথাটার মধ্যে যুক্তি ছিল।

গাড়িতে উঠে আমরা বেপরোয়া ভাবে চারজনের জন্যে চারখানা বেঞ্চিতে বিছানার চাদর, গায়ের কাপড় ইত্যাদি পেতে জায়গা দখল করলুম। তারপর কিরণবাবুকে পাঠিয়ে দিলাম বাকি দুজনের খোঁজে।

গাড়ি ছাড়বার মিনিট দশেক আগে ছুটতে ছুটতে সবাই এসে হাজির। পরিমলবাবু শেষ মুহূর্তে তাঁর ক্যামেরার জন্যে কি একটা জিনিস কিনতে গিয়েছিলেন—তাই দেরি হ'ল।

একজন রেলওয়ে কর্মচারী বলে গেল—এ গাড়ি সিনি জংশন হয়ে যাবে।

আমরা বললুম—মশাই, বেলপাহাড় যাবে তো?

বেলপাহাড় বহুদূরের স্টেশন। লোকটি খোঁজ রাখে না, নামও শোনেনি। বললে—সে কতদূরে বলুন তো? বিলাসপুরের এদিকে?

—অনেক এদিকে, ঝার্সাগুড়ার পরে।

—নির্ভাবনায় যান—এ লাইন খারাপ হয়েচে তার অনেক আগে। চক্রধরপুরে গিয়ে আবার মেন লাইনে উঠবেন।

ট্রেন ছাড়লো। আমাদের ঘুম নেই উৎসাহে প'ড়ে। অনেক রাত পর্যন্ত সবাই মিলে বক্‌বক্‌ করচি। রাত সাড়ে বারোটায় ট্রেন খড়গপুরে এলে আমরা চা খেলাম। খড়্গপুরের লম্বা প্ল্যাটফর্মে পায়চারি করে বেড়ালাম।

চমৎকার জ্যোৎস্না। শুক্লা ত্রয়োদশী তিথি। সামনে আসচে ফাল্গুনী পূর্ণিমা।

খড়্গপুর ছাড়িয়ে জমির প্রকৃতি একেবারে বদলে গেল। রাঙা মাটি, উঁচুনিচু পাথুরে জমি, বড় বড় প্রান্তর—জ্যোৎস্নারাত্রে সে সব জায়গা দেখাচ্চে যেন ভিন্ন কোনো রহস্যময় জগৎ, আমাদের বহুদিনের পরিচিত পৃথিবী যেন এ নয়। যেন কোন্ অজানা গ্রহলোকে এসে পড়েচি—যেখানে প্রতিমুহূর্তে নব সৌন্দর্যের সম্ভার চোখের সামনে উদ্ঘাটিত হবার সম্ভাবনা।

এ পথে আমার সঙ্গীরা কেউ কোনোদিন আসেনি। বিশেষ করে প্রমোদ ও পরিমল দুজনেই প্রকৃতি-রসিক, তারা ঘুমোবার নামটি করে না। আমিও এ পথে একবার মাত্র এসেচি, তাও অন্ধকার রাত্রে, পথের বিশেষ কিছুই দেখিনি—সুতরাং আমিও জেগে বসে আছি।

সর্ডিহা ছাড়িয়ে রেললাইনের দুধারে নিবিড় শালবন, বসন্তে শিমূল ফুল ফুটে আছে শালবনের মাঝে মাঝে—যদিও রাত্রে কিছু বোঝা যায় না, গাছটা শিমুল বলে চেনা যায় এই পর্যন্ত।

গিড্‌নি ছাড়িয়ে গেলে আমি বললাম—এইবার সব ঘুমিয়ে নাও—রাত একটা বেজে গিয়েচে—কাল পরশু কোথায় যাবো, কোথায় ঘুমুবো কিছুই ঠিক নেই। পথে বেরুলে শরীরটাকে আগে ঠিক রাখতে হবে।

সারারাত্রি ট্রেন চললো। আমরা সবাই শুয়ে পড়লুম—কখন যে ঘুম এসেচে, আর কিছুই জানি না। কিবিওয়ালার চীৎকারে ঘুম ভেঙে দেখি ভোর হয়ে গিয়েচে। একটা বড় স্টেশনে ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে—আর সামনের রাস্তা দিয়ে লম্বা মোটরের সারি ক্রমাগত স্টেশনের দিকে আসচে।

তার আগে কখনো টাটানগর দেখিনি—এ বনজঙ্গলের দেশে এত মোটর গাড়ির ভিড় যখন, এ টাটানগর না হয়ে যায় না। আমার নিদ্রিত সঙ্গীদের ঘুম তখনও ভাঙেনি। আমি হাঁক দিয়ে বললাম—ও প্রমোদবাবু,

ও কিরণ—ঘুমুতেই এসেচ কি শুধু পয়সা খরচ করে? উঠে টাটানগর দেখ—টাটানগর এসেচে—

পরিমল উঠে চোখ মুছতে মুছতে বললে—কি স্টেশন এটা?

—টাটানগর।

—চা পাওয়া যাচ্চে তো?

—অভাব কি। ওদের সব ঘুম ভাঙিয়ে দাও—চা ডাকি।

প্রমোদবাবু প্ল্যাটফর্মে নেমে বললে—আরে এ টাটানগর কোথায়? লেখা আছে সিনি জংশন।

আমরা সবাই অবাক, এ কি, এত বড় জায়গা—এত মোটরের ভিড় সিনি জংশনে! কখনো তো নামও শুনিনি।

দু'চারজন লোককে ডেকে জিগ্যেস্ করে জানা গেল এত মোটরের ভিড়ের কারণ, সেরাইকেলার রাজার ছেলের বিয়ে—সিনি জংশন থেকে সেরাইকেলা মাইল পনেরো-কুড়ি পথ—এসব মোটর বরযাত্রী নিয়ে আসচে সেরাইকেলা থেকে।

আমরা চা খেয়ে নিয়ে ট্রেনে উঠে বসলাম। ট্রেন ছেড়ে দিল।

আমার বন্ধুরা সব জানালার কাছে বসেচে। প্রমোদবাবু কেবল চেঁচিয়ে বলেন—ও বিভূতিবাবু, এমন চমৎকার একটা পাহাড় গেল দেখতে পেলেন না!

ওদিকে কিরণ চেঁচিয়ে ওঠে—কি সুন্দর নদী একটা! দেখুন দেখুন—এই জানালায় আসুন—চট্ করে—

বেঙ্গল নাগপুর রেলপথের গৈলকেরা স্টেশন থেকে মনোহরপুর পর্যন্ত দুধারের অরণ্য-পর্বতের দৃশ্য অতুলনীয়। গৈলকেরা স্টেশনে এসে পাহাড় জঙ্গলের দৃশ্য দেখে প্রমোদবাবু তো একেবারে নির্বাক! পরিমলবাবু

স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম থেকে সামনের পাহাড়ের একটা ফটো তুলে নিলেন। তারপর রেলপথের দুধারেই অপূর্ব দৃশ্য—জানালা থেকে চোখ ফেরাতে পারিনে। গৈলকেরা স্টেশনে বড় বড় পেঁপে গোটাকতক কেনা হয়েছিল—কিরণ সেগুলো ছাড়িয়ে ভালো করে কেটে দিলে।

বসন্তকাল, বনে বনে রক্তপলাশের সমারোহ, সারেঙ্গ টানেলের মুখে ধাতুপ ফুলের বন, শালবনে কচি সবুজ পত্রের সম্ভার, প্রচুর সূর্যালোক, বনের মাথার ওপরে নীল আকাশ, মাঝে মাঝে বনের মধ্যে দিয়ে পার্বত্য নদী শীর্ণধারায় সর্পিল গতিতে বয়ে চলেচে, কোথাও একটা বড় নির্জন পথ রেললাইনের দিক থেকে গভীর বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল, কোথাও প্রকাণ্ড কোয়ার্তজ পাথরের পাহাড়টা বনের মধ্যে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে, কোথাও একটা অদ্ভুতদর্শন বিশাল শিলাখণ্ড বনের মধ্যে পড়ে আছে—প্রমোদবাবু আর কিরণের খুশি দেখে কে! পরিমল বেচারী তো ফটো নেবার জন্যে ছটফট করচে, আর কেবল মুখে বলচে, ওঃ এইখানে যদি ট্রেনটা একটু দাঁড়াতো! ওখনে যদি ট্রেন একটু দাঁড়াতো!

বেলা দুটোর সময় ঝার্সাগুডা স্টেশনে গাড়ি দাঁড়ালো। এখানে আমরা চা খেয়ে নিলাম।

প্রমোদবাবু টাইমটেবল দেখে বললেন—বিছানা বেঁধে ফেলুন সবাই, আর দুটো স্টেশন পরেই বেলপাহাড। ওখানেই নামতে হবে।

ইব বলে একটা ছোট স্টেশন ঘন বনের মধ্যে।

স্থানটায় বড চমৎকার শোভা। স্টেশনের কাছেই একটা নদী, তার দুপারে ঘন বন, বনের মধ্যে রাঙা ধাতুপ ফুলের মেলা।

একটা লোককে জিগ্যেস্ করে জানা গেল নদীর নাম ব্রাহ্মণী বা বামনী।

বেলপাহাড় স্টেশনে নামবার আগে দেখি ছোট্ট স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে

অনেকগুলি লোক সারবন্দী হয়ে কাদের অভ্যর্থনা করে নেবার জন্যে দাঁড়িয়ে আছে। আমরা যেতেই তারা আমাদের কাছে ছুটে এল—উড়িয়া ভাষায় বললে—বাবুরা কলকাতা থেকে আসচেন?

—হ্যাঁ। তোমরা কাকে খুঁজচো?

—সম্বলপুরের ডেপুটি কমিশনার সাহেব আমাদের পাঠিয়ে দিয়েচেন। আপনাদের আসবার কথা ছিল, আপনাদের সব বন্দোবস্তের ভার নেবার পরোয়ানা দিয়েচেন আমাদের ওপর।

প্রমোদবাবুর দাদা বন্ধুবর নীরদবাবুর সঙ্গে সম্বলপুরের ডেপুটি কমিশনার মিঃ সেনাপতির আলাপ ছিল, সেই সূত্রে নীরদবাবুকে দিয়ে একখানা চিঠি লিখিয়ে এসেছিলুম আমি ও প্রমোদবাবু কয়েকদিন পূর্বে। চিঠির মধ্যে অনুরোধ ছিল যেন গ্রাম্য পুলিশ আমাদের গন্তব্য স্থানে যাবার একটু ব্যবস্থা করে দেয়। কিন্তু সে ব্যবস্থা যে এভাবে অভ্যর্থনায় পরিণত হবে তা আমরা ভাবিনি।

বেলপাহাড় স্টেশন থেকে কিছুদূরে ডাকবাংলোয় তারা নিয়ে গিয়ে তুললে। একটু দূরে একটা বড় পুকুর, আমরা সকলে পুকুরের জলে নেমে স্নান করে সারাদিন রেলভ্রমণের পরে যেন নতুন জীবন পেলাম। পুকুরের পাড়ে পুরীর জগন্নাথের মন্দিরের অনুকরণে একটি ক্ষুদ্র মন্দির।

স্থানটি চতুর্দিকে পাহাড়ে ঘেরা—অবিশ্যি পাহাড়শ্রেণী দূরে দূরে।

একটি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ডাকবাংলোয় আমাদের জন্যে রান্না করে রেখেচে। স্নান করে এসে আমরা আহারে বসে গেলুম, শালপাতায় আলোচালের ভাত আর কাঁচা শালপাতার বাটিতে ডাল। পাচক ব্রাহ্মণটি যেন সাত্ত্বিকতার প্রতিমূর্তি, শান্ত নম্রস্বভাব—আমাদের ভয়েই যেন সে জড়সড়। সঙ্কোচের সঙ্গে ভয়ে ভয়ে আমাদের পরিবেষণ করছিল—যেন তার এতটুকু ত্রুটি দেখলে আমরা তাকে জেলে পাঠাবো। ডেপুটি কমিশনারের বন্ধু আমরা

—বলা তো যায় না! তারপর জিগ্যেস করে জানা গেল ব্রাহ্মণ পুকুর-পাড়ের সেই মন্দিরের পূজারী।

বেলা পড়ে এসেচে। রাঙা রোদ দূরের পাহাড়ের মাথায়, শালবনে, রাঙা মাটির টিলার গায়ে।

কি ঘন শালবন, দূরে দূরে নির্জন পর্বতমালা।

ডাকবাংলো থেকে অল্প দূরে একটি গ্রাম্য হাট বসেচে। আমরা হাটে বেড়াতে গেলাম। উড়িয়া মেয়েরা হাট থেকে ঝুড়ি মাথায় বাড়ি ফিরচে। আমরা হাট বেড়িয়ে বেড়িয়ে দেখলাম। পরিমল কয়েকটি ফটো নিলে। বেগুন, রেড়ির বীজ, কুচো শুটকি চিংড়ি, কুমড়ো প্রভৃতি বিক্রি হচ্চে। এক দোকানে একটি উড়িয়া যুবতী ধান দিয়ে মুড়কি কিনচে।

সন্ধ্যার ছায়া নেমে এল। আমরা ডাকবাংলোর বারান্দায় চেয়ার পেতে বসলাম। পাচক ব্রাহ্মণটি এসে বিনীত ভাবে উড়িয়া ভাষায় জিগ্যেস করলে রাত্রে আমরা কি খাবো। আমাদের এত আনন্দ হয়েচে যে, কত রাত পর্যন্ত জ্যোৎস্নালোকে বসে আমরা গল্প করলুম। রাত দশটার সময় আহারাদি শেষ হয়ে গেল—কিন্তু ঘুম আর আসে না কারো চোখে।

পরদিন সকালে আমরা বিক্রমখোল রওনা হই। আমাদের সঙ্গে রইল গ্রাম্য পাটোয়ারী ও দুজন ফরেস্ট গার্ড—একখানা গোরুর গাড়িতে আমাদের জিনিসপত্র চললো, কিন্তু আমরা পায়ে হেঁটে যাওয়াই পছন্দ করলুম। জিগ্যেস করে জেনেছিলুম বিক্রমখোল এখান থেকে প্রায় তেরো মাইল।

বেলপাহাড় থেকে বিক্রমখোল পর্যন্ত এই পথের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আমার মনে চিরকালের ছবি এঁকে রেখে দিয়েচে। কতবার অবকাশ-মুহূর্তে স্বপ্নের মতো মনে হয় সেই নদী-পর্বত-অরণ্য-সমাকুল নির্জন বন্যপথটির স্মৃতি। প্রথম বসন্তে ফুটন্ত পলাশবনের শোভা ও রাঙা ধাতুপ ফুলের

সম্মোহ সারাপথে, মাঝে মাঝে পাহাড়ী নদীর খাত বেয়ে ঝিরঝির করে জল চলেচে পাথরের নুড়ির রাশির ওপর দিয়ে।

এক জায়গায় বড় বড় গাছের ছায়া। সামনে একটি পাহাড়ী নদীর কাঠের পুলের ওপর ঘাসের চাপড়া বিছিয়ে দিচ্চে। ঝরনার দুধারে পাহাড়ী করবীর গাছ ফুলের ভারে জলের ওপর নুয়ে আছে। প্রমোদবাবু প্রস্তাব করলেন, এখানে একটু চা সেরে নেওয়া যাক বসে।

কিরণ বললে—চা খাওয়ার উপযুক্ত জায়গা বটে। বসুন সবাই।

আমাদের সঙ্গে ফ্ল্যাস্কে চা ছিল, আর ছিল মার্মালেড্ আর পাঁউরুটি। মার্মালেডের টিনটা এই প্রথম খোলা হ'ল। প্রমোদ ও পরিমল রুটি কেটে বেশ করে মার্মালেড মাখিয়ে সকলকে দিলে—কিরণ চা দিল সবাইকে টিনের কাপে।

কিছুক্ষণ পরে কিরণ রুটি মুখে দিয়ে বললে—এত তেতো কেন? এঃ—

আমিও রুটি মুখে দিয়ে সেই কথাই বললুম। ব্যাপার কি? শেষে দেখা গেল মার্মালেডটাই তেতো। মার্মালেড্ নাকি তেতো হয়, পরিমল বললে। কি জানি বাপু, চিরকাল পড়ে এসেচি মার্মালেড্ মানে মোরব্বা, সে যে আবার তেতো জিনিস—তা কি করে জানা যাবে?

এ নাকি সেভিলের তেতো কমলালেবুর খোসায় তৈরী মার্মালেড, টিনের গায়ে লেখা আছে।

পরিমল এটা কিনে এনেছিল—তার ওপর সবাই খাপ্পা। কেন বাপু কিনতে গেলে সেভিলের তেতো কমলালেবুর মার্মালেড? বাজারে জ্যাম জেলি ছিল না?

হাঁটতে হাঁটতে রৌদ্র চড়ে গেল দিব্যি। বেলা প্রায় এগারোটা। পথের নব নব রূপের মোহে পথ হাঁটার কষ্টটা আর মনে হচ্ছিল না। এ যেন জনহীন অরণ্যভূমির মধ্যে দিয়ে চলেচি—এতটা পথ চলে এলুম,

কোথাও একটা চষা ক্ষেত চোখে পড়লো না। শুধু পাহাড় আর বন, বন আর পাহাড়।

এক জায়গায় পাহাড় একেবারে পথের গা ঘেঁষে অনেক দূর চলেচে। পাহাড়ের ছায়া আগাগোড়া পথটাতে। আমাদের বাঁদিকে জমি ক্রমশ ঢালু হয়ে একটা নদীর খাতে গিয়ে মিশলো। সমস্ত ঢালুটা বন্য-করবী ফুলের বন। পাহাড়ের ওপর বাঁশবন এদেশে এই প্রথম দেখলুম। বন্যবাঁশ আমি চন্দ্রনাথ ও আরাকান-ইয়োমার পাহাড়শ্রেণী ছাড়া ইতিপূর্বে কোথাও দেখিনি। উড়িষ্যা ও মধ্যপ্রদেশের আর্দ্রতা-শূন্য আবহাওয়ায় এই বন্যবাঁশ সাধারণত জন্মায় না। বাঁশ যেখানে আছে, তা মানুষের সযত্নরোপিত।

বেলা প্রায় বারোটার সময় আমরা গ্রিগ্তোলা বলে একটি গ্রামে পৌঁছলাম। এই গ্রাম আমাদের গন্তব্যস্থান থেকে মাত্র দু'মাইল এদিকে, এখানেই আমরা দুপুরে খাবো দাবো।

গ্রামে ঢুকবার আগে এক অপূর্ব দৃশ্য। ঢুকবার পথের দুধারে সারবন্দী লোক দাঁড়িয়ে কাদের অপেক্ষা করচে যেন—অনেক দূর থেকে দেখতে পাচ্ছিলাম।

প্রমোদবাবু বললেন—ওখানে অত লোক কিসের হে?

পরিমল বললে—আমি একটা ফটো নেবো।

আমরা কাছে যেতেই তারা আমাদের একযোগে পুলিশ প্যারেডের মতো সেলাম করলে। ওদের মধ্যে একজন লোক এগিয়ে এসে বললে—আমার নাম বিম্বাধর, আমি এই গ্রামের গ্রামীণ। ডেপুটি কমিশনার সাহেব পরোয়ানা পাঠিয়েচেন কাল আমার ওপর, আপনাদের বিক্রমখোল দেখবার বন্দোবস্ত করতে। সব করে রেখেচি—আসুন বাবুসাহেবরা।

কিরণ বললে—ব্যাপার কি হে?

পরিমল বললে—রাজশক্তি পেছনে থাকলেই অমনি হয়, এমনি আমরা ট্যাং ট্যাং করে এলে কেউ কি পুছত? এ ডেপুটি কমিশনারের পারোয়ানা—

আমি বললুম—টুঁ করবার জোটি নেই।

গ্রামের মাঝখানে মণ্ডপঘর। সেখানে আমাদের নিয়ে গিয়ে সবাই তুললে। রথ-যাত্রাব ভিড লেগেচে সেখানে, গ্রামসুদ্ধ লোক সেখানে জড হয়েচে কলকাতা থেকে মহাপ্রতাপশালী বাবুরা আসচেন শুনে। ডেপুটি কমিশনার স্বয়ং যাদের নামে পরোয়ানা পাঠান—তাদের একবার চোখে দেখে আসাই যাক!

বেলপাহাড়ের পাটোয়ারী ইতিমধ্যে জাহির করে দিয়েচে—বাবুরা সাধারণ লোক নয়। গবর্নমেণ্টের খাসদপ্তরের অফিসর সব। ভাইসব, হুশিয়ার।

বিম্বাধর আমাদের জন্যে এক ধামা গুকুডা অর্থাৎ মুডকি আর এক কড়া ভর্তি গরম দুধ নিয়ে এল। পরামর্শ করে স্থির হ'ল আমবা একটু বিশ্রাম করে নিয়ে এখনি বিক্রমখোল যাবো। সঙ্গে চারজন ফরেস্ট গার্ড এবং বিম্বাধর থাকবে। জঙ্গল বড ঘন, বাঘ-ভালুকের ভয়—বেলাবেলি সেখানে থেকে ফিরতে হবে দেখে শুনে। এসে স্নানাহার করা যাবে—নতুবা এখন স্নানাহাব কবতে গেলে বেলা একেবারে পডে যাবে, সে সময় অত বড জঙ্গলে ঢোকা যুক্তিযুক্ত হবে না।

কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে আমরা বিক্রমখোল বওনা হলুম।

গ্রিণ্ডোলা ছাড়িয়ে মাইল দুই গিয়েই গভীর অবণ্যভূমি—লোকজনের বসতি নেই, শুধু বন্যবাঁশ আব শাল-পলাশের বন। প্রকাণ্ড বড বড লতা গাছের ডালে জড়াজড়ি করে আছে—গাছের ছায়ায় সবুজ বনটিয়ার ঝাঁক। হরিতকী গাছের তলায় ইতস্তত শুকনো হরিতকী ছড়িয়ে পড়ে আছে—কোথাও আমলকি গাছে যথেষ্ট আমলকি ফলে আছে।

পূর্বে যে শুভ্রকান্ত বৃক্ষকে শিববৃক্ষ বলে উল্লেখ করেচি, এ বনে তার সংখ্যা খুব বেশি। এত শিব-বৃক্ষের ভিড় আমি আর কোথাও দেখিনি।

এই বনে আর একটি পুষ্পবৃক্ষ দেখলুম—পরে অবিশ্যি সিংভূম অঞ্চলের পার্বত্য অরণ্যে এই জাতীয় গাছ আরও দেখেচি। গাছটার ফুল অবিকল কাঞ্চন ফুলের মতো, গাছটাও দেখতে সেই ধরনের। বনের মধ্যে যেখানে-সেখানে এই বৃক্ষ অজস্র পুষ্প-সম্ভারে সজ্জিত হয়ে দাঁড়িয়ে।

বনের মধ্যে মাইল দুই-তিন হাঁটবার পরে পথ ক্রমে উঁচু দিকে উঠতে লাগলো—এক জায়গায় গিয়ে পথটা হঠাৎ শেষ হয়ে গেল। আমরা যেন একটা পাহাড়ের ওপর থেকে অনেক নিচু উপত্যকার দিকে চেয়ে দেখচি। আমাদের ওই উপত্যকার মধ্যে নামতে হবে সরু পথ বেয়ে, কোনো কোনো জায়গায় পাহাড়ের ফাটল থেকে বেরুনো শেকড় ধরে।

বিম্বাধর আমাদের সঙ্গে ছিল। সে বললে—পুলিশে জঙ্গল কেটে রাস্তা পরিষ্কার করে দিয়েচে। নামতে তত অসুবিধে হবে না বাবু।

সবাই মিলে পাহাড়ের গা ধরে সন্তর্পণে অনেকটা নিচে নামলুম, আঁকা-বাঁকা পথ বেয়ে।

তারপর ওপর দিকে চেয়ে দেখা গেল অনাবৃত পর্বতগাত্রে লম্বালম্বি-ভাবে খোদাই করা কতকগুলি অজ্ঞাত অক্ষর বা ছবি। পরিমল বিভিন্ন দিক থেকে শিলালিপির ফটো নিলে, অক্ষরগুলির অবিকল প্রতিলিপিও এঁকে নিলে। জায়গাটার প্রাকৃতিক দৃশ্য সত্যিই অপূর্ব। আমাদের আরও নিচে উপত্যকার মেজে। যে পাথরের গায়ে শিলালিপি উৎকীর্ণ, তাকে পাহাড় না বলে একটা মালভূমির অনাবৃত শিলাগাত্র বলাই সঙ্গত। নিম্নের উপত্যকা নানাজাতীয় বন্যবৃক্ষে সমাচ্ছন্ন, তার মধ্যে কাঞ্চন ফুলগাছের মতো সেই গাছও যথেষ্ট—ফুলে ভর্তি হয়ে সেই নির্জন পর্বতারণ্যের শোভা ও গাম্ভীর্য বৃদ্ধি করচে।

উপত্যকার ওদিকে আবার মালভূমির দেওয়াল খাড়া প্রাচীরের মতো উঠে গিয়েচে, সেদিকটাতেও ঘন জঙ্গল। এমন একটি জনহীন ঘন অরণ্য-ভূমির দৃশ্য কল্পনায় বড় একটা আনা যায় না, একবার দেখলে তারপর তার বন্য বাঁশ-ঝোপের ছায়ায় বিচরণকারী মৃগযূথের ছবি মানসচক্ষে দর্শন করা কঠিন হয় না অবিশ্যি।

বেলা পড়ে আসচে। সমগ্র উপত্যকাভূমির অরণ্য ছায়াবৃত হয়ে এসেচে। রৌদ্রতপ্ত বাতাসে শালমঞ্জরীর সুগন্ধ।

বিম্বাধর বললে—এবার চলুন বাবুরা, আর এখানে থাকা ঠিক হবে না। অনেকটা যে ফিরতে হবে।

জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে আমরা সে স্থান ত্যাগ করবার পূর্বে পরিমল আমাদের দলের একটা ফটো নিলে।

তারপর আবার পাহাড়ের গা বেয়ে ওপরে উঠলুম সবাই। বনের মধ্যে দিয়ে জোর পায়ে হেঁটে সন্ধ্যার কিছু পূর্বে আমরা গ্রিণ্ডোলা পৌঁছলাম।

বিম্বাধরের লোকজন আমাদের জন্যে রান্না করে রেখেছিল। ভাত ও পুরী দুই রকমই ছিল, যে যা খায়। আমরা নিকটবর্তী একটা পুকুরে স্নান করে এসে খেতে বসলুম।

গ্রামের লোকের ভিড় পূর্ববৎ। সবাই উঁকি-ঝুঁকি মেরে ভোজন-রত বাঙালী বাবুদের দেখচে। গ্রামের বালক-বৃদ্ধ-যুবা কেউ বোধ হয় বাকি নেই। চারিধারে উড়িয়া বুলি।

খাওয়া শেষ হ'ল। একটি গ্রাম্য নাচের দল নাকি অনেকক্ষণ থেকে আমাদের নাচ দেখাবে বলে অপেক্ষা করচে। এখন যদি আমাদের অনুমতি হয় তো তারা আসে। আমরা খুব আনন্দের সঙ্গে সম্মতি দিলাম। গ্রামের মণ্ডপঘরের সামনে রাস্তার ওপরে নাচ আরম্ভ হ'ল। ছোট

ছোট ছেলেরা মেয়ে সেজে পায়ে ঘুঙুর বেঁধে নাচলে। প্রায় ঘণ্টাখানেক চললো নাচ।

বেলপাহাড়ের পাটোয়ারী বললে—আর বাবু দেরি করবেন না। বড্ড পাহাড়-জঙ্গলের পথে ফিরতে হবে। এই বেলা রওনা হওয়া উচিত।

সেদিন দশমী তিথি। চমৎকার জ্যোৎস্না উঠলো সন্ধ্যার পরই। আমার মনে একটা মতলব জাগলো। এই সুন্দর জ্যোৎস্নারাত্রে সামনের সেই পাহাড়-জঙ্গলের পথে একা যাবো। নতুবা ঠিক উপভোগ করতে পারা যাবে না।

সন্ধ্যার পরেই ওরা সবাই রওনা হ'ল। আমি বললুম—হেঁটে আমি এক পা-ও যেতে পারবো না, পায়ে ব্যথা হয়েচে। আমি গোরুর গাড়িতে যাবো।

কিরণ বললে—বুঝতে পেরেচি, মুখেই শুধু বাহাদুরি!

পরিমল বললে—বিভূতি-দা'র সব মুখে। আমি ও অনেককাল থেকে জানি।

আমরা এবার রওনা হবো। জনৈক গৃহস্থ আমাদের সামনে এসে বিনীতভাবে জানালে আজ রাত্রে তার মেয়ের বিয়ে—আমরা যদি আজ এখানে থেকে যাই এবং বিবাহ-উৎসবে যোগ দিই—তবে বড আনন্দের কারণ হবে।

অবিশ্যি থাকা সম্ভব হয়নি। কিন্তু ওদের ভদ্রতা আমাদের মুগ্ধ করলে। আমরা মিষ্ট কথায় তুষ্ট করে বিবাহ-উৎসবে আমাদের যোগ দেওয়ার অক্ষমতা জ্ঞাপন করলুম। সময়ের অভাব, আজ রাত্রেই আমাদের ফিরতে হবে কলকাতায়।

যাওয়ার সময় বিম্বাধর হঠাৎ হাত জোড় করে বললে—আমার একটা আর্জি আছে বাবুদের কাছে—

—কি ?

—আমাকে একটা বন্দুকের লাইসেন্স করে দিতে হবে। হুজুরকে মেহেরবানি।

গ্রামসুদ্ধ লোক সেখানে উপস্থিত—সবাই আমাদের ঘিরে বিম্বাধরের আর্জির ফলাফল জানবার জন্যে আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। প্রমোদবাবু বললে—ব্যাপার কি হে, বন্দুকের লাইসেন্স দেওয়া না দেওয়ায় আমাদের হাত কি তা ত বুঝলাম না। আমাদের ঠাউরেচে কি এরা ?

কিরণ বললে—গবর্নমেন্টের চিফ্ সেক্রেটারী আর তার স্টাফ্।

বিম্বাধরকে আমরা বুঝিয়ে বলতে পারলুম না অতগুলো লোকের সামনে যে, আমাদের কোনো হাত নেই এ ব্যাপারে, গবর্নমেন্টের ওপর আমাদের এতটুকু জোর নেই।

গম্ভীরভাবে বলতে হ'ল—আমরা বিশেষ চেষ্টা করে দেখবো।

বৃদ্ধকে এ প্রতারণা করতে আমাদেব খুবই কষ্ট হচ্ছিল কিন্তু আমাদের মানও তো বজায় রাখতে হবে!

প্রমোদ, পরিমল ও কিরণ হেঁটে রওনা হয়ে গেল। আমি একটু পরে গোরুর গাড়িতে রওনা হলুম। বিম্বাধর অনেকখানি রাস্তা আমার গোরুর গাড়িব পাশে পাশে এল। পথের পাশে শালবনে সেই নাচের দল রেঁধে খাচ্চে—শালপাতায় ভাত বেড়ে নিয়েচে, আর একটা অদ্ভুত গড়নের কাঁসার বাটিতে কি তরকারি।

বেশ জায়গায় বসে খাচ্চে ওরা। গ্রাম সেখানে শেষ হয়ে গিয়েচে, ডাইনে বনশ্রেণী, পেছনের শৈলমালা জ্যোৎস্নায় কেমন অদ্ভুত দেখাচ্চে। শালমঞ্জরীর গন্ধে-ভরা সান্ধ্য বাতাস। ইচ্ছে হয় ওদের নাচের দলে যোগ দিয়ে এই সব জংলী গাঁয়ে ঘুরে বেড়াই।

গ্রাম ছাড়িয়ে চলেচি। বিম্বাধর ও তার দল বিদায় নিয়ে চলে গেল

পাথার দুধারে নির্জন, নিঃশব্দ শিলাখণ্ড-ছড়ানো প্রান্তর, প্রান্তরের মাঝে মাঝে শাল-পলাশের বন। পথ কখনো নিচে নামচে কখনো ওপরে উঠেচে। গাড়োয়ান নীরবে গাড়ি চালাচ্চে, দু একবার কি বলেছিল কিন্তু তার দেহাতী উড়িয়া বুলি আমি কিছুই বুঝলুম না। অগত্যা সে চুপ করে আপন মনে গাড়ি চালিয়ে চলেচে।

সুতরাং এই জ্যোৎস্নালোকিত পাহাড়ে, অরণ্যে ও প্রান্তরে আমি যেন একা। জ্যোৎস্না ফুটলে শালবনের রূপ যেন বদলে গেল, পাহাড়শ্রেণী রহস্যময় হয়ে উঠলো। অনেকদিন কলকাতা শহরে বদ্ধ জীবন-যাপনের পরে, এই রোদপোড়া মাটির ভরপুর গন্ধ আমাকে আমার উত্তরবিহারে যাপিত অরণ্যবাসের দিনগুলির কথা মনে করিয়ে দিয়ে এই রাত্রি, এই জ্যোৎস্নালোককে আরও মধুময় করে তুলেচে।

দুটো তারা উঠেচে বাঁ দিকের পাহাড়-শ্রেণীর মাথায়। বৃহস্পতি ও শুক্র। পার্ক সার্কাসে টুইশানি করতে যাবার সময় রোজ দেখতুম তারা দুটো বড় বড় বাড়ির মাথার ওপর উঠচে। সেদিনও দেখে এসেচি। চোখ বুজে কল্পনা করবার চেষ্টা করলুম কোথায় পার্ক সার্কাসের সেই তেতলা বাড়িটা, সেই ট্রাম লাইন—আর কোথায় এই মুক্ত প্রান্তর, জ্যোৎস্না-ওঠা বনভূমি, ঝরনা, বাঁশবন, পাহাড়শ্রেণী!...কোনো দিকে কোনো শব্দ নেই। একা যেন আমি এই সৌন্দর্যলোকের অধিবাসী।

মন এ সব স্থানে অন্য রকম হয়ে যায়। প্রত্যেকের উচিত গভীর নির্জন স্থানে মাঝে মাঝে বাস করা। মন অন্যরকম কথা কয় এই সব জায়গায়। মনের গভীরতম দেশে কি কথা লুকোনো আছে, তা বুঝতে হ'লে নির্জনতার দরকার। ভারতবর্ষের রূপও যেন ভালো করে চেনা গেল আজ। বাংলার সমতল ভূমিতে বাস করে আমরা ভারতের ভূমিশ্রীর প্রকৃত রূপটি ধরতে পারি না। অথচ এই রাস্তা, মাটি, পাহাড়, শালবন—এখান থেকে আরম্ভ করে সমগ্র মধ্যভারতের এই রূপ।

খড়গপুর ছাড়িয়েই আরম্ভ হয়েচে রাঙা মাটি, পাহাড় আর শালবন—

এই চারশো মাইল বরাবর চলেচে; শুধু চারশো কেন, আটশো মাইল আরও চলেচে সহ্যাদ্রির অরণ্যানী ও ঘাট-শ্রেণী পর্যন্ত।

ওদিকে মহীশূর, নীলগিরি, মালাবার উপকূলে ট্রপিক্যাল অরণ্য। আর্যাবর্তের সমতলভূমি পার হয়েই নগাধিরাজ হিমালয়—ভারতের আসল রূপই এই। বাংলা অন্য ধরনের দেশ—বাংলা শ্যামল, কমনীয়, ছায়াভরা; সেখানে সবই মৃদু, সুকুমার, গাছপালা থেকে নারী পর্যন্ত। এখানে যেন শিবমূর্তি ধরেচে—কমনীয়তা নেই, লাবণ্য নেই—শুধু রুক্ষ, বিরাট, উদার। উড়িষ্যা ও মধ্যভারতের বনের শিববৃক্ষ যেন এখানকার প্রকৃতির রূপের প্রতীক।

অনেকরাত্রে ডাকবাংলোয় পৌঁছলাম। বন্ধুরা তখনও কেউ আসেনি। একাই অনেকক্ষণ বসে রইলাম। ঘণ্টাখানেক পরে ওরা এল। বললে, স্টেশনের কাছে একটা হায়েনা মেরেচে দেখে এলুম।

—কে মেরেচে?

—রেলের এক সাহেব। দেখে এসো, প্লাটফর্মে মরা হায়েনাটা এনে রেখেচে।

—তার চেয়ে ঠাকুরকে চা করতে বলা যাক, এসো চা খাওয়া যাক। মরা হায়েনা দেখে কি হবে।

সেই পূজারী ঠাকুর পরম নিষ্ঠার সঙ্গে আমাদের ভাত বেড়ে দিলে। এত রাত হওয়া সত্ত্বেও গ্রামের অনেকগুলি লোক ডাক-বাংলোয় এসেছিল আমাদের বিদায় দিতে।

দূরে পাহাড়ের মাথায় চাঁদ অস্ত গেল।

আমরা স্টেশনে চলে এলুম, রাত দুটোয় ট্রেন, শীত পড়েচে খুব।

প্লাটোয়ারী হাত জোড় করে বললে—বাবু, বিম্বাধরের আর্জিটা মনে আছে তো? আমায় বার বার করে বলে দিয়েচে আপনাদের মনে করিয়ে দিতে। আপনারা বড়লোক, একটু বলে দিলেই গরিবের অনেক উপকার হয়।

কথাটা ঠিক, কিন্তু বলি কাকে?

হায় বিম্বাধব!